প্রাচ্যের রহস্য-নগরী

অনুবাদ

রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৭২

বা.এ. ৮৭১

পাণ্ডুলিপি :
অনুবাদ বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক :
ফজলে রাব্বী
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রক :
মোহম্মদ হোসেন
বিপাশা মুদ্রণ
৪৮, হৃষিকেশ দাস রোড
ঢাকা-১

প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ

প্রথম সংস্করণের

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের ঢাকা নগরী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। মুগল যুগের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিকা সে পালন করে এসেছে। ফলে, ইতিহাসগত কারণেও বর্তমান রাজধানীর চরিত্রলিপি জানা প্রয়োজন।

মধ্যযুগে ঢাকা নগরীর সর্বৈব বৈভব ও স্খলন, বিলাস ও অবক্ষয়, ঔজ্জ্বল্য ও মলিনতা অর্থাৎ সার্বিক চরিত্র বর্তমান গ্রন্থে পরিস্ফুট। নীরস ইতিহাস নয়, সজীব সাহিত্য পদবাচ্য এই পুস্তক বিদ্বজ্জনের আদৃত হবে বলে আমরা ভরসা করি।

সৈয়দ আলী আহসান
পরিচালক : বাংলা একাডেমী

প্রথম সংস্করণে

অনুবাদকের ভূমিকা

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়। এবং এই ব্যবস্থানুযায়ী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং আসামকে নিয়ে একটি নয়া প্রদেশ গঠন করা হলো। পুনর্গঠিত প্রদেশটির রাজধানী হলো ঢাকা।

হৃতগৌরব জাহাঙ্গীরনগরীকে নূতন আভরণে সাজানোর আয়োজন শুরু হয়েছে। নয়া নয়া ইমারত গড়ে উঠছে। তৈরি হচেছ প্রশস্ত আধুনিক রাজপথ আর রাজভবনসমূহ। স্তিমিতপ্রাণ ঢাকা নগরী মুখর হয়ে উঠছে। ইতিহাস একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনো ঝড় শুরু হয়নি তাব বুকে। স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি তাব পার্শ্ব পরিবর্তনের আভাস। জাতীয় মানসে সবে চেতনার শিহরণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু দানা বেঁধে ওঠেনি। ব্রাড্‌লী বার্টের 'রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থটি ঠিক এমনি সময়ের (১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ) রচনা। লেখকের মূল উদ্দেশ্য ছিলো নয়া রাজধানী নগরীর অতীত ও সমসাময়িক কালের ইতিহাসের সাথে পাঠক সমাজের পরিচয় করিয়ে দেয়া। তা করতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত, অনধিত ও বিস্মৃত অধ্যায়ের উন্মোচন করেছেন।

এই গ্রন্থে সমসাময়িক কালের ঘটনা-প্রবাহের কেবল ছায়াপাতই ঘটেনি বরং এ-দেশের মুসলিম জাতীয় জীবনের আলো-আঁধারীর যুগের একটি রূপমূর্তি তাতে বিধৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে মুসলিম গণ-মানসে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও চেতনার উদ্‌ভাসন ঘটে এবং যা পাকিস্তান আন্দোলনের রূপ নিয়ে দুর্বার তরঙ্গে ভেঙ্গে ফেটে পড়ে, তার দীর্ঘ-বিস্তৃত পটভূমির বিক্ষিপ্ত পরিচয় ছড়িয়ে আছে গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে। এ-সব বিক্ষিপ্ত সূত্রের যোজনা

দুঃসাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের এই প্রদোষকালের কোন ইতিহাস নেই। ভাবী উদ্যোগে এই সূত্রগুলো অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করি।

প্রাচীন জাহাঙ্গীরনগরীর অলিতে-গলিতে, মিনারে-গম্বুজে এবং সেই হারানো অতীতের প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি বাঁকে ব্র্যাডলী বার্ট দেখতে পেয়েছেন মোহকর রহস্যময়তা। সে রহস্যময়তা তাঁকে বিমুগ্ধ, আবিষ্ট করেছে। মধ্যযুগের ঢাকার সাথে লেখক যেনো একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন। তাই গ্রন্থখানি ইতিহাসের নীরস গণ্ডি অতিক্রম করে একটি সুপাঠ্য রোম্যান্স সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনবদ্য ভাষায় বর্ণিত প্রচুর ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী ও কিংবদন্তী এটিকে আরো রসঘন ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়ের প্রাথমিক যুগের যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন, ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে তার মূল্য অপরিসীম। বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর পূর্ব বাংলায় নেমে আসে এক চরম শিল্প ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে উপর্যুপরি তিনটি মহামন্বন্তর ও মহামড়কে দেশ উৎসন্ন-প্রায় হয়ে গিয়েছিলো। ম্যাঞ্চেস্টার মসলিন শিল্পীদের মুখের আহার কেড়ে নিলো। অন্যান্য শিল্পও ক্রমে ধ্বংসকবলিত হলো। শিল্পচ্যুত ব্যবসায়হারা লক্ষ লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেলো জীবিকার অন্বেষণে। যে-হাত 'আব রোওঁয়া,' 'বেগম খাস' বুনতো, তাকে ধরতে হলো লাঙ্গলের মুঠা। কিন্তু ভাগ্য সেখানেও বিমুখ। ধরিত্রী দিলো না তাকে শস্যকণা। মড়ক, মহামারী আর মহামন্বন্তরের অভিঘাতে বিধ্বস্ত এ-দেশের তৎকালীন যে করুণ চিত্র ব্রাডলী বার্ট এঁকেছেন, তাতে ক্ষমতাগর্বী দাম্ভিক বিদেশী সরকারের আসল চেহারাটির সন্ধান পাওয়া যাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা পণ্ডিত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস সদস্য ব্রাডলী বার্টের ভাষায় সেদিনের মানুষের **'Had nothing left wherewith to start life afresh.'**

সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর সম্পর্কে লিখিত দু'টি অধ্যায়ে বহু দুর্লভ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

'রোমান্স অব এ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থের অনুবাদের বাঞ্ছনীয়তা ওপরের বক্তব্যেই সুস্পষ্ট। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য বলে এর অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, গ্রন্থটি অনুপম ভাষায় রচিত। অনুবাদে ভাষার সেই প্রসাদগুণ কতোটা রক্ষিত হয়েছে, তা বিচারের ভার পাঠকের। তবে অনুবাদে যতদূর সম্ভব বিশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করেছি। মূল বইটি কোন পাঠাগার থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করে অনুবাদে হাত দিই। উপর্যুপরি তাগিদের জন্য অনেক তাড়াহুড়া করতে হয়েছে। কাজেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়।

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানির অনুবাদের ব্যবস্থা করে বাংলা একাডেমী পাঠকদের উপকার করেছেন। এ-জন্য একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান ও অনুবাদ বিভাগের প্রধান বন্ধুবর জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন ধন্যবাদার্হ।

ঢাকা
৬. ৬. ৬৫

রহীম উদ্দীন সিদ্দিকী

উপক্রমণিকা

যে সব অঞ্চল পর্যটকগণের পীঠস্থান বলে পরিচিত হয়ে এসেছে, পূর্ব বাংলা সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানেও যথেষ্ট দর্শনীয় বস্তু বা স্থান আছে, এমন কথা কোনো দিন জোরেশোরে প্রচার করা হয়নি। ফলে প্রদেশটি বহুকাল যাবৎ যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলা বিভাগের প্রশ্নে বিতর্কের ঝড় উত্থিত হওয়ায় এই অঞ্চল সম্প্রতি ভারতীয় এবং বৃটিশ জনসাধারণের কাছে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এই গ্রন্থে প্রদেশটির রাজধানীর কাহিনী সাধারণের উপযোগী করে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করা যায়, এক্ষণে এটি বিশেষ আবেদন ও আগ্রহের সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। সাধারণের চিত্তগ্রাহী করে এর একটা ইতিহাস খাড়া করার কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে—বিশেষ করে বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের—কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই বললেই চলে। আবার পরবর্তী যুগের ঘটনাবলী এত দ্রুত আবর্তিত হয়েছে এবং এত ঘন ঘন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে যে মুসলমান আমলের ইতিহাসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিহাসের নামে কতকগুলো অপরিচিত নামের জগাখিচুড়ি অথবা সুলতান-সুবেদারদের কীর্তি-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি মাত্র করা হয়েছে। প্রামাণ্য বলে পরিচিত এ-ধরনের ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে আবার প্রচুর পরস্পরবিরোধী তথ্য সন্নিবেশিত আছে। যাঁরা প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করতে চেষ্টা করবেন, এগুলো তাঁদের সামনে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করবে। বর্তমান গ্রন্থে বিতর্কমূলক কোনো বিষয়ের অবতারণা করলে তা অপ্রাসঙ্গিক হতো। প্রয়োজনবোধে বহু কিছুই বর্জন করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত এই প্রাচীন মুসলিম নগরীর একটি ধারাবাহিক

পাঠযোগ্য কাহিনী পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করার লক্ষ্য বরাবর অব্যাহত রেখেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কারণ, এই নগরীটি আবার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছে।

মৌলবী সৈয়দ আওলাদ হোসেন প্রাচীন ঢাকার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টির ব্যাপারে বহু প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। তিনি অনুগ্রহপূর্বক এই গ্রন্থের প্রুফ দেখে দেওয়ায় এবং বহু মূল্যবান পরামর্শদান করায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নওয়াব নাজিম শায়েস্তা খান, গুরু নানক, সম্রাট ফররুখশিয়ার ও তাঁর পত্নীর প্রতিকৃতি আমি সৈয়দ সাহেবের কাছ থেকেই পেয়েছি। এই গ্রন্থ রচনায় যে-সব প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে, এর শেষের দিকে তার একটি তালিকা দেয়া হলো।

সিমলা: ২৫শে জুন, ১৯০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিপুল আকার আর সীমাহীন বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী আর দিগন্ত-উদার প্রান্তরের দেশ পূর্ব বাংলা—সর্বত্র সমতল—অবিকল একটা মানচিত্রেব মতো। উপাখ্যানে বলে, পুরাকালে একদা অকস্মাৎ দেবতারা ভীষণ কুপিত হযে উঠেন এবং শুরু কবে দেন রুদ্র তাণ্ডব। তাঁদের লাঙলের ফলার মুখে গিবি-উপত্যকা, পর্বত-প্রান্তর চিরে ফেঁড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই মহাতাণ্ডবেব ফলে হিমালয থেকে শুরু কবে সমুদ্র পর্যন্ত বিশাল অংশটি একটা সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পশ্চিমে অরণ্যনিবিড় শিলাময় রাজমহল গিরিশ্রেণীব পাদদেশ থেকে পূর্বে বিপুল ব্রহ্মপুত্র নদের তটভূমি, উত্তরে নেপাল ও সিকিমের তুষার-কিরিটিনী শৈলমালা থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত প্রসারিত এক মহা দিগন্ত-বিস্তৃত সমতল ভূমি। এই অঞ্চলে প্রাচ্য-ভূখণ্ডের কতকগুলো মহানদ অসংখ্য শাখায়-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নিরন্তর ভাঙা-গড়ার খেলা খেলতে খেলতে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে সাগর সঙ্গমে। তাদের রসোধারায় সঞ্জীবিত, উর্বর, শস্যশালিনী এই অঞ্চল। প্রকৃতির অকৃপণ স্নেহের বারিধারায় সিক্ত থরে থরে সাজানো, চোখ-জুড়ানো শস্য-ক্ষেত অজস্র নদ-নদী, খাল-বিলের নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ। সবুজ বর্ণাভার প্রতিটি বৈচিত্র্যের সমাবেশ সেখানে—যেন রজত কান্তির মধ্যে পান্নার বাহার।

পর পর যে সব জাতি নদীপ্রান্তরের এই দেশটিতে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে এর কেন্দ্রভাগেই তারা তাদের রাজধানী স্থাপন করে এসেছে। যুগের পর যুগ ধরে কতো রাজশক্তির উত্থান-পতন ঘটেছে। এইসব উত্থান-পতনের সাথে সাথে রাজধানীরও পরিবর্তন হয়েছে। স্ব স্ব কীর্তি চিরস্মরণীয় করে রাখার অভিলাষে নৃপতি ও বিজয়িগণ নূতন নূতন নগরী স্থাপনের হুকুম

দিয়েছেন। আদেশ মাত্রই বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে নব নব নগরীর পত্তন হয়েছে। হয়তো বা কোন কোনটির মিনার, মসজিদ ও হর্ম্যচূড়ায় শেষ পাথরটি চড়ানোর আগেই জনমানব শূন্য হয়ে গিয়েছে এইসব নগরী। নানাস্থানে এগুলো স্থাপিত হয়ে আসলেও দু'হাজার বছরের অধিক কাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার প্রধান নগরীসমূহ ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, মেঘনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে যেখানে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে—অর্থাৎ সমুদ্র থেকে ১০০ মাইল —সেখান থেকে খুব বেশী দূরে কখনো স্থাপিত হয়নি। পুরাকালে রাজা বিক্রমাদিত্য এই অঞ্চলে প্রথম যে রাজধানীর পত্তন করেছিলেন, আজো তার খ্যাতি বেঁচে আছে। এখান থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালের করাল স্পর্শে জীর্ণ ঢাকা নগরী—একদা যা'ছিল উভয় বঙ্গের শাহী রাজধানী। এতোকাল হৃত-গৌরব, ম্রিয়মান হয়ে পড়ে থাকার পর আবার সে রাজধানীর মর্যাদা লাভ করতে চলেছে পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত নয়া প্রদেশের রাজধানী।

এতো আকর্ষণ ও বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলা যেরূপ অবহেলিত ও অনাদৃত হয়ে এসেছে, সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় অন্য কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে তা হয়নি। ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগ থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল স্বার্থ ও দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হলো কলিকাতায়। কলিকাতা কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলা অজ্ঞাত, অনাদৃত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলো। কর্তব্যের তাগিদে যাদের এখানে আসতে হয়েছিলো, তারা ছাড়া আর কেউ জানলো না এর বিশালকায় নদী-নালা আর দিগন্ত-উদার প্রান্তর ভূমির কথা। এমনকি, সাধারণভাবে পদস্থ রাজকর্মচারীরাও বিহারের চাকচিক্যময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহ পরিহার করে এসেছেন। গ্রন্থকারগণের কাছ থেকেও সে লাভ করেছে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও বঞ্চনা। সাম্প্রতিক কালে ইংরেজ রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা বলতে ইংরেজদের মনে ভেসে উঠতো বনবাদাড়, নদী-নর্দমায় ভর্তি পঙ্কিল জলাভূমিময় একটা দেশের ছবি। মসলিনের খ্যাতির কারণে একমাত্র ঢাকার নাম

শুনতে ইংরেজগণ অভ্যস্ত ছিলো। পর্যটকগণও গতানুগতিক ধারাই অনুসরণ করেছেন। এবং ভ্রমণবিলাসীরা তীর্থকেন্দ্রগুলোর আকর্ষণে এই দেশটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠ করে তাঁরা সেইসব বৈচিত্র্যহীন, নূতনত্বহীন ভ্রাম্যমানদের তীর্থকেন্দ্র পর্যটন করে দেশে ফিরেন এবং প্রাচ্যের বিস্ময়কর স্থান ও বস্তু সম্পর্কে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে ফেটে পড়েন। কাগজের বুকে ভাবোচ্ছ্বাসের বান ডাকে। তাজমহলের সৌন্দর্য, দিল্লীর ঐশ্বর্য আর লক্ষ্ণৌর স্মৃতিকথা বর্ণনায় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠে তাঁদের লেখনী। সেই একই বর্ণাঢ্য বিবরণ আর ভাবালুতার পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তি। অথচ প্রকৃত ভারত সম্পর্কে তাঁরা নামমাত্র জ্ঞানই আহরণ করে থাকেন। এতো কাছে থাকা সত্ত্বেও এই নূতন পথে অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দিক তাঁরা দৃষ্টি ফিরাননি। বঙ্গদেশ ভ্রমণকারীদের কাছে কলিকাতাই ছিলো পূর্বান্ত সীমা। এর বাইরে যে বিরাট একটি দেশ পড়ে আছে, তা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। আজো এই দেশ তাঁদের কাছে একটা নামমাত্র। তাই অব্যক্ত আর অজ্ঞাত হয়ে রইলো এর বিচিত্র কাহিনী ও রূপৈশ্বর্য।

সত্যিই পূর্ব বাংলার মধ্যে এমন একটি মোহকর রূপ আছে, যা প্রাচ্য ভূখণ্ডের সকল বিস্ময়কে হার মানায়। নিরস, রুক্ষ্ম, রৌদ্রদগ্ধ প্রাচ্যাঞ্চল সফরের ক্লান্তির শেষে পর্যটক এদেশে এসে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়বে। প্রকৃতির স্নেহ ধারায় পুষ্ট এই দেশটির অফুরন্ত শ্যাম-সম্পদে তার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এই ভূখণ্ডের চিত্তগ্রাহী বিবরণ দিতে গিয়ে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাঁরা এটিকে 'রজত পান্নার দেশ', 'রাজোচিত উদ্যান' ইত্যাদি বলে অভিহিত করে গেছেন। এমনকি, সরকারী দলিল-দস্তাবিজেও 'জিন্নাতুল বিলাদ' বলে এর আখ্যা দেয়া হয়েছে। এক চির-নূতন সজীবতায় রয়েছে শরতের স্নিগ্ধ স্পর্শ। জলপাই থেকে শুরু করে কচি ধানের চারা পর্যন্ত বিভিন্ন সবুজ বর্ণের মধ্যে যত বৈচিত্র্য আছে, সবগুলোর সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এক সবুজের সম্পদ, সবুজে সবুজে ঢেকে আছে এর সর্বাঙ্গ—যেনো প্রকৃতি পরম আদর

ভরে বিছিয়ে দিয়েছে এক সবুজ গালিচা। প্রাচ্যের আতপ-তাপ দগ্ধ দেশগুলোর কাছে যা পরমারাধ্য বস্তু, প্রকৃতি অকৃপণ হাতে তা তার দানসত্র থেকে ঢেলে দিয়েছে এই দেশটিতে। হাজার হাজার নদ-নদী এঁকেবেঁকে ঠিক গোলক-ধাঁধার পথের মতো সারাটা দেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে আর তাকে করেছে রসসিক্ত। যুগ-যুগান্ত ধরে ভারতের উপর কতো ভয়াবহ বিপদপাতই না হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই এই প্রদেশটি সেগুলো থেকে রেহাই পেয়েছে। যে ভয়ঙ্কর প্লেগ রোগ ভারতে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটিয়ে গেছে, তা এই প্রদেশে প্রবেশ-পথ পায়নি। এখানে অনুপ্রবেশের পথে এইসব নদ-নদী অপ্রতিরোধ্য বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে। স্মরণ কালের মধ্যে এখানে কোন মন্বন্তর ঘটেছে বলে কেউ বলতে পারে না। ঘনবসতিপূর্ণ পূর্ব বাংলায় প্রতি বছরই পৌনঃপুনিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে ভূমির উপর গুরুতর চাপ পড়ে। কিন্তু এর উবর পলিমাটি অতিরিক্ত চাহিদা মিটিয়ে দেয়। সুদৃশ্য জলভরা ক্ষেতে সুনিশ্চিত ফসলের প্রেরণায় চাষীরা মনের আনন্দে কাজ করে যায়। তারা জানে, এইসব ক্ষেতে যে শস্যকণা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা অজস্রগুণে বৃদ্ধি পেয়ে পরম বিশ্বস্ততার সাথে ফিরে আসবে তাদের কাছে ঠিক সময়মতো। কলিকাতার সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোর যোগাযোগ রক্ষাকারী স্টীমারে কোন পর্যটক যদি পূর্ব বাংলার অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করেন, তবে তিনি অনুভব করতে পারবেন এখানকার প্রাণময় সজীবতা আর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। সমগ্র ভারত জুড়ে ভ্রমণের পক্ষে এর চেয়ে আরামদায়ক আর কোন উপায় নেই। ট্রেনযোগে দীর্ঘপথ পরিক্রমায় অফুরন্ত শব্দ-কোলাহল এবং শহরাঞ্চলের অবিশ্রান্ত কর্মচাঞ্চল্য পর্যটককে পীড়িত করে তোলে। কিন্তু স্টীমারে আরোহণের সাথে সাথে নেমে আসে একটা আশ্চর্য প্রশান্তি এবং আরাম। বৃহদাকার স্টীমারগুলো যেন দৃঢ়সংকল্প নিয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে চলে শক্তি ও আনন্দের স্ফূর্তিতে। স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যায়। ডেক চেয়ারে আরাম করে বসে চেয়ে থাকুন, দেখবেন নদী-জীবনের মোহকর রূপ—রঙে-রসে বিচিত্র। এক পলকেই

প্রকৃত ভারতের যে-রূপ দেখতে পাবেন, শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনায়ও তা পাবেন না। সোনালী আর গোলাপী বর্ণের নদী-বক্ষ রঞ্জিত করে আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়ায় নবারুণ। উদয়-মুহূর্তে সে এক আশ্চর্য নীরবতা—সর্বব্যাপ্ত স্তব্ধতা আর নৈশব্দ। কান পেতে থাকলে শুধু শোনা যাবে নদীর মর্মর ধ্বনি, হাস্যমুখর হাজারো ঢেউয়ের কল্লোল। কখনো সে নদী ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ে, আবার ঝড়ের আঘাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। আবার কখনো একেবারে শান্ত, একেবারে আয়নার মতো মসৃণ। সে-আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হয় আকাশের সুন্দর মুখ। চিরপরিবর্তনশীল; কিন্তু চিরমোহনীয় এই নদীর রূপ। অদ্ভুত ধরনের জলযানসমূহ বয়ে যায় তার উপর দিয়ে। বায়ুস্ফীত পালের তাড়নায় ছুটে চলে তর্ তর্ করে সে-সব বিচিত্র ধরনের নৌকো। সে গুলোর মধ্যে রয়েছে সরু, বাঁকা মৎস্যশিকারী নৌকো, সূক্ষ্ম প্রান্ত, দীর্ঘ দ্রুতগামী গয়না নৌকো, গৃহস্থ ঘরের পরিপাটি করে ছই-সাজানো ভারী বড় আকারের নৌকো। কাজের তাড়নায় আর প্রাণের সজীবতায় এরা একের পর এক ছুটে চলেছে স্ব স্ব গন্তব্যস্থলে। পালগুলোতে সে কি অপরূপ রঙের বৈচিত্র্য—সাদা, হলুদ আর নীলের সমারোহ। যখন হাওয়া লাগে সে-সব পালে, তালে তালে তারা নেচে ওঠে মাস্তুলের গায়ে গায়ে। সূর্য আর সমীরের সোহাগে ওরা যেনো জীবন্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত নদীতে জীবনের আনন্দ। অথচ সে-জীবন কতো সহজ কতো কোলাহলহীন।

নদীর পাড় ঘেঁষে স্টীমার এগিয়ে চলে আর প্রতি মুহূর্তেই প্রতিফলিত হয় ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনধারার এক একটা ছবি। নদীর পানির কাছে হয়তো একদল রমণী রহস্যালাপে রত। তাদের মণিবন্ধ আর কণ্ঠলগ্ন অলংকারের মধুর নিক্কন। মাথায় কলস রেখে এমন মোহনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তারা আলাপ করে, যা একমাত্র প্রাচ্য দেশীয় রমণীই জানে। বাঁশের চাটাই ঘেরা ও খড়ের ছাউনি করা গৃহবিশিষ্ট গ্রাম গাছের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে যায়। নদীর পানি থেকে মাত্র কয়েক ফিট

উঁচু এইসব বাড়ীঘর। অধিবাসীরা শ্লথগতি ও বিচক্ষণ। একপাল ছোট ছোট ছেলে রোদের মধ্যে খেলছে, পরনে কাপড়ের বালাই নেই; কিন্তু গলায় মালা। তাদের চেয়ে একটু বড়ো একটা কিশোর হয়তো কাদায় গড়াগড়ি-দেওয়া একপাল মহিষকে তোলার জন্যে অনবরত তার হাতের পাঁচনের সদ্ব্যবহার করছে। কিন্তু শীতল কাদার মধ্যে তারা পরম আরামে শুয়ে থাকে। শুধু মাঝে মাঝে তাদের কালো মাথা উপরের দিকে তোলে। বেলা যতো বাড়তে থাকে, প্রতিটি নদীর ঘাটে নারী-পুরুষ, যুবা-শিশুদের ভিড়ও বেড়ে চলে। তারা স্ব ধর্মীয় অনুশাসনানুযায়ী স্নানাদি সম্পন্ন করে। ক্রমে ক্রমে দিনের উত্তাপ আর জনকোলাহল ঝিমিয়ে পড়ে। নদীর ঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে। বাতাস থেমে যায়, নৌকোর পাল নামানো হয়। সব নিশ্চল হয়ে যায়—চলে শুধু নদী, অবিরাম অবিশ্রান্ত। তারপর আসে মহিমামণ্ডিত সূর্যাস্তের ক্ষণমুহূর্ত। জলময় পূর্ব বাংলা ছাড়া কদাচিৎ এমন উপভোগ্য সৌন্দর্য নজরে পড়ে। রঙের ইন্দ্রধনু রচনা করে সূর্য অস্ত যায়। রাত্রি নেমে আসে, নেমে আসে একটা নূতন জগত—উপরে গাঢ় নীল খিলানযুক্ত নক্ষত্রখচিত জ্যোতির্ময়ী আকাশ। নীচে অন্ধকার। নদীতে পথ দেখার জন্যে স্টীমারের সার্চলাইটে শুধু মাঝে মাঝে সে অন্ধকার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে যায়। ভৌতিক আলো যেনো। এইসব ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে ফুটে ওঠে রাত্রির রহস্য—যবনিকার তীব্র আলোক-সম্পাতে ফুটে ওঠা ছবির মতো।

শান্ত, নীরব আর মধুময় পূর্ব বাংলার রাজধানী আর রাজপথগুলোর কাহিনী কিন্তু অন্য রকম। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আর এক ধরনের আকর্ষণ ও বিমুগ্ধতা। এ-বিমুগ্ধতা যে কোন ঐতিহাসিক মহানগরীর মধ্যেই আছে। পথিকের যদি দেখার মতো চোখ থাকে, বুঝবার মতো মন থাকে আর জানবার মতো বুদ্ধি থাকে, তবে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে না। প্রাচ্যের মহানগরীসমূহের প্রতিটি নিঃশ্বাসেই ঝড়ে পড়ে রহস্য। ঢাকার রাজপথের প্রতিটি বাঁকেই সে-রহস্য পথচারীকে বিভ্রান্ত ও হতচকিত করে

তুলবে। বিষাদ-গম্ভীর মসজিদ ও প্রাসাদের সর্বাঙ্গে কালের করাল হস্তের সুস্পষ্ট ছাপ লেগে গেছে। ভগ্নপ্রায় মিনার আর প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠসমূহে লুক্কায়িত রয়েছে অলিখিত রহস্যকাহিনী। আজকের কোন মানুষই জানে না সে সব গুপ্ত রহস্যের কথা। কতো সব অদ্ভুদ ঘটনা ঘটে গেছে। একমাত্র এই প্রাচীন ইমারতই জানে সে-সব। এরা উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে কতো চক্রান্তের কানাকানি, যতো সব জঘন্য অপরাধের ষড়যন্ত্রের কথা, কলংকপূর্ণ এবং দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের কথা; শুনেছে অপার্থিব প্রেমের মদিরালাপ। এগুলোর নায়ক ছিল এমন একটি জাতি, যে প্রেম ও সমর ক্ষেত্রে সমান যশ রেখে গেছে। এরা দেখেছে, পরাক্রান্ত সুবেদার ও শাহ্জাদাদের মর্মান্তিক পরিণাম। বিজয়োন্মত্ত অনুবর্তীদেরও দেখেছে তারা। দেখেছে তাদেরও মৃত্যু-ঘন্টা শীগ্গির বেজে উঠেছে। এরা দেখেছে ঐশ্বর্য-সম্পদ, কতো পলাতক। দ্রুতগতিতে নেমে এসেছে সমৃদ্ধি আর বিলাস, জয় আর পরাজয়, বিজয়োৎসব আর নির্বাসন। মানুষের উল্লাস আর প্রমত্ত আকাংখা যে কতো অনিত্য-অসার, এ-সব তারই মহা-শিক্ষা। এতো দেখা, এতো জানা সত্ত্বেও ইমারতগুলো কিছু বলবে না, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা অপরিসীম রহস্যের প্রতিমূর্তি হয়ে। কোন মানুষই এ-সব রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করতে পারবে না। এই মহানগরীর আঁকাবাঁকা অলি-গলি দেখে মনে হবে যেনো বাইরের দৃষ্টি থেকে রহস্য ঢেকে রাখার জন্যে বিশেষ এক আদর্শে এগুলো তৈরী করা হয়েছিলো। এই মহানগরীর বুকের তলায় যতো রহস্য ঘুমিয়ে আছে, তার কতটুকুই বা মানুষ জানে। অতীতের গহ্বর থেকে যে কিছু উদ্ধার করা যাবে, তাও সম্ভব নয়, কারণ যে-সব চিহ্ন ও সূত্র ধরে তা'করা হবে, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

এককালীন এই বাদশাহী নগরীর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে মানষ ও মহাকালের ধ্বংসলীলা। পূর্ব বাংলার ঝড়-ঝঞ্ঝা আর মারাত্মক আর্দ্র আবহাওয়া একটা মহান স্থাপত্য ও নির্মাণকুশলী জাতির বিস্ময়কর শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর

বহনকারী ইট-পাথরের উপর চালিয়েছে সর্বনাশা অভিযান। মানুষের অবিশ্বাস্য রকমের বর্বরতা মহাকালকেও হার মানিয়েছে। একদল বর্বর মানুষ অত্যুৎকৃষ্ট সৌধমালা অবলীলাক্রমে ভূমিসাৎ করেছে। তার স্থলে নিজেদের কীর্তি জাহির করার উদ্দেশ্যে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী এমন সব বিকট-দর্শন ইমারত নির্মাণ করেছে, যা দৃষ্টিকেই শুধু পীড়া দেয়। কিন্তু অধঃপতিত অবস্থায়ও এই নগরী তার আকর্ষণ হারায় নি। যুগ যুগ ধরে যেসব বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনা এখানে ঘটে গেছে এবং যেসব ঘটনা সর্বকালের জন্য এর নিজস্ব সম্পদ হয়ে রইবে, সেগুলো তার কাছ থেকে কি মানুষের বর্বরতা, কি মহাকালের করাল স্পর্শ হরণ করতে পারবে না।

প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পূর্ব বাংলার প্রাথমিক যুগও রহস্যের দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠনে আবৃত। মুসলিম অভিযানের পূর্ববর্তী সময়ের যা-কিছু জানা যায়, তা উপাখ্যান ও লোক-কাহিনী মাত্র। মুসলমানদের আগে এদেশে বৌদ্ধ এবং হিন্দুরা বাস করতো। তারা ইতিহাস লিখতে জানতো না। বংশপঞ্জী সংকলনের মধ্যে তাদের সাহিত্য-নৈপুণ্য সীমাবদ্ধ ছিলো বলে মনে হয়। দেশের স্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তারা লিপিবদ্ধ করতো না। তাদের জীবন ধারণের পথ ছিলো এতো বন্ধুর এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে তাদের এমন নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকতে হতো যে সেরূপ অবস্থায় সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার মতো নৈর্ব্যক্তিক আগ্রহ ও প্রেরণাবোধের কোন অবকাশই ছিলো না। জীবন যেখানে এতো সংকট ও সংশয়সংক্ষুব্ধ, সেখানে দেশের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রাখার মতো সময় কোথায়? কেউ যদি তা করতো, তবে নিশ্চয় তার লিখিত কাগজপত্রশুদ্ধ তাকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হতো। প্রাচীন কালে বাংলা দেশের লোক কেমন ছিলো, কেমন ছিলো তাদের জীবনধারা ও রীতিনীতি, তার সামান্য মাত্র আভাস পাওয়া যায় বিজয়ী রাজাদের জন্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহে—এ ছাড়া তা জানার আর কোন পথ নেই।

ধলেশ্বরী ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের অদূরে অবস্থিত বিক্রমপুরের চতুর্দিকে ঘিরে এই প্রথম সংস্কৃতি ও সভ্যতা দানা বেঁধে ওঠে। এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে একটি বৌদ্ধ রাজবংশ অপ্রতিহত শক্তি ও প্রতিপত্তির সাথে রাজ্য শাসন করে যায়। কিন্তু এতো দীর্ঘকালের রাজত্বেরও কিছুমাত্র নিদর্শন তারা রেখে যায়নি। তাদের সহধর্মীদের বংশের একটি লোকও তাঁরা রেখে যেতে পারেনি। ইছামতী নদী বরাবর বিক্রমপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত সোনারগাঁওয়ে বহুদিন ধরে রাজরাজড়াগণ রাজত্ব করে যান। কিন্তু তাঁদের রাজত্বকালের নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে একটি মাত্র দালান—এক কালে এটি রাজকোষরূপে ব্যবহৃত হতো। সোনারগাঁওয়ের হিন্দু রাজ্য প্রায় বিনা যুদ্ধেই মুসলিম আক্রমণকারীদের পদানত হয়। আফগান সৈন্যবাহিনীর নায়করূপে বখতিয়ার খিলজী বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে তাঁর রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে বিতাড়িত করেন এবং আরো পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে সোনারগাঁও অধিকার করেন। এইভাবে তিনি দিল্লীর বাদশাহ্‌র অধীনে একটি শাসনকর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

প্রাক-মুসলিম যুগে বাংলা দেশের কোন সাধারণ নাম ছিলো না। মুসলমানগণ নিজেরাই তাদের বিজিত এই প্রদেশকে লক্ষ্মণাবতী বলে জানতেন। ভারতীয় ইতিহাসে বাংলা দেশের প্রথম নাম 'বঙ্গ' বলে উল্লিখিত হয়। সম্ভবতঃ অঙ্গ শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। অঙ্গ শব্দের অর্থ পূর্ব (?) 'যেমন বাঙ্গালা অগাব' অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলীয় মহাসাগর (?)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে বাংলা দেশের নাম ইংলণ্ডে পৌঁছেনি। ইউরোপীয়দের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এ-দেশটির নাম বাঙ্গালা বলে উল্লেখ করেন, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলো। বঙ্গোপসাগরের মোহনাবর্তী সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি সাধারণভাবে এই নামে অভিহিত করেন।

মুসলিম রাজত্বকালে পূর্ব বাংলায় বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটে। সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তদেশে অবস্থিত থাকার জন্যে দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে এ-অঞ্চল শাসন করা সম্ভব ছিলো না। তাই যেসব

দোর্দণ্ড-প্রতাপ বাদশাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন, একমাত্র তাঁরাই এই সুদূর পূর্ব বাংলায় তাঁদেরই ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। উচ্চাভিলাষী সুবেদারগণ বাদশাহ্গণের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তাই দেখা যায়, মুসলমানদের বিজয়ের ন্যূনাধিক একশত বৎসরের মধ্যেই ফখরুদ্দীন দিল্লীর সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করে নিজকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন।

অতঃপর প্রায় দু'শ বছর ধরে এর শাসনকর্তৃত্ব ক্রমাগত হাত বদলায়। দেশের অধিকাংশ অধিবাসী তখনো হিন্দু। রাজশক্তির উত্থান-পতনের ব্যাপারে তারা উদাসীন থাকতো। সামরিক শক্তি ও শাসন-প্রতিভা-বলে মুসলমানগণ বাংলার প্রভুত্ব বিস্তার করেন; কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুব বেশী ছিলো না। সুলতানে সুলতানে বিবাদ বিসংবাদ হয়, লড়াই চলে। এ-দেশের বিজিত অধিবাসীরা নির্লিপ্ত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ পরবর্তী দু'শ বছর বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র আর যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি বিক্ষুব্ধ ইতিহাস। কোন পরাক্রমশালী শাসকের আবির্ভাব হলে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রু নিপাত করে নিজের শাসন-ব্যবস্থা কায়েম করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে শুরু হতো ভীষণ লড়াই—নেমে আসতো অরাজকতা, হত্যা ও লুটতরাজ। প্রতিযোগীদের মধ্যে যাঁর শক্তি সবচেয়ে বেশী, তিনি জয়ী হতেন। রাজ্য তার দখলে আসতো। কিছুদিনের জন্যে শান্তি ফিরে আসতো। তাঁর মৃত্যুর পর আবার নেমে আসতো অরাজকতা। সেই একই ধারার পুনরাবৃত্তি চলতো। বস্তুতঃ এই সময়কার ইতিহাস বিভ্রান্তিকর। এক শাসকের পর আর একজনের আবির্ভাব ঘটতো পরম আকস্মিকভাবে।

আফগানরা ছিলো যোদ্ধা জাতি। চূড়ান্ত যুদ্ধ না করে তারা বিজয়ী মোগলদের কাছে রাজ্য ছেড়ে দেয়নি। মহামতি শের শাহের নেতৃত্বে তারা আর একবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো এবং শুধু বাংলাদেশই নয়—গোটা সাম্রাজ্যই মোগলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। হুমায়ুনকে বিতাড়িত

করে শের শাহ্ রাজত্ব করেন। কিন্তু এইখানেই শেষ; কারণ এর ত্রিশ বছর পরেই সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে আফগানদের শেষ আশাটুকুও চূর্ণ করে ফেলে।

এই সময়ে সোনারগাঁও সমৃদ্ধির শীর্ষ-সীমায় উপনীত। বয়নশিল্পের মান এখানে এতো উচ্চস্তরে পৌঁছে যে, প্রাচ্যের অন্য কোন বয়ন-কেন্দ্রই সোনারগাঁওয়ের সমকক্ষতা দাবী করতে পারতো না। বলা বাহুল্য, এই শিল্প বিজয়ী মুসলমানদেরই অবদান। একমাত্র এখানকার কারিগরই অত্যুৎকৃষ্ট মানের মসলিন বস্ত্র উৎপাদন করতে পারতো। মসলিনের খ্যাতি ঐ সময় ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখনকার দিনের ইটালী ও ফরাসীদের সর্বাপেক্ষা কুশলী কারিগরগণও এই বস্ত্র দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। পরিব্রাজকগণ তদানীন্তন কালের দ্রব্যমূল্যের সুলভতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে র‍্যাল্ফ ফিচ নামক জনৈক পরিব্রাজক এই অঞ্চল সফর করেন। তিনি এখানকার 'অপর্যাপ্ত চাউল, তুলা এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রেশমজাত দ্রব্যের' কথা বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি-অরাজকতা সত্ত্বেও এ-অঞ্চলের সমৃদ্ধি বিনষ্ট হয়নি। ভাগ্যান্বেষী ভ্রাম্যমান পর্তুগীজদের সাহায্যপুষ্ট মগ, আবাকানী ও জলদস্যুদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এর সমৃদ্ধি নিঃশেষ হয়ে যায়নি। মানুষ যা ক্ষতি করেছে, প্রকৃতি তা' পূরণ করে দিয়েছে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশে মোগলদের বিজয় পূর্ণ হওয়ার এবং বাদশাহী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই সোনারগাঁওয়ের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হয়ে আসে। এর পর এলেন একজন নূতন শাসক। কতকটা নিজকে চিরস্মরণীয় করে রাখার অভিলাষে এবং কতকটা প্রয়োজনের তাগিদে তিনি একটি নূতন রাজধানী স্থাপনের উদ্যোগ শুরু করলেন। পুরাতন রাজধানী পরিত্যক্ত হলো। ধ্বংস হয়ে গেলো তার সকল সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য আর গৌরব। পুরাতন রাজধানীর কুড়ি মাইল দূরে বুড়িগঙ্গার তীরে স্থাপিত হলো নয়া 'রাজধানী,

গড়ে উঠতে লাগলো ঢাকা নগরী। পরিত্যক্ত রাজধানীর সৌধমালার অঙ্গ থেকে খুলে নেয়া ইট-পাথর দিয়ে তৈরী হতে লাগলো তার অঙ্গাভরণ। সুবেদার ইসলাম খাঁর পরিকল্পিত বাংলার রাজধানী ঢাকা নগরী এমনিভাবে গড়ে উঠতে থাকে।

পরবর্তী একশত বৎসরকে নয়া রাজধানীর স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই সময় অনেক পরাক্রান্ত ও মহানুভব সুবেদার পর পর এদেশে প্রেরিত হন। তাঁদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করে রেখেছে। এঁদের মধ্যে রয়েছে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁ। তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের একান্ত বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী। তিনি আফগান শক্তিকে নির্মূল করে ফেলেন। রয়েছেন ইব্রাহীম খান। বহু যুদ্ধের বিজয়মাল্য তাঁর কণ্ঠে শোভা পেতো। শুধু সমরক্ষেত্রেই যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাই নয়; সুকুমারশিল্প এবং বাণিজ্যেরও তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। আছেন শাহ্‌জাহান—পরবর্তী কালে প্রিয়তমা মহিষীর স্মৃতিকে যিনি চির-স্মরণীয় করে যান তাঁর সমাধির উপর জগদ্বিখ্যাত তাজমহল রচনা করে। তাঁর পরে আসে সুলতান শুজার নাম। সেই হতভাগ্য সম্রাট-তনয় সাম্রাজ্য অধিকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পলাতকরূপে এখানে বাস করেন এবং পরে আরাকানীদের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। মনে পড়ে, বিখ্যাত আসাম অভিযানকারী মীর জুমলার কথা, যাঁর উচ্চাভিলাষ এবং অপরিসীম রণকুশলতা ও শাসনদক্ষতা আওরঙ্গজেবের মনেও ভয়ের সঞ্চার করেছিলো। কিন্তু এঁদের সবার উপর যাঁর নাম, তিনি হচ্ছেন সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ভ্রাতা আমীর উল ওমারা নওয়াব শায়েস্তা খান। এই নগরীর ইতিহাসে তাঁর নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকালের তরে।

কিন্তু ইতিহাসের এই স্বর্ণযুগের যবনিকাও এসেছিলো একান্ত আকস্মিক-ভাবে। একজন সুবেদারের খেয়াল-খুশিমত যেমন এই নগরী গড়ে উঠেছিলো আর একজন সুবেদারের খেয়ালেই তা আবার ভেঙে গেলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদ কুলি খান তাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত

করলেন। সুবেদার, তাঁর দরবার, পারিষদ-পরিত্যক্ত ঢাকার মর্যাদা ম্লান হয়ে গেলো। অস্তমুখী হলো তার সৌভাগ্য-সূর্য। সুবেদারের স্থলে একজন করে নায়েব নাজিম বহাল হলেন এখানে। ফলে এর সম্ভ্রম ও গুরুত্ব আর অবশিষ্ট রইলো না এবং বাংলার বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কচিৎ কদাচিৎ ঢাকার নাম উল্লেখ লাভ করে। পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে এই নগরীকে নানা ভাগ্য বিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়। যশোবন্ত নায়ের শাসনকালে একবার এর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছিলো। আবার মুরাদ আলীর অত্যাচারে বিব্রত হয়ে উঠেছিলো। আওরঙ্গজেবের আজীবন যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তিতে ক্ষয় ধরে গিয়েছিলো। দ্রুতগতিতে তা ভেঙ্গে পড়ছিলো। সাম্রাজ্যের সীমান্ত দেশে অবস্থিত থাকার দরুন কেন্দ্রীয় শক্তি শিথিল হওয়ার সাথে পূর্ব বাংলায় তার প্রতিক্রিয়া দ্রুত অনুভূত হতো। ভারতে মুসলিম শাসনের শেষ যুগে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পূর্ব বাংলার স্থানীয় শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হয়ে উঠে। তবে প্রদেশবাসীর সৌভাগ্যের কথা যে, এই সব শাসকের মধ্যে কেউ কেউ খুবই জ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

তারপর মুসলিম সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত, মারাঠাগণ বার বার বাংলায় আক্রমণ আর নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে যাচেছ, বাদশাহী ফরমান অচল হয়ে গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের রাজতখ্‌তে একজন অত্যাচারী স্বৈরাচারী নওয়াব সমাসীন, ঠিক এই সময়ে আকস্মিকভাবে নেমে এলো যবনিকা। ইংরেজ বণিকদের একটি ক্ষুদ্র দল আজ থেকে একশত কুড়ি বছর আগে বাংলায় সামান্য ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করে। দুর্ধর্ষ বণিক সম্প্রদায় নানা বাধা-বিপত্তির সাথে লড়াই করে এগুতে থাকে। তাদেরকে হয়রানির চূড়ান্ত হতে হয়েছে। কিন্তু তবুও তারা দমিত হয়নি। অনেক বিপর্যয়ের পর অবশেষে তারা নিজেদের জায়গা করে নিলো. সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পত্তন করে। এই দুর্গের পত্তন যেভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ, বণিক সম্প্রদায় অবশ্যই তখন তা কল্পনাই করতে পারেনি।* যাহোক, এর পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে

যায় এবং ফলে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা আক্রান্ত হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এর স্বার্থ রক্ষার জন্যে শাসন-ক্ষমতা হাতে নিতে বাধ্য হয়। ছিন্ন-ভিন্ন মোগল সাম্রাজ্য তখন সে ক্ষমতা পরিচালনে অপারগ হয়ে পড়েছিলো। বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার খাতিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু স্থানীয় শাসকগণ তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। এই বিপর্যস্ত প্রদেশে ইংরেজরাই শান্তি ও সুশাসন ফিরিয়ে আনে। ঢাকায় ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হওয়ার একশত বৎসর পর বাংলার পূর্বাঞ্চলের শাসন পরিচালনার জন্যে ঢাকায় সর্বপ্রথমে একজন কালেক্টর নিয়োগ করা হয়।

ব্যবসায়-বাণিজ্যই ছিলো কোম্পানীর মূল লক্ষ্য। অথচ সেই কোম্পানীর হাতে এ-দেশের শাসন ক্ষমতা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই ঢাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি নিভে গেলো। এটি অদৃষ্টের এক অদ্ভুত পরিহাস ছাড়া আর কি! ঢাকার এই পরিণামের কথা কোম্পানী ভাবতেও পারেনি। এর মূলে অনেক কারণ ছিলো, যার ফলে অপরিহার্যরূপে ঢাকার ভাগ্যে সে-পরিণাম এসে গিয়েছিলো। তবে একদিকে তার বিপর্যয় এসে গেলেও অন্যান্য দিকে তার লাভ হয়েছিলো প্রভূত পরিমাণে। যুদ্ধ, হত্যা ইত্যাদি অশান্তি দূরীভূত হয়েছিলো। এই প্রথম পূর্ব বাংলার ইতিহাসে সুদীর্ঘ শান্তি নেমে আসে। নিপীড়িত মানুষ জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বোধ করতে শুরু করে। তারা দেখতে পেয়েছিলো সমৃদ্ধি ও শান্তিময় এক নবযুগের সুপ্রভাত। রায়তগণ তার শ্রমের ফল সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে যায়। সুনিশ্চিত হতে পেরেছিলো যে, তাদের শ্রমের আবাদ আর কেউ কেটে নিয়ে যাবে না। কাজেই তারা দ্রুত চাষাবাদ বৃদ্ধি করতে শুরু করে। ঢাকার উৎপাদন-শিল্পের অবনতি ঘটার সাথে সাথে অনেক শহরবাসী জেলার দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং বন-জঙ্গল সাফ করে হিংস্র পশুদের বিতাড়িত করে জমি আবাদ করে নিতে এবং সে-সব স্থানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করলো।

ঢাকার জীবনে আজ আবার এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। দু'শো বছর ধরে রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকার পর আবার সে রাজধানীর গৌরবময় মর্যাদা লাভ করলো। এক কালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গদেশ গঠিত ছিলো। সেখান থেকে পূর্ব বাংলা কেটে নিয়ে তার সাথে আসাম জুড়ে দিয়ে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়েছে—নাম দেওয়া হয়েছে পূর্ব বঙ্গ-আসাম প্রদেশ। একজন লেফ্‌টন্যান্ট গভর্নরের হাতে এর শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে। এই প্রদেশের রাজধানী হলো ঢাকা। আগেকার বঙ্গদেশ এতো বৃহদায়তন ছিলো যে, একটি প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অত্যন্ত গুরুভাব বলে বিবেচিত হয়ে আসছিলো এবং এর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ ছিলো বলে প্রদেশের সাধারণ অগ্রগতির সাথে তাল রক্ষা করতে পারছিলো না। সংবাদপত্রও পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিলো। কাজেই এই অঞ্চলের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের যথাযথ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। বস্তুতঃ বঙ্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিলো দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, বঙ্গদেশের বাড়তি অংশটি কেটে নিয়ে এর অবাঞ্ছিত গুরুভার লাঘব করা। দ্বিতীয়তঃ, এর জন্যে একটি স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা—যাতে করে পূর্ব বাংলার স্বার্থ অধিকতর নিষ্ঠার সাথে রক্ষিত হয় ও এর সাধারণ অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেই বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা সম্পাদন করা হয়েছিলো। আগেকার প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষের উপর। অথচ মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০ লক্ষ। কিন্তু নবগঠিত প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ।

বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, সেগুলোর প্রধান হচ্ছে এই যে, যেসব আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি একটি প্রাচীন প্রদেশকে পুরাতন বন্ধন ডোরে বেঁধে রেখেছিলো, এই ব্যবস্থার দ্বারা সেগুলোকে ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রদেশটিকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছে। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যমাত্র জ্ঞানও যাঁর আছে, তাঁর কাছেই এ

যুক্তির অসারতা ধরা পড়বে। মুসলমান শাসনামলে বঙ্গদেশে কোন ঐক্য এবং এর দীর্ঘস্থায়ী কোন আয়তন ছিলো না। পর পর যেসব সুবেদার এ-দেশ শাসনের ভার পেয়েছেন, তাঁদেব অনেকেই রাজধানীও পরিবর্তন করেছেন। শুধু তাই নয়—তৎকালে এ-প্রদেশ যেভাবে গঠিত ছিলো, তার সাথে বৃটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের কোন সাদৃশ্য নেই। সেযুগে প্রায়শঃই বিহার ও উড়িষ্যার জন্যে সরাসরি দিল্লী থেকে পৃথকভাবে সুবেদার নিযুক্ত করা হতো। ছোটনাগপুর ও দামন-ই-কোহ্ তখনো প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ-ভাবে বিজিত হয়নি। আবার খোদ বাংলা প্রদেশকে নায়েবে নাজিমদের **(Deputy Governor)** অধীনে ক্রমাগত বিভক্ত করে রাখা হয়েছিলো, তাঁদেব উপরে ছিলেন সুবেদার। একজন লেফ্টনান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার আকার বা গঠন-বিন্যাস সম্পূর্ণরূপে একটি হাল আমলের পরিকল্পনা। এবং এই পরিকল্পনা বৃটিশ শাসনকালে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াব অনেক পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্যকরী করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাব অবয়বেব বয়স ১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবরে অর্থাৎ 'বঙ্গ-ভঙ্গেব' দিনে একশত বৎসবেরও অনেক কম।

বস্তুতঃ বাংলা-বিভাগ সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের অভিনন্দন লাভ করেছে। এর দ্বারা যে অদূর-ভবিষ্যতে তাদের প্রভূত কল্যাণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমানগণ নিরতিশয় অজ্ঞ এবং পশ্চাদ্পদ। আধুনিক অবস্থার সাথে হিন্দুরা যেমন ত্বরিৎগতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তা তারা পারেনি বা সেদিকে কোন আগ্রহও দেখায়নি। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই হিন্দুদের হাতে। আন্দোলনের কুশলতা জানা না থাকায় ও নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কিভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার ফলে অপরিহার্যরূপে মুসলমানেরা পেছনে পড়ে থাকে। এখন এই নয়া প্রদেশের তারা হবে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রদেশের আয়তন ১,৬০,০০০ বর্গমাইল। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ নবগঠিত প্রদেশটিতে তাদের স্বার্থ স্থানীয়

শাসকদের কাছে পূর্ণ বিবেচনা লাভ করবে। প্রথম লেফটন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার কে. সি. এস. আই. ইতিমধ্যেই জনহিতকর কার্য সম্পাদন করেছেন। গত ২০শে আগস্ট তিনি পদত্যাগ করায় মুসলিম সম্প্রদায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। অনারেবল মিঃ হেয়ার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। যে সব উন্নতিমূলক কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, আশা করা যায়, সেগুলো তাঁর আমলে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে এবং এ-সব কাজের সাফল্যই এই নয়া প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করবে।

প্রদেশ বিভাগের ফলে ঢাকায় ইতিমধ্যে পুনরুজ্জীবনের আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই প্রাচীন বাদশাহী নগরী অপূর্ব প্রাণ-স্পন্দনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এর আকাশে-বাতাসেও যেন আজ প্রাণের প্রবাহ—জাগরণের সাড়া। সামরিক কর্মচারী ও সরকারের অপরাপর কর্মচারী ও অফিস-আদালতের জন্যে নূতন নূতন ইমারত গড়ে উঠছে। এতোদিন যে নগরী নিস্তেজ ও নির্বীর্য হয়ে পড়েছিলো, আজ তার প্রতিটি ধমনীতে, শিরায়-উপশিরায় রক্তের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—জীবনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই নগরীতে এখন থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে অন্ততঃপক্ষে তিন কোটি মানুষের ভাগ্য—তাদের জীবন-মরণের সাথে জড়িত সকল গুরুতর সমস্যার বিচার হবে এখানে বসে। এর দীর্ঘ দিনের নিদ্রার অবসান হয়েছে। দেশের কারুশিল্প এবং বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, হয়তো বা তার সাথে সাথে ঢাকার সেই সুবিখ্যাত মসলিন-শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। আর এর কারুকার্য আবার পাশ্চাত্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করবে। এর শিল্প-নৈপুণ্য এখনো সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। উপযুক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করলে এই শিল্প আবার পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। জীর্ণপ্রায় মসজিদ ও হর্ম্যগুলোর ধ্বংস রোধ করে সযত্নে সংরক্ষিত করা হলে সেগুলো এই নগরীর অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য ও এর মহান অতীতের স্থায়ী স্মারক-চিহ্নরূপে বিদ্যমান থাকবে। এতোদিন ধরে মৃত্যুর মতো মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকার পর ঢাকা আবার জেগে উঠেছে। অতীতের অসংখ্য স্মৃতি

আর ভবিষ্যতের অজস্র সম্ভাবনা—এই দু'য়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনাগত দিনের দিকে তাকিয়ে আছে বহু আশা নিয়ে। স্থির বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছে সেই অনাগত দিনের জন্যে, যে দিন সকল প্রতিশ্রুতি, সকল সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিক্রমপুর রাজ্য

গঙ্গা, বুড়িগঙ্গা, মেঘনা, ইছামতি ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে যে-অঞ্চলটিকে অসংখ্য স্রোতস্বিনী জালের মতো ঘিরে রয়েছে, সেখানেই ছিলো প্রাচীন কালের বিক্রমপুর রাজ্য। পূর্ব বাংলার বিশাল জলপ্রবাহের ঠিক কেন্দ্রভাগে অবস্থিত থাকার দরুন সে-যুগে এ অঞ্চলটির অপরিসীম গুরুত্ব ছিলো। কারণ সে-যুগে স্থলপথ খুব কমই ছিলো এবং স্থলভাগের অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো। কিন্তু এই অঞ্চলটির চারধারে ছিলো বিস্তৃত জলপথ—বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চির উন্মুক্ত পথ। স্থলপথ পথিকের পক্ষে ছিলো বিপদ-সঙ্কুল। সমগ্র পূর্ব বাংলা ছিলো অরণ্যাচ্ছাদিত। এই সব বিপদসঙ্কুল ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে স্থলপথে যেতে হলে একদল সৈন্য আর এক পাল হাতীর দরকার হতো। হিংস্র জীবজন্তুও সব সময় ওঁৎ পেতে থাকতো। অবশ্য নদী-পথেও বিপদ ছিলো। বড়ো বড়ো নদীতে ঝড়ের মুখোমুখি হতে হতো এবং প্রতি বছরই তাতে বহু মানুষের প্রাণ যেতো। কিন্তু বুনো পথের বিপদের তুলনায় তা তেমন কিছুই নয়।

বিক্রমপুরকে নিয়ে যতো গল্প-কাহিনী গড়ে উঠেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে বড়ো বড়ো নদীগুলোর এক একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রাচীনকাল থেকে এই সব নদীবাহিত মৃত্তিকা জমে জমে বিক্রমপুর দ্বীপের আকার ধারণ করেছিলো। নদীগুলো যেনো বিক্রমপুরের উপর সদা-প্রসন্ন দৃষ্টি রেখে এসেছে। এগুলো স্তর থেকে সামান্যমাত্র উঁচু থাকার দরুন বর্ষায় এই ভূখণ্ডটি প্রায় জলমগ্ন হয়ে থাকে। ফলে প্রতি বছর নদীগুলোর পলিমাটিতে এর উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এসব নদী যে শুধু জমিতে নূতন শক্তি বৃদ্ধি করে

তাই নয়, এগুলো বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যাপারে প্রতিরোধ-প্রাচীরের কাজ করে। বছরের প্রায় অর্ধেক ভাগ জল-বেষ্টিত থাকে। অসাবধানী শত্রুরা আকস্মিক প্লাবনের আঘাতে বার বার ভেসে গেছে। যে রাজ্যে স্থলভাগ নেই, তা যুদ্ধ করে অধিকার করা অসম্ভব। তাই দেখা গিয়েছে যে, বহিঃশত্রুরা বারংবার এই দেশে হানা দিয়েছে; কিন্তু প্রতিবারই প্রতিহত হয়েছে।

হিন্দু পুরাণ-মতে রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে তাঁর রাজ্য স্থাপন করে-ছিলেন। বহু দেশ, বহু রাজ্য ঘুরে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে তিনি এমন একটা স্থানের সন্ধান করেছিলেন, যেখানে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো শান্তির মধ্যে অতিবাহিত করতে পারেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি অসংখ্য নদীবেষ্টিত এই উর্বর ভূখণ্ডে এসে উপনীত হন। এ-দেশের চির-শ্যামলতা তাঁর চোখে মেখে দিলো মায়ার অঞ্জন। বিমুগ্ধ করে দিলো এ-দেশ তাঁকে। তাই তিনি এখানে তাঁর রাজ্য স্থাপন করলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের ইতিহাস কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাতে শুধু এই কথাই জানা যায় যে, তিনি খুব জ্ঞানী এবং ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন এবং তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বিদ্যাবত্তার কথা বহু রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এখানেই বিক্রমপুরের প্রথম কাহিনীর শেষ; শুধুমাত্র পড়ে রয়েছে তাঁর রাজধানী পৌরাণিক অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি বহন করে।

পরবর্তী যুগ সম্পর্কে লোকগাথা বা কিংবদন্তী আরো নীরব। বিক্রম-পুর থেকে ব্রাহ্মণ-শক্তি কি করে খর্ব এবং ক্রমে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলো, তা বলা অসম্ভব। কিভাবে পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের আবির্ভাব হয়, কি করে মুষ্টিমেয় কতকগুলো লোক এদেশের জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং হাজার বছর ধরে তাদের শাসন করে, তা আজ বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। তবে তারা যে এখানে বিজয়ীর বেশে এসেছিলো এবং যে-ধর্মের প্রভাব সে-যুগে সমগ্র ভারতকে মাতিয়ে তুলেছিলো, তা যে তারাই এখানে বহন করে আনে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যীশুখ্রীস্টের জন্মের

চার শতাব্দী পূর্বে এই বিস্ময়কর শক্তিশালী ধর্মের আবির্ভাব ঘটে এবং সমগ্র জগতের মর্মমূলে আলোড়নের সৃষ্টি করে। বহুদিনের তপস্যার পর গৌতম বুদ্ধ অবশেষে সত্যের সন্ধান লাভ করেন। এবং একটি নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন। অতি চমৎকার এবং সহজ সে-ধর্ম, কিন্তু বেশ কঠিন তা পালন করা। এই ধর্মমতে দানেব চেয়ে কর্ম বড়ো, প্রার্থনাব চেয়ে আত্মসম্মান অনেক বড়ো। চিন্তা, বাক্য ও কার্যের পবিত্রতা রক্ষার দ্বারাই বিক্ষুব্ধ জগত ও নিপীড়িত মনুষের বহু-বাঞ্ছিত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যে-দেশের মানুষ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জপমালা ও কোষাকুষি সঞ্চালন এবং বাহ্যিক পবিত্রতা রক্ষার মধ্যে ধর্মের চরম লক্ষ্য নিহিত বলে মনে করতো, গৌতম বুদ্ধ তাদের কাছে বহন করে আনলেন এক বিস্ময়কর বাণী। তাঁর জীবনপদ্ধতি এবং শিক্ষায় সে যুগেব মানুষ তাঁব প্রতি এতো অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে, তাবা ঘর-সংসার ত্যাগ করে দলে দলে তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে এবং তাঁব নূতন শিক্ষায় অজ্ঞাত পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে শুরু করে।

এ ধর্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সাথে সম্রাট অশোকের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কাবুল থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর এ বিশাল রাজ্যে তিনি বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন ভারতের এ এক বিচিত্র এবং বিরল চিত্র। মানুষ সচরাচর যে ধরনের ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রচার করে এসেছে, এ তা থেকে আলাদা। এ হচ্ছে মন ও চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবেশী এবং সমগ্র প্রকৃতির প্রতি একনিষ্ঠভাবে কর্তব্য পালনের রাষ্ট্রীয় অনজ্ঞা। তাঁর সময়ে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা বিদ্যমান ছিলো এবং মতবাদের জন্য নির্যাতনের কথা কেউ জানতো না। অশোক তথা বৌদ্ধমতবাদের মূল কথা ছিল যে, মানুষ নৈতিক অনুজ্ঞা মেনে চলুক এবং পরস্পরে পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্য রেখে নিরূপদ্রব জীবন যাপন করুক।

ধর্মের এ-সব উচচ আদর্শ সাথে নিয়েই পাল রাজাগণ বিক্রমপুরে আগমন করেন। নবীন ধর্মের উদ্দীপনাই তাঁদেরকে হিন্দুধর্ম অনুসারীদের

উপর প্রধান্য স্থাপনে সাহায্য করে। হিন্দুদের ধর্মীয় উদ্দীপনায় বহুদিন পূর্বেই ভাটা পড়ে গিয়েছিলো। তবে এ-কথাও সত্যি যে, বৌদ্ধধর্ম প্রথম থকে শেষ পর্যন্ত শাসক জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তা ভারতের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। তারা হিন্দুধর্মের প্রাণহীন পূজা-আচারকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। হিন্দু মন্দিরগুলোর পাশাপাশি বৌদ্ধ মঠগুলো গড়ে ওঠে। ভিন্ন মত ও পথ ধরে তারা একই মহালক্ষ্যে পৌঁছুবার সাধনায় মগ্ন থাকে। এতো কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পর থেকে অনেক দূরে রয়ে গেলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এতো নিকটে থেকেও একে অপরকে আকর্ষণ করতে পারলো না। বৌদ্ধবাদ ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম। রাষ্ট্রের পতনের সাথে সাথে সে-ও বিলুপ্ত হয়ে গেলো। পাল বংশের পতনের সাথে বৌদ্ধধর্মের নাম-নিশানা বিক্রমপুর থেকে এমনভাবে মুছে গেলো, যেনো কোন কালেই এর কোন অস্তিত্ব ছিলো না।

কিভাবে বিক্রমপুর থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো এবং সেনরাজ বংশের উদ্ভবের সাথে সাথে হিন্দুধর্মের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিলো, সে-সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। কিংবদন্তী থেকেও অনুমান করা শক্ত। মনে হয়, হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরে মানুষের মনকে উজ্জীবিত রাখার পর বৌদ্ধধর্ম প্রথম যুগের মহান আদর্শ হারিয়ে ফেলেছিলো এবং এর যারা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অর্থাৎ শাসক জাতি বহুদিন ধরে শাসন-ক্ষমতা ভোগ করার দরুন ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের শাসক জাতিগুলোর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে এরূপ ঘটে এসেছে। অথবা এ-ও হতে পারে যে, পূর্ব বাংলার সেন রাজবংশের প্রথম নৃপতি রাজা আদিশূর হিন্দুদের মনে নূতন শক্তি ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাহুবলে বৌদ্ধ রাজাদের বিতাড়িত করে বিক্রমপুরে একটি নূতন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

অতীতের অস্পষ্টতা আর দুর্জ্ঞেয়তার কুয়াশা এর পর থেকে আস্তে আস্তে অপসৃত হতে থাকে এবং সেই যুগের অনিশ্চিত পটভূমির উপর রাজা আদিশূরের স্মৃতি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে। হিন্দুদের কাছে তিনি যুগ যুগ ধরে

নমস্য হয়ে এসেছেন। পূর্ব বাংলায় হিন্দুদের ধর্মীয় পনর্গঠন এবং বর্ণ-বিভাগের সংস্কারের কৃতিত্ব তাঁরই উপর আরোপিত হয়ে এসেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ শাসনাধীনে নাকি হিন্দুধর্মের এমন অধঃপতন ঘটেছিলো যে, ঠিকমতো পূজা করতে পারে এমন একটি ব্রাহ্মণও তিনি তাঁর সারাটি রাজ্যে খুঁজে বের করতে পারেননি। তিনি দেখলেন যে, খাঁটি ব্রাহ্মণদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এমন একটি রাজ্যের শরণাপন্ন হতে হবে, যেখানে অধিক কাল অ-হিন্দু রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ন। বিভিন্ন রাজ্যে দূত প্রেরণ করা হলো। তাঁদের খবরে জানা গেলা যে, কনৌজ রাজ্যে খাঁটি ব্রাহ্মণ আছে। সুতরাং তিনি নিজ রাজ্যের হিন্দুধর্মের দুর্দশার কথা জানিয়ে কনৌজ-রাজের কাছে এক মন্ত্রী প্রেরণ করেন এবং হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারে সাহায্যকল্পে একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁর রাজ্যে প্রেরণের অনুরোধ জানালেন। তাঁর অনুরোধক্রমে কনৌজ নগরী থেকে পাঁচজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রেরিত হলেন। যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সাথে আদিশূর তাঁদের তাঁর রাজধানী রামপালে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই সব ব্রাহ্মণ কালক্রমে ধনে-জনে খুব উন্নতিলাভ করেন এবং জীবনাদর্শের দ্বারা হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ সাধনে সমর্থ হয়েছিলেন।

আদিশূরের পর বল্লাল সেন রাজত্ব করেন। বিক্রমপুরের রাজাদের মধ্যে তাঁর খ্যতিই সর্বাধিক বিস্তৃত। তাঁকে কেন্দ্র করে বহু কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। এ-সব কিংবদন্তী এখনও বিক্রমপুরে বেঁচে আছে। তাঁর খ্যাতি এতো বিপুল এবং দূর-বিস্তৃত ছিলো যে, তাঁর পরবর্তী কালেরও বহু স্মরণীয় কীর্তি তাঁর উপর আরোপ করা হয়ে এসেছে ফলে এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে যে, তাঁর সময়ের বহু শতাব্দী পরের ঘটনাও তাঁর আমলে ঘটেছিলো বলে এসব কিংবদন্তী থেকে মনে হবে। প্রচলিত কোন কোন গল্পে বলা হয়েছে, তিনি বিক্রমপুরে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আদিশূরের পুত্র ছিলেন। আবার কোন কোন গল্পে তাঁকে সেন বংশের শেষ রাজা বলে দেখানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরই নাকি রাজ্য মুসলমানদের হাতে চলে যায়।

মনে হয়, এ বংশে বল্লাল সেন নামে দুজন রাজা ছিলেন। তাঁদের একজন আদিশূরের পুত্র এবং অপরজন এই বংশের শেষ রাজা। কিন্তু তাঁদের নামে গাল-গল্প এবং কিংবদন্তী এমনিভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে যে, কার আমলে কোন্ ঘটনা ঘটেছিলো, তা এখন আর আলাদা করে দেখার উপায় নেই।

এতো পূজ্যপাদ যে-ব্যক্তি তাঁর জীবনের সাথে যে অলৌকিক ঘটনাবলী জুড়ে দেওয়া হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি? যে ব্রহ্মপুত্র নদ এ-দেশের মানুষ ও মাটির উপর অপ্রতিবোধ্য প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, তাকেও জড়ানো হয়েছে এসব কাহিনীর মধ্যে। হিন্দুদের রূপকাহিনীতে তিনি এক মহানায়ক। এরূপ কাহিনী মতে তিনি দেবতারূপী ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। আদিশূরের পত্নীদের মধ্যে তাঁর মাকেই রাজা সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। রাজা তাঁর প্রতি রানীর বিশ্বাসঘাতকতা ধরে ফেলেন। কিন্তু এর মধ্যে ছিলো দৈব নির্দেশ। রাজা তা বুঝতে পারেননি। তিনি রাগে-ক্ষোভে রানীকে রাজপ্রাসাদ থেকে দূর করে দেন। মনঃক্ষোভে রানী ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু এই পূণ্য-সলিলা নদ তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে দ্রুতগতিতে এবং নিরাপদে অপর পাড়ে নিয়ে গেলো এবং সেখানে দেবী দুর্গার কাছে তাঁকে সঁপে দিলো। নিকটেই বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ছিলো তাঁর গৃহ। সেখানে নদীর কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো আর দেবী দুর্গার রক্ষণা-বেক্ষণে বড় হতে থাকলো। সেখানে সে নানা বিদ্যায় কুশলী হতে থাকে এবং তার জ্ঞানবুদ্ধিও অসম্ভব রকম বাড়তে লাগলো। একদিন তিনি বনপথে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর রক্ষাকর্ত্রী দুর্গার মূর্তি এক জঙ্গলের মধ্যে লুকানো অবস্থায় দেখতে পান। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি সেখানে 'ঢাকা-ঈশ্বরী' বা লুক্কা-য়িত দেবীর মন্দির নির্মাণ করলেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই নগরীর নামের উৎপত্তি এখান থেকেই। দেবীর অনুগ্রহে বল্লাল সেন বড় হতে লাগলেন আর শৌর্য-বীর্যও তাঁর বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তাঁর রাজোচিত গুণাবলীর কথা শুনতে পেয়ে পিতা তাঁকে দেখতে চাইলেন। পুত্রকে তাঁর কাছে

যখন আনা হলো, তখন তাঁকে দেখে পিতার মনে এমন স্নেহ উচ্ছ্বলিত হয়ে ওঠে যে, তিনি তঁ.কে তার রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন।

বল্লাল সেনের জন্মবৃত্তান্ত ও যৌবনের কাহিনী অবলম্বন করে এমনি একটি কিংবদন্তী গড়ে ওঠে। অপর এক কিংবদন্তীতে তাঁকে কামরূপ অভিয.নকারী বিখ্যাত যোদ্ধা বিজয়সিংহের পুত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেনল্যাকের যুদ্ধে উইলিয়াম দি কংকারার স্যাকসনদের হাত থেকে যে-বৎসর ইংলণ্ডের সিংহাসন কেড়ে নেন, সেই ঐতিহাসিক সনে তিনি পূর্ব বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে দেখানো হয়ে থাকে। রাজধানী রামপালে যা-কিছু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে, তার সবগুলোর সাথেই তাঁর নামকে জড়ানো হয়ে থাকে। বল্লাল সেন বহু ইমারত ও রাস্তা নির্মাণ এবং দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সেই রাজধানীর জীর্ণ কংকাল আজো পড়ে আছে। তা থেকেই কল্পনা করা যায় যে, কত বিরাট কল্পনা নিয়ে এ-টি তৈরী হয়েছিলো। অবশ্য এর নির্মাণ-প্রণালী জানার মতো এতোটুকু স্থপতি-নিদর্শনও অবশিষ্ট নেই। প্রায় ৩ হাজার বর্গফুট পরিমিত এলাকা জুড়ে তাঁর রাজধানী গড়ে উঠেছিলো, দুশো থেকে তিন শ' ফুট চওড়া পরিখা-বেষ্টিত এই রাজধানীর একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিলো—পূর্বদিকে। পরিখায় ঘেরা এই রাজধানী যেখানে অবস্থিত ছিলো সেখানে এখন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মৃন্ময় স্তূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজ-রাজড়ারা এক কালে যেখানে পারিষদদের নিয়ে বিচার-আচার করতেন অথবা যে-স্থানে ছিলো সেনাবাহিনীর ছাউনি, কৃষকেরা আজ পরম নিশ্চিন্তে চাষ-আবাদ করে যাচ্ছে সে সব স্থান। এক কালে যে সব ইট রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য বর্ধন করতো, তার অনেকগুলোই এখন রামপালের অধিবাসীরা তাহাদের ঘরে ব্যবহার করছে। ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন কালে এখান থেকে অনেক ইট-পাথর নদীপথে ঢাকায় এনেছিলেন। বহুদিনের পরিত্যক্ত এ স্থানে প্রচুর গুপ্তধন রয়েছে বলে সাধারণ লোক মনে করে। তবে এ-ব্যাপারে একটি সত্য ঘটনা আছে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে একজন কৃষক ভূমি কর্ষণকালে এখানে একটি জ্যোতির্ময়

হীরক পেয়েছিলো। তখনকার দিনেই এর দাম ছিল সত্তর হাজার টাকা। এক কালে বল্লাল সেনের প্রাসাদে যে এ-টি জ্যোতি বিকাশ করতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রামপাল যেনো কিংবদন্তীর রাজ্য। এমন কি, বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত রাস্তাগুলোকে নিয়েও এমনি অদ্ভুত কাহিনী গড়ে উঠেছে। চওড়া এবং উঁচু এইসব সড়ক নদীর পাড়ের উপর দিয়ে তৈরি হয়েছে। যে-কালে রাজার হুকুম পাওয়ামাত্র প্রজাদের দৌড়ে এসে হুকুম তামিল করতে হতো, সে যুগের বিরাটকায় এসব সড়ক। এগুলোর মধ্যে অন্যতম সুদৃশ্য রাস্তাটি পদ্মা পর্যন্ত প্রসারিত। এটির নির্মাণ-কাহিনীকে নিয়েও কিংবদন্তীর উদ্ভব হয়েছে। কথিত আছে যে, জ্যোতিষীরা গণনা করে বলেছিলো যে, বল্লাল সেনের গলায় মাছের কাঁটা বিঁধে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাজা ভীত হয়ে পড়েন এবং তিনি তাঁর ভোজন-উপকরণ থেকে মৎস্য বর্জন করেন। পদ্মায় 'কাচুকী' নামে এক প্রকার মাছ পাওয়া যেতো। এ-মাছের কাঁটা ছিলো না। সেই মাছ যাতে রাজপ্রাসাদে সহজেই সরবরাহ হতে পারে, সে-জন্য তিনি ঐ সড়ক নির্মাণ করেছিলেন। এ কারণে ঐ রাস্তা 'কাচুকী দরওয়াজা' নামে খ্যাত হয়েছে।

বল্লাল সেনের বাড়ীর উপকণ্ঠস্থ রামপাল দীঘিকে নিয়েও গড়ে উঠেছে এরূপ কল্পকাহিনী। এক মাইল দীর্ঘ, পাঁচশত গজ চওড়া এই দীঘিটি প্রাচীন হিন্দু রাজাদের বৃহদাকার পূর্ত পরিকল্পনার একটি নিদর্শন। অন্যান্য সব কিছুর মতো দীঘিটিও কালের স্পর্শ এড়াতে পারেনি। রামপালের সব কিছুর মতো এটির ভাগ্যেও জুটেছে অনাদর আর অবহেলা। ফলে এর বেশীর ভাগই মজে গিয়েছে। বছরের অধিকাংশ সময় সেখানে পানি থাকে না। কৃষকগণ সেখান থেকে বের করে নিয়েছে উর্বর ধান ক্ষেত। কিংদবন্তীতে বলে যে, দেবতাদের অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি জলসত্র দানের জন্যে তিনি এই দীঘি খনন করেছিলেন। একটি অদ্ভুত কৌশলে এর আকার স্থির করা হয়েছিলো। রাজা সিদ্ধান্ত

করেছিলেন যে, রাজার মা একবারও না থেমে এর-নগড়ে যদ্দূর পথ হেঁটে যেতে পারবেন, দীঘিটির দৈর্ঘ্য হবে ততোখানি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পরবর্তী রাতের মধ্যেই সমস্তটা দীঘি তিনি খনন করাবেন। রাজা মনে করেছিলেন যে, তাঁর মা সারাজীবন খুব কমই পায়ে হেঁটে পথ চলেছেন, কাজেই খুব বেশী দূর তিনি হাঁটতে পারবেন না এবং দীঘির আকারও খুব বড় হবে না। কিন্তু শীগ্‌গির রাজার চক্ষুস্থির। তার মার পায়ে হাঁটার শক্তি সম্পর্কে তিনি ধারণা করতে পারেননি। ভালভাবে অবগুণ্ঠিতা হয়ে পরিচারিকাদের নিয়ে রাজমাতা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন ত্বরিৎগতিতে। চলছেন তো চলছেনই। ক্লান্তি বা বিরামের লক্ষণ নেই। বল্লাল সেন ভীত হয়ে পড়লেন। কারণ এভাবে তিনি যদি ক্রমাগত চলতে থাকেন, তবে এক রাতে এতোবড় একটা দীঘি খনন করা সম্ভব হবে না। ফলে তাঁর সাংঘাতিক পাপ হবে। সে-পাপের ক্ষমা নেই। মা কিন্তু চলছেনই দ্রুতগতিতে। রাজা মরিয়া হইয়া উঠলেন। রানীমাতা মনে করেছিলেন যে, তাঁর পদযাত্রার ক্ষমতার উপর দানের পরিমাণ নির্ভর করছে। তিনি যতো বেশী এগুতে পারবেন, দীঘির আকারও ততো বড় হবে। আবার দীঘির আকার যতো বড় হবে, মানুষও তার দ্বারা ততো উপকৃত হবে। রানীমাতার দেহে যেন অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়েছে। দৈর্ঘ্যের প্রশ্নই এমন এক মারাত্মক সঙ্কটের সৃষ্টি করলো যে, বল্লাল সেনকে বাধ্য হয়ে চাতুরীর পথ বেছে নিতে হলো। তাঁর মার পায়ে সুকৌশলে এক ফোঁটা সিঁদুর দেওয়ার জন্যে তিনি ভৃত্যদের বলে দিলেন। মায়ের অজ্ঞাতে এই কার্য সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই বল্লাল সেন চীৎকার করে উঠলেন যে, তাঁর মায়ের পায়ে জোঁক লেগেছে। মা পায়ে লাল দাগ দেখে রক্ত বলে মনে করলেন এবং নীচু হয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর চলা থেমে গেলো। আর সেখানেই চিহ্নিত হলো দীঘির দক্ষিণ সীমান্ত। ঐ রাতেই বল্লাল সেন তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন। এক বিপুল জনবাহিনীর সাহায্যে সূর্যোদয়ের পূর্বেই খনিত হলো এক বিরাট জলাশয়—

যার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দৃষ্টি যেতো না। কিন্তু বল্লাল সেন আকার বৃদ্ধির ভয়ে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করায় দেবতাগণ রুষ্ট হয়ে যান। তাই তাঁদের শাপে যথেষ্ট গভীরতা সত্ত্বেও দীঘির তলায় পানি এলো না। দিনের পর দিন ধরে রাজা অধীর আগ্রহে দীঘির দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু পানির নাম-গন্ধ নেই। লজ্জায় রাজার মাথা কাটা যায়। অবশেষে রাজার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু রামপাল স্বপ্নে দেখলেন যে, দীঘিটিকে জলময় করতে হলে এবং তা জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী করতে হ'লে তাঁকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। রাজার পারিষদবর্গ এবং জনসাধারণকে দীঘির পাড়ে সমবেত করে রামপাল তাদের সামনে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন। বিস্মিত জনতাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে স্থির অচঞ্চল পদক্ষেপে রামপাল নেমে গেলেন দীঘির তলায়। অকস্মাৎ যেনো মাটি ফুঁড়ে তীব্র-গতিতে বেরিয়ে এলো উচ্ছ্বাস-মুখর সহস্র জলধারা। আর সেই আবর্তে নিমিষেই ডুবে গেলেন—তলিয়ে গেলেন রামপাল। বিহ্বল জনতা আর্তনাদ করে উঠলো, 'রামপাল! রামপাল! হায় রামপাল!!' কিন্তু রামপাল তখন মানুষের নাগালের অতীত। ইতিমধ্যে দীঘি কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে। রাজা শোকে ভেঙে পড়লেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমার পাপেই বন্ধুর মৃত্যু হলো। আমিই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী। কাজেই তাঁর নামেই এই দীঘির নামকরণ হবে—আমার নামে নয়। এর নাম হবে 'রামপালের দীঘি'। এই কারণেই এই জলাশয় রামপালের দীঘি নামে খ্যাত।

এর অদূরেই অবস্থিত একটি ছোট দীঘি। রামপাল দীঘির সাথে এর নামেও জড়িয়ে রয়েছে আর এক কাহিনী। রামপাল দীঘির খনন সমাপ্ত হলে বল্লাল সেন খননকারীদের প্রত্যেককে একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক কোদালি করে মাটি তুলে ফেলতে বলেন। খননকারীদের সংখ্যা এতো বিপুল ছিলো যে, তাদের প্রত্যেকে এক কোদালি মাটি তুলে ফেলতেই সাত শত বর্গহাত পরিমিত একটা জলাশয় তৈরি হয়ে যায়। ফলে এর নাম হয় 'কোদালি-ধোওয়া দীঘি'। এটি আজো এ নামে খ্যাত।

রামপাল দীঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত একশত হাত লম্বা একটি গজারি বৃক্ষ লক্ষণীয় বস্তু। এই মহামহীরুহের বয়স কত, কেউ জানে না। এর নামেও অলৌকিকত্ব আরোপিত হয়েছে। হিন্দুরা পরম ভক্তিভরে একে পূজা করে থাকে। এই গাছটির নাকি অলৌকিক শক্তি আছে। এটি অমর এবং এর প্রতিটি পল্লবকেই পরম পবিত্র বলে মনে করা হয়ে থাকে। এর রোগ-নিরাময়ী ও শুদ্ধিকরণ গুণ সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কেউ এর পাতায় হাত দিতে সাহস করে না। একদা এক ফকির নাকি এর কাছে আস্তানা গেড়েছিলেন ; সন্ধ্যায় তাঁর রান্নার জন্যে জ্বালানীর অভাব হওয়ায় তিনি যেই একটা ডাল কাটলেন, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো রক্ত-বমি। এই রক্তবমনেই তাঁর মৃত্যু হলো। নিঃসন্তানগণ সন্তান লাভের আশায় এর তলায় এ স পূজা দিয়ে যা। কৃষকগণ ক্ষেতের উপদ্রব লাঘবের জন্যে এর আশ্রয় মাগে। এই গাছটির কাছে চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে বহুকাল ধরে মেলা বসতো।

কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতার মতো বল্লাল সেনও প্রধানতঃ হিন্দু লোক-কাহিনীর মধ্যেই বেঁচে আছেন। ব্রাহ্মণ সমাজে আর একবার অধঃপতন এসেছিলো। আদিশূর কনৌজ থেকে বিদ্বান ব্রাহ্মণদের এনে কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সমাজে আবার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং হিন্দুদের পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথাযথভাবে প্রতি-পালনে অবহেলা এবং শৈথিল্য দেখা দেয়। বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করে দেখতে পেলেন হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা এবং জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু জাতির সংস্কার কার্যে মনোনিবেশ করলেন। অসবর্ণ বিয়ের ফলে উচ্চবর্ণের মধ্যে যে অধোগতি নেমে আসে, তা রোধকল্পে তিনি কঠোরভাবে জাতিভেদ প্রথা চালু করেন। কনৌজ ব্রাহ্মণদের বংশজাতদের দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। তাদের মধ্যে যে-সকল পরিবারে অন্য রক্তের মিশ্রণ ঘটেনি বলে স্বীকৃত, তাদেরকে এক শ্রেণীতে আনা হলো এবং কুলীন বলে তারা স্বীকৃতি লাভ করলো।

আর যারা অসবর্ণ বিয়ে করেছিলো, তারা শ্রোত্রীয় বলে আখ্যায়িত হলো। তবে মনে হয় এই বর্ণবিভাগ সব সময়ে খুব কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়নি এবং পরবর্তী কালে আরও শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিলো। যাদের রক্তের অবিমিশ্রতা সন্দেহ বা বিতর্কের অতীত বলে মনে করা হয়েছিলো, তাদের বলা হলো মুখ্য কুলীন। আর বাদবাকী ব্রাহ্মণেরা হলো গৌণ কুলীন। অর্থাৎ এরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলো। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মুখ্য কুলীন (বা বিশুদ্ধর উপর বিশুদ্ধ) তার স্ববর্ণের বাইরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারতো। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণজাত বিবাহযোগ্যা মেয়েদের উচ্চবর্ণের সাথে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রীতিমতো প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিলো। বিয়ের বাজারে কুলীনরা চড়া দামে বিকোত; ফলে একটা অদ্ভুত রীতির প্রচলন হয়ে গেলো। বিয়ে একটা ব্যবসায়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কুলীনের স্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম না থাকায় তার সুবিধার অন্ত ছিলো না। অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দু পাত্রের হাতে কন্যাদানে সর্বদা আগ্রহ বোধ করতো। উচ্চবর্ণের পাত্রের প্রথমা স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে হলে লাগতো প্রভূত পরিমাণের বরপণ ও যৌতুক। পরবর্তী বিয়েসমূহে ক্রমাগত পণের হার নেমে আসতো। অর্থাৎ স্ত্রীর সংখ্যা যত বাড়তো, বিয়ের বাজারে কুলীনের দামও ততো নেমে যেতো। এমন একটি কুলীনের খবর আমি জানি, যার স্ত্রী-সংখ্যা ছিলো একশত এবং তার তিন পুত্রের স্ত্রী-সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৫০, ৩৫ এবং ৩০। সৌভাগ্যক্রমে এ-সব বিপুল পরিবার একত্রে বসবাস করার চেষ্টা করতো না। তা করলে সমাজের শান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী ছিলো। যে-সব কুলীন বিয়েকে ব্যবসায়ে পর্যবসিত করেছিলো, তারা মনের আনন্দে বিয়েই করে যেতো—স্ত্রীর কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতো না। বিয়ে করার পর কনেকে বাপের বাড়ী রেখে চলে যেতো। কুলীন জামাতা লাভের পর সমাজে শ্বশুর কুলের মর্যাদায় উন্নীত হতো। এই মর্যাদার লোভে তারা কন্যা এবং কন্যার সন্তানাদির ভরণ-পোষণ করতো। কুলীন

পিতার একমাত্র যাতনা ছিলো কন্যাদায়। কন্যাদের পাত্রস্থ করার জন্যে চড়া পণ দিতে হতো। কিন্তু এসব কাণ্ডজ্ঞানহীন লম্পট কুলীন পিতার পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চড়া পণ দেওয়া সম্ভব হতো না। ফলে প্রায়শঃই তাদের কন্যাদের বিয়ে হতো না। এই কারণেই অবিবাহিতা বৃদ্ধার সংখ্যার ক্ষেত্রে ভারত অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে।

বল্লাল সেনের জন্মের মত মৃত্যুকে নিয়েও কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিলো। রামপালের অদূরে আবদুল্লাপুর গ্রাম। সেখানে এক মুসলমান পরিবার বাস করতো। বাংলায় মুসলিম অভ্যুদয়ের প্রাথমিক যুগে যারা এই অঞ্চলে আগমন করেছিলো, এই পরিবারটি ছিলো তাদের অন্যতম। গৃহকর্তার কোন্ সন্তান ছিলো না। ফলে গৃহকর্তার মনে কোন শান্তি ছিলো না এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। একদিন ভাগ্যক্রমে এক ফকির তার বাড়ী এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইলেন। গৃহকর্তা তখন নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবছিলো। ফকির ভিক্ষা চাওয়ায় সে রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলো, আমি সারাজীবন ধরে যা কামনা করে আসছি আল্লাহ্ যখন তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন, তখন আমি আল্লাহ্র নামে ভিক্ষাও দিবো না। জওয়াবে ফকির বললেন যে, আল্লাহ্র কাছে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে এবং অচিরেই সে একটি পুত্রসন্তান লাভ করবে। গৃহস্বামী আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো। ফকিরকে যথোচিত ভিক্ষাদানের পর সে জানতে চাইলো তার মনস্কামনা সত্য সত্যই পূর্ণ হলে সে ফকিরকে কি দান করবে। ফকির বললেন, সে যেন আল্লাহ্র নামে একটি গরু কোরবানী করে। যথাসময়ে গৃহস্বামী পুত্রসন্তান লাভ করলো। ফকিরের কথামত কোরবানীর আয়োজন শুরু করলো। কিন্তু তার চারধারে হিন্দু বসতি। তারা তার কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং তাকে কোরবানী করতে দিলো না। সে প্রতিজ্ঞা পালনে স্থিরসংকল্প। দূরে এক জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সে কোরবানী কার্য সমাধা করলো। তার প্রয়োজন অনুযায়ী গোশ্ত নিয়ে অবশিষ্ট অংশ গর্তের মধ্যে পুঁতে রেখে বাড়ী ফিরলো। কিন্তু পথিমধ্যে অকস্মাৎ এক চিল ছোঁ মেরে তার হাত থেকে এক টুকরো মাংস নিয়ে উড়ে গেলো বিক্রমপুরের

দিকে। রাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদের সম্মুখে চিলটি মাংসখণ্ড ফেলে দিলো। বল্লাল সেন টুকরোটা দেখে বুঝতে পারলেন যে, ওটি গরুর মাংস—যে-গরুকে তাঁর জাতি দেবতাজ্ঞানে পূজা করে থাকে। তিনি সাথে সাথেই চারধারে লোকজন পাঠালেন কোন্ মহাপাপিষ্ঠ এই কর্ম করেছে তার সন্ধান নিতে। বহু খোঁজাখুঁজির পর জঙ্গলে দেখা গেলো শিয়ালেরা একটা জন্তুর মাংস নিয়ে টানাটানি করছে। রক্তের দাগ অনুসরণ করে বুঝা গেলো যে, এটি উল্লিখিত গৃহস্বামীরই কার্য। সব কথা শুনে রাজা হুকম দিলেন যে, যে-সন্তানের জন্য গোবধ হয়েছে, পরবর্তী ভোরেই যেন তাঁর সামনে হাজির করে তাকে হত্যা করা হয়। যার জন্য এই মহাপাপের কারণ, পৃথিবীতে তাকে কিছুতেই বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

মুসলমানটি গোপনে রাজার ঘোষণার কথা জানতে পেরে ঐ রাতেই স্ত্রী এবং নবজাত শিশুটিকে নিয়ে বল্লাল সেনের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, সে ভারতবর্ষ অতিক্রম করে জন্মভূমি আরবদেশে চলে গেলো। অতঃপর মক্কাশরীফে বাবা আদম নামে একজন ফকিরের সাথে তার দেখা হলে সে তাঁর কাছে তার পলায়নের কারণ এবং আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। মুসলমানেরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে না—এমন দেশও আছে জানতে পেরে তিনি সাত হাজার শিষ্য-সাগরিদ নিয়ে বিক্রমপুরের পথে যাত্রা করলেন। ফকিরের প্রতিজ্ঞা, তিনি সেখানে গিয়ে সহধর্মীদের ধর্মপ্রচারের পথ বাধামুক্ত করে ছাড়বেন। পথে বহু দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে তিনি বিক্রমপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন এবং বল্লাল সেনের প্রাসাদ থেকে দেখা যায় এরূপ স্থানে মসজিদ স্থাপন করে প্রকাশ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে শুরু করলেন। অনেক ষাঁড় এবং গাভী কোরবানী দেওয়া হলো। আজানের উদাত্ত ধ্বনি প্রান্তর অতিক্রম করে রাজপ্রাসাদকে সচকিত করে তুলতে থাকলো। রাজা রাগে-রোষে ফেটে পড়েন। তিনি সাথে সাথেই নবাগতদের কাছে দূত পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর এবং তাঁর রাজ্যের ধর্মের পক্ষে অবমাননাকর

ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাদের বন্ধ করতে হবে নতুবা তাদের তাঁর রাজ্য ত্যাগ করতে হবে। বাবা আদম তাঁর অনুচরদের শক্তি সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত ছিলেন। তিনি রাজার কাছে উত্তর পাঠালেন, 'লা এলাহা···মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্—এক আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। মোহাম্মদ তাঁর রসুল।' বাবা আদম জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তাঁর ধর্মীয় অনুশাসন পালন করে যাবেন, তাতে রাজা যা খুশী করতে পারেন। রাজা তখন সৈন্য-সামন্ত জোগাড় করে বাবা আদমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ মুসলমান সৈন্যদের রণকুশলতার কথা বিক্রমপুরে অজানা ছিলো না। কাজেই বল্লাল সেন এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, যাতে করে পরাজয় ঘটলে তাঁর পরিবারের লোকজন বিজয়ীদের হাতে না পড়ে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে তিনি বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করালেন। নির্দেশ রইলো যে, যুদ্ধ থেকে যদি তিনি আর না ফিরেন, তাহলে যেন রাজপরিবারের সবাই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে এবং বিজয়ীদের হাতে পড়ে অপমানিত হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করে। বিজয়ী শত্রুদের অতর্কিত আক্রমণে যাতে করে তারা অপ্রস্তুত হয়ে না পড়ে এবং তাঁর পরাজয়ের কথা আগেই জানতে পারে, সেজন্যে রাজা এক সঙ্কেতের ব্যবস্থা করেছিলেন। সৈন্যসহ বল্লাল-বাড়ী থেকে যাত্রাকালে তিনি তাঁর বুকের কাছে পোশাকের ভাঁজের মধ্যে এক বার্তাবাহী পায়রা পুরে নিলেন। যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্যয় হলে তিনি কবুতরটি ছেড়ে দিবেন। ও-টি প্রাসাদে ফিরে আসবে। আর সেই হবে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানোর আর রাজার প্রিয় পরিজনবর্গের আত্মাহুতি দানের সঙ্কেত।

বাবা আদমের মসজিদ এখন যেখানে রয়েছে, সেখানেই উভয় পক্ষ মুখো-মুখী হয়ে দাঁড়ালো। এদেশে মুসলিম অভিযানের প্রথম অগ্রপথিকদের সাথে বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজার সেনাবাহিনী সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হলো। দীর্ঘ-দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হলো। বহুদিন পর্যন্ত জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রইলো। কিন্তু শেষের দিকে বল্লাল সেনের জয় হতে লাগলো। অবশেষে মুসলমানগণ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলো। তাদের প্রায় সবাই নিহত হলো। বল্লাল সেন

বাবা আদমের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন। সূর্য অস্ত গেছে। তাঁর ভাগ্যের আসন্ন পরিণামের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি কেবলামুখী হয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজরত বাবা আদমের কাছে এসে বল্লাল সেন শাণিত তরবারি দিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন। কিন্তু সে-আঘাতে কোন ফল হলো না। নামাজান্তে বাবা আদম বল্লাল সেনের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন—একজন ইসলামের প্রতিনিধি আর অপরজন হিন্দুধর্মের নায়ক। বাবা আদম বললেন, 'কেন তুমি আমার এবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে এসেছো।' বল্লাল সেন—'আমি এবং আমার জাতি যাদের পবিত্র জ্ঞানে পূজা করি, তাদের যে হত্যা এবং অসম্মান করেছে আমি তাকে বধ করতে এসেছি।' এ-কথা বলেই বল্লাল সেন ফকিরের দেহে তরবারি চালাতে লাগলেন। কিন্তু কোনই ফল হলো না। ফকিরের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগলো না। ফকির তাঁর নিহত শিষ্যদের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠে বললেন, 'তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হবে এটিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তবে কাফেরের তরবারির আঘাতে আমি মরবো না। এই নাও আমার তরবারি, আমাকে হত্যা করো। আমার তরবারি ছাড়া অন্য কারুর অস্ত্র আমাকে আহত করতে পারবে না। তোমার উপরও শিগ্‌গীর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসছে।' ফকিরের হাত থেকে তরবারি নিয়ে বল্লাল সেন তাঁকে আঘাত করলেন। এক কোপেই ফকিরের দেহ দ্বিখণ্ডিত হলো। খণ্ডিত দেহের এক অংশ অলৌকিক মহিমা বলে সাথে সাথেই চট্টগ্রামে পৌঁছে গেলো। বাবা আদমের পবিত্র স্মৃতি ধারণ করে সেখানে আরো একটি মসজিদ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে বল্লাল সেন রক্ত ধুয়ে ফেলার জন্য নদীতে গেলেন। নদীর জলে যেই তিনি ঝুঁকে পড়েছেন, অমনি তাঁর অজ্ঞাতে পোশাকের ভাঁজ থেকে পায়রাটি পালিয়ে গেলো। রাজার পরিবার-পরিজনবর্গ প্রাসাদ-প্রাচীরে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল আগ্রহে যুদ্ধের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। অবশেষে তারা দেখতে পেলো সান্ধ্য-আকাশে সেই পায়রার

সাদা দু'টো পাখা। সোজা সে উড়ে এলো রাজপ্রাসাদে। পাখী তো জানতো না কত বড় ভযাবহ পরিণামবাহী মিথ্যা সংবাদ সে নিয়ে এসেছে। বল্লাল-বাড়ীর প্রাসাদের উচ্চতম শীর্ষে বসে পরম তৃপ্তির সাথে সে বাঁকতে শুরু করে। আর সাথে সাথে অন্তঃপুর থেকে মর্মভেদী রোদন আর বিলাপ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বিলাপ আর শোকেরও যে সময় ছিলো না। বিজয়ী সেনারা শীগ্‌গীর এসে পড়বে এবং বর্ণগর্বী জাত্যাভিমানী এই রাজপরিবারের মান-ইজ্জত নষ্ট করে ফেলবে। তাই তক্ষুণি কুণ্ডে অগ্নিসংযোগ করা হলো। বল্লাল সেনের সমস্ত পরিবার সেই জ্বলন্ত কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেলো।

ওদিকে রাজা নদী থেকে রক্ত ধুয়ে উপরে উঠতেই দেখতে পেলেন রাজপুরীর মাথায় ধূম্রকুণ্ডলী। ত্বরিৎগতিতে তিনি সেদিকে ধাবিত হলেন। পায়রাটি উড়ে গেছে দেখতে পেয়ে তিনি সবই বুঝতে পারলেন। উন্মাদের মতো ছুটে এলেন রাজপুরীতে। কিন্তু ফকিরের অভিশাপ বড়ো তাড়াতাড়ি লেগে গিয়েছিলো। বল্লাল সেন যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন সবই শেষ—তার বংশের আর কেউ অবশিষ্ট নেই। দুঃখে-শোকে রাজা ঝাঁপ দিলেন সেই জ্বলন্ত কুণ্ডে। নিয়তির নির্মম হাতে এভাবে শেষ হয়ে গেলেন বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা। বলা বাহুল্য, রাজা বল্লাল সেন আজো লোক মুখে পোড়া রাজা নামে খ্যাত।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম শক্তি চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠার পর বিজয়ী মুসলমানগণ যে স্থানে বাবা আদমকে হত্যা করা হয়েছিলো সেই স্থানে একটি মসজিদ স্থাপন করেন। মসজিদ-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে—'জালাল উদ্দীন ফতেহ্ শাহ্‌র রাজত্বকালে (১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দ) ৮৮৮ হিজরী সালের রজব মাসের মাঝামাঝি' এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো। বর্তমানে এটি চরম দুর্গতির কবলে পতিত। প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায়ও এর মধ্যে গৌরবময় দিনের স্বাক্ষর এখনও বিদ্যমান রয়েছে। মুসলমান আমলের খুব পাতলা ইট দিয়ে তৈরী মসজিদটি কারুকর্মে অলংকৃত। এর ছ'টি গম্বুজের মধ্যে তিনটি অবশিষ্ট রয়েছে। দালানের মধ্যভাগে দু'টো শ্বেতপ্রস্তরের স্তম্ভ। লোকে এগুলোকে বল্লাল সেনের গজারী

বলে অভিহিত করে থাকে। বর্ষাকালে এই স্তম্ভ দু'টো থেকে স্বেদবিন্দু নির্গত হয়ে থাকে। এটি স্থানীয় লোকের মনে ভয়মিশ্রিত অন্ধবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। হিন্দু রমণীরা এই মসজিদে এসে স্তম্ভ দু'টোতে সিঁদুর দিয়ে প্রণাম জানায় এবং প্রার্থনা করে। এটি হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণের একটি দৃষ্টান্ত। এরূপ দৃষ্টান্ত পূর্ব বাংলার বহু স্থানে পাওয়া যায়।

বাবা আদমের মসজিদের সন্নিকটে আর একটি মসজিদ আছে। এটি সাদাসিধে এবং অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিসম্পন্ন। এই মসজিদের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, এর বারান্দায় হিন্দুদের দেব-দেবীদের কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। নিশ্চয় এগুলো বিজিত হিন্দু জাতির কাছ থেকে লুন্ঠিত হয়েছিলো। স্থানীয় হিন্দুরা বিধর্মীদের দ্বারা নির্মিত এই মসজিদের চত্বরে এসে মূর্তিগুলোকে পূজা করে থাকে।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর বিক্রমপুরের শাসনক্ষমতা কিছুকালের জন্যে পাল রাজাদের করতলগত হয়েছিলো বলে মনে হয়। এই অঞ্চলে মুসলিম শক্তির পূর্ণ বিকাশ তখনও হয়নি। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর থেকে মুসলমানদের পূর্ণ শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালের জন্যে বৌদ্ধ রাজাগণ এখানে শেষ বারের মত রাজত্ব করেন। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করে তার নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। কিন্তু তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় তিনি নদীয়ায় অতিবাহিত করেন। আশী বৎসর বয়সে তিনি বখতিয়ার খিলজীর সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদে সেখান থেকে পলায়ন করেন। প্রচলিত জনশ্রুতি মতে তিনি এবং তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ বিক্রমপুরে চলে আসেন এবং তাঁর বংশ সেখানে একশত অথবা কিঞ্চিদধিক কাল ধরে রাজত্ব করেন। এর পর পূর্ব বাংলা থেকে হিন্দুশক্তি চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বল্লাল সেনের সাথে নদীয়া থেকে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। নদীয়া এক কালে জ্ঞান-বিদ্যার লীলাভূমি ছিলো। তাঁরা বিক্রমপুরে পালিয়ে আসায় বিক্রমপুর হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হয়ে পড়ে। বহু শতাব্দী ধরে

বিক্রমপুরের সে-গৌরব অম্লান ছিলো। এখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর অন্নসংস্থানের জন্যে বিপুল সংখ্যক কেরানী শিক্ষালাভ করে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তাই বিক্রমপুরে এরূপ একটি প্রবাদ গড়ে ওঠে যে, এখানকার একটা অপদার্থ ছেলেও আর কিছু না হোক অন্ততঃ কেরানী-গিরি করে জীবিকার সংস্থান করতে পারবে।

বিক্রমপুরের কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। এই প্রাচীন নগরীর দু'মাইল দূরে মুনশীগঞ্জ অবস্থিত। এটি বর্তমানে ঢাকা জেলার একটি মহকুমা সদর দফতর। বল্লাল সেনের আমল থেকে আজ পর্যন্ত রামপাল ইতিহাসে আর স্থানলাভ করেনি। মুসলমানদের আমলে রাজ্যের সীমান্তভাগে যতগুলো ফাঁড়ি ছিলো এটি তাদের অন্যতম। ইছামতী নদীর অপর পারে সোনারগাঁওয়ে পূর্ব বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়েছিলো। প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরে একজন কাজী শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন এবং বিক্রমপুর অতীতের মহিমা আর গৌরবময় স্মৃতি সম্বল করে কোন রকমে বেঁচে রইলো। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো সে—নদীর অপর পারে সোনারগাঁও আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো।

তৃতীয় অধ্যায়

সোনারগাঁও

বিশ্বাস হয় না, এখানেও এককালে রাজ-রাজড়া বা শাহ্-সুলতানদের রাজধানী ছিলো। সোনারগাঁওয়ে গেলে দেখা যাবে শুধু সুন্দর শস্যক্ষেত আর ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ঝাড়-জঙ্গল। চারধারে তাকালেই মনে হবে এই অঞ্চলটি প্রথমের দিকে বেশ শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী ছিলো। বাইরের গোলযোগ এবং ঘটনাপ্রবাহ এর শান্তি বিঘ্নিত করতে পারেনি। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সোনারগাঁওয়ের গৌরবময় দিনের কোনো নিদর্শনই আজ অবশিষ্ট নেই। সোনারগাঁওয়ের সেই প্রাচীন রাজ্য এখন কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি মাত্র। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলো অতীতের বিধ্বস্ত স্মৃতির সাথে যেন লগ্ন হয়ে আছে। কোথায় সেই রাজ-রাজড়াদের পাত্র, মিত্র, সভাসদ, পারিষদ আর ভৃত্যবাহিনী! কোথায় সেই বাজার, বিপনী আর শ্রেষ্ঠী-সওদাগরের দল! আর কোথায় বা সেই সৈন্য-সামন্তের দল! রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ঘটনা-প্রবাহ আর জীবনের মুখরতা স্তব্ধ হয়ে গেছে এখানে। বংশপরম্পরায় লোকে এর রোমাঞ্চময় ইতিহাসের কথা শুনে এসেছে কাহিনীর মতো। এই গৌরবময় ইতিহাসের মঞ্চে চাষীরা ঘর-সংসার পাতে, জন্ম নেয়, মরে যায়—অতীতে কবে কি হয়েছিলো, কোথায় কি ছিলো, তার ধার তারা ধারে না।

পূর্বে লাক্ষা নদী, দক্ষিণে মেঘনা আর পশ্চিমে ইছামতী নদীর তীরভূমি থেকে শুরু করে উত্তরে ব্রহ্মপত্র নদ পর্যন্ত এই সত্তুর মাইল দীর্ঘ অঞ্চলটিতে সোনারগাঁও রাজ্য অবস্থিত ছিল। সেকালে ব্রহ্মপুত্র পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে যেতো। চারধারে এভাবে দ্বীপের মতো বৃহৎ নদীগুলো দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকার দরুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটি বড়োই

উপযোগী স্থান ছিলো। তবে এই ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মেঘনা মিলিত হয়ে একটা কোণের মতো স্থলভাগ সৃষ্টি করেছিলো, সেটিই আকর্ষণের মূলকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই অঞ্চলের আমীরপুর, পান্নাম, গোয়ালদী, মগরাপাড়া নামক গ্রামগুলোতে তখনকার দিনের শাসনকর্তাগণ তাঁদের স্ব স্ব সদর দফতর স্থাপন করেছিলেন। সোনারগাঁও বোধ করি সমগ্র জেলাটির নাম ছিলো এবং শাসনকর্তা সাময়িকভাবে যে-স্থানে রাজসভা বসাতেন, সেটিও সোনারগাঁও নামে অভিহিত হয়েছিলো। সোনারগাঁও অঞ্চলের সর্বত্র অতীত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিরাটাকার দীঘি, মৃন্ময় স্তূপ, মসজিদ, ধ্বংসপ্রাপ্ত কেল্লা ইত্যাদি।

আত্মরক্ষার পক্ষে এহেন উপযুক্ত স্থানেই বাংলার হিন্দু রাজাদের শেষ বংশধরগণ বিজয়ী মুসলমানদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে আসেন। মুসলমানগণ মধ্য বাংলা জয় না করা পর্যন্ত তাঁরা এখানে একশত বৎসরের অধিক কাল ধরে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করে যান। বাংলা বিজয়ের পর মাত্র তিন বৎসর বখতিয়ার খিলজী জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি তিব্বত অভিযানের বিপুল পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেন রাজন্যবর্গ মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার অথবা হৃত স্থান পুনরুদ্ধার করার কোন চেষ্টা করেনি। তারা আক্রমণকারীদের বাধা না দিয়েই তাদের রাজ্য ছেড়ে দিয়েছে। তারা সোনারগাঁওয়ে নিরুপদ্রবে এবং শান্তিতে বাস করেছিলো এবং নবোত্থিত রাজশক্তির কাছে তারা রাজনৈতিক বিপদ বা আশংকার সৃষ্টি করেনি। প্রথম দিকে মুসলমান শাসকগণ তাদের স্বাধীনতার উপর খুব বেশী হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি। রাজধানী গৌড়ে তারা নিজেদের নানা পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সোনারগাঁওয়ের রাজাদের কাছ থেকে কর পেলে অথবা তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অধীনতা স্বীকার করলেই মুসলমান শাসকগণ খুশি থাকতেন। সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব চলে যাওয়ায় তাঁরা ক্রমে সাধারণ জমিদার ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হলেন এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অচিরেই তাঁরা চূড়ান্তভাবে অপসারিত হলেন।

লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র দনুজ রায়ের আমলেই এই অঞ্চলের হিন্দু আধিপত্যের শেষ যবনিকা নেমে আসে। তুগ্রিল খান এই প্রদেশের সুবেদার। তিনি ছিলেন সম্রাট বলবনের একজন তাতারী গোলাম। অদ্ভুত বুদ্ধি এবং যোগ্যতা-বলে তিনি উন্নতির শীর্ষদেশে উপনীত হন। সম্রাট বলবন তাঁকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠান। কিন্তু জীবনের অকল্পনীয় সাফল্য এবং উন্নতি তাঁকে সীমাহীন উচ্চাভিলাষী করে তুলেছিলো। অপরিণামদর্শী উচ্চাভিলাষ এই কৃতঘ্নকে প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করে। ত্রিপুরা জয় করে ফেরার পথে তিনি অজস্র ধন-সম্পদ নিয়ে আসেন এবং এগুলো বহন করতে একশত হাতীর প্রয়োজন হয়েছিলো। তিনি ফিরে এসেই সম্রাটের মৃত্যুর খবর রটিয়ে দিলেন এবং নিজকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সম্রাটের প্রাক্তন ক্রীতদাসের এই বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং তুগ্রিল খাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে রওয়ানা হলেন। কিন্তু বাদশাহের আগমনের সংবাদে তুগ্রিল খাঁ ভীত হয়ে পড়েন। সাম্প্রতিক ত্রিপুরা অভিযানে তিনি যে ধনরত্ন লাভ করেছিলেন, হাতীর পিঠে তা বোঝাই করে একদল সৈন্যসহ তিনি ত্রিপুরায় পলায়ন করেন। তুগ্রিল খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সম্রাট সোনারগাঁওয়ে এসে উপস্থিত হলেন। উত্তর ভারতের রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে বিহার ও তেলিয়াগরিয়া গিরিসঙ্কট হয়ে বাংলার সুবিশাল নদনদী পাড়ি দিয়ে সম্রাট বিপুল সেনাবাহিনীসহ যে অভিযানে এসেছিলেন, তা যে কতো বড়ো দুঃসাহসিক কাজ ছিলো তা সহজেই অনুমেয়। পূর্ব বাংলার পক্ষে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। দিল্লীর কোন সম্রাট ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে আগমন করেননি। বাদশাহের আগমন সংবাদে দনুজ রায় অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং তাঁর স্বজাতি বরাবর যা করে এসেছে, তাই করলেন। তিনি সম্রাট-বাহিনীকে বাধা দেওয়ার কোন চেষ্টা করলেন না। সোনারগাঁওয়ে সম্রাট প্রবেশ করার সাথে সাথেই তিনি তাঁর রাজধানী পান্নাম থেকে বহির্গত হলেন এবং সম্রাটের কাছে গিয়ে আনুগত্য

স্বীকার করে বিদ্রোহী সুবেদারকে শায়েস্তা করার জন্যে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এবং কিছুদিন পরই সম্রাট-বাহিনীর সাথে তুগ্রিল খাঁর সৈন্যদের লড়াই বেধে গেলো। তুগ্রিল খাঁ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলেন। কথিত আছে যে, তুগ্রিল খাঁ নদী পার হয়ে ত্রিপুরায় পলায়ন করতে গিয়ে ধরা প:ড়েন এবং সোনারগাঁওয়ের কারাগারে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

অতঃপর প্রাচীন হিন্দুরাজ্য সোনারগাঁওয়ে বাদশাহ্‌গণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং পববর্তী তিন শতাব্দী ধরে এটি পূর্ব বাংলার মুসলিম শাসকদের রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকে। সেন রাজারা বহু শতাব্দী ধরে রাজত্ব করার পর ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন। মুসলমান-আক্রমণকে প্রতিহত করার কোন চেষ্টাই তাঁরা করেননি। নূতন মুসলিম সুবেদারগণ হিন্দু রাজত্বের সকল চিহ্নই মুছে ফেলে দেন। নূতন রাজধানী তাঁরা নিজেদের আদর্শে এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, এখানে যে এক কালে হিন্দু রাজাদের র:জধানী ছিলো, তা বুঝবার আব উপায় রইলো না। হিন্দুদের মন্দিরের ইট এনে মসজিদে লাগানো হলো এবং হিন্দু রাজাদের ভগ্ন দুর্গ এবং প্রাসাদের উপর বিজয়ী মুসলমানগণ ইমারত গড়ে তুললেন। অবশ্য নির্মাণকুশলতা এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে মুসলিম যুগের এসব সৌধমালা ছিলো অনেক উচ্চাঙ্গের। সেন এবং পাল রাজারা যে অসংখ্য মন্দির ও সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তার নিদর্শন অন্যত্র বিদ্যমান থাকলেও সোনারগাঁও থেকে মুসলমান শাসকগণ এসব নিদর্শনকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন যে, সেখানে হিন্দু আমলের একটি মাত্র ইমারত অবশিষ্ট রয়েছে। শাহী কড়োরী বা কর আদায়কারীর সরকারী বাসভবনরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় এই গৃহটি অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। এতে স্থপতি-কুশলতার কোন পরিচয় নেই। হিন্দু আমলের একমাত্র প্রাসাদ-নিদর্শনরূপেই এটি আকর্ষণীয়। ঝিকোটি বলে পরিচিত এই দালানটি কংক্রিট দিয়ে তৈরী এবং এর ছাদ ছুঁচালো গম্বুজাকৃতি। দেয়ালে বহু ফুটো রাখা হয়েছে; কিছুদিন আগে পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী হিন্দুরা এখানে এসে মিলিত হয়ে উপাসনা করতো। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত এবং

অবহেলিত। স্থানে স্থানে শ্যাওলা জমে গেছে। এখন এর জীর্ণদশা। হিন্দু যুগের এই দালানটি মুসলমান সাম্রাজ্যের পতন এবং কালের অদ্ভুত প্রতিশোধ দেখার জন্যে যেন টিকে ছিলো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরটিতে সোনারগাঁওয়ের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়েছিলো। ঐ বৎসর সম্রাট আলাউদ্দিন প্রশাসনিক কারণে বাংলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। পূর্বাংশের রাজধানী সোনারগাঁওয়ে স্থাপিত হয়। এবং বাহাদুর খান এই অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। পরবর্তী তিনশত বৎসব ধরে এখানেই ছিলো পূর্ব বঙ্গেব মুসলিম শাসনকর্তাদের রাজধানী। নবগঠিত প্রদেশটির পক্ষে এটি একটি বিক্ষুব্ধ কাল। বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যাচ্ছিলো। সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত হওয়ার জন্যে সীমান্ত প্রদেশগুলোর পক্ষে স্বাভাবিক সকল সুবিধা-অসুবিধাই এটিকে ভোগ করতে হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ খবরদারী থেকে দূরে থাকার দরুন সুবেদারগণ একের পর এক সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন। সম্রাটগণ অনেক সময় চতুর্দিক থেকে নানাভাবে বিব্রত হয়ে পড়ায় সুবেদারদের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এসব ব্যাপার সাধারণ মানুষের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। এই নাটকে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে গেছে—এর কোন অঙ্কই তাদের বিচলিত করেনি। দূর থেকে তারা দেখতো মঞ্চে একের পর এক শাসনকর্তার আগমন, নির্গমন আর ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রাণঘাতী লড়াই। হয়তো বা তারা এসব দেখে কৌতুকই বোধ করে থাকবে। এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ তাদের কৌতূহলের সৃষ্টি করুক আর নাই করুক, সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিতির দরুন অন্যদিকে তারা নানা সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করতো। কেন্দ্রীয় রাজধানীতে বড়ো বড়ো রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হতো, বিরাট বিরাট ব্যাপার ঘটতো। বিপুল সেনাবাহিনী এক স্থান থেকে আর এক স্থানে চলাচল করতো। ফলে রাজধানীর নিকটবর্তী

প্রদেশসমূহ এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। যে-সব অঞ্চল দিয়ে সেনাদল যাতায়াত করতো, সেগুলো তাদের ধ্বংসলীলা থেকে অব্যাহতি পেতো না। কিন্তু পূর্ব বঙ্গ এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাত থেকে বেঁচে যেতো। যদিও পূর্ব বঙ্গের কৃষককুলের ভাগ্য নিরাপদ ছিলো না, তবুও তারা নরপঙ্গপালদের হাতে অপেক্ষাকৃত কম নির্যাতন ভোগ করতো। এ-দেশে সৈন্য চলাচল সহজ ব্যাপার ছিলো না। কোনো বিদ্রোহী সুবেদারকে শায়েস্তা করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠাতে হলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট রাজপথ ছাড়া অন্য পথে তাদের চলাচল সম্ভব ছিলো না। এখান থেকে দিল্লী বহুদূরে। সেখান থেকে অযোধ্যা, বিহার ও বঙ্গদেশ হয়ে এখানে সৈন্য প্রেরণ করতে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হতো এবং তাদের পৌঁছুতেও বহুদিন লেগে যেতো। চতুর্দিক থেকে নদী-বেষ্টিত হওয়ায় বৎসরের অধিকাংশ সময় স্থলপথে এখানে প্রবেশ সম্ভব ছিলো না। প্রকৃতি যেনো যে-কোনো বহিরাক্রমণকে প্রতিহত করার মতো করে এটিকে গড়ে তুলেছিলো। সৈন্যাধ্যক্ষের পক্ষে শীতকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এখানে অবস্থান করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়ে পড়তো। নদীতে অকস্মাৎ বান ডাকতো। আর তার তোড়ে ভেসে যেতো আক্রমণকারীর দল। নয়তো পশ্চাদপসরণ অসম্ভব হয়ে পড়তো এবং শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোন উপায় থাকতো না। কিন্তু অন্য দিকে সীমান্ত প্রদেশ হিসেবে সোনারগাঁওকে বিপদের সম্মুখীন হতে হতো। এর পূর্বদিকে মগ ও আরাকানরা বাস করতো আর উত্তরে কামরূপ ও হিমালয়ের পাদদেশে থাকতো অজ্ঞাত কতকগুলো উপজাতি। এই প্রদেশের পূর্ব সীমান্ত সুনির্দিষ্ট ছিলো না। ফলে এই সব অসভ্য উপজাতি পুনঃ পুনঃ হামলা চালিয়ে এর অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করতো। এই বর্বর উপজাতিগুলো ছিলো স্বভাব-দস্যু এবং লুণ্ঠনকারী। মগরা কাছাকাছি থাকায় তারা পূর্ব বাংলার শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের নিকট সর্বদা আতঙ্কের কারণ হয়ে থাকতো। নদীপথে তারা অকস্মাৎ এসে পড়তো এবং নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলো নিঃশেষে লুণ্ঠন করতো। তাদের

অত্যাচার আর ধ্বংসলীলায় লোকালয় জনশূন্য মরুভূমি হয়ে যেতো। পরবর্তী কালে এরা পর্তুগীজদের কাছ থেকে নৌবিদ্যা ভালভাবে আয়ত্ত করে এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে এরা এরূপ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা থেকে প্রদেশটিকে রক্ষার জন্যে এর পূর্বান্ত সীমায় বাংলার এই নূতন রাজধানী স্থাপন করতে হয়। নয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী পূর্ব বাংলার যিনি প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে অবস্থানের দরুন তিনি এর পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করলেন। দিল্লী থেকে সোনারগাঁওয়ে সম্রাট বলবনের সসৈন্যে আগমনের স্মৃতি মানুষের মনে বেশ ভালভাবেই জাগরুক ছিলো। তখনকার দিনে এটি ছিলো অসাধারণ ঘটনা। বাহাদুর খান হযতো মনে করেছিলেন যে, এরূপ অসাধারণ ঘটনার পুনরাবৃত্তি শীগ্‌গীর ঘটবে না। সম্রাট আলাউদ্দীনের মৃত্যু এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ মোবারক শাহের সিংহাসনারোহণের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরে শক্তি সঞ্চয় করে বাহাদুর খান বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। শ্বেত রাজছত্র এবং প্রাচ্য-দেশে প্রচলিত রাজকীয় প্রতীকসমূহ ধারণপূর্বক তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করান এবং পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল ধরে নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। তাঁর শাসনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। এমন কি, কিংবদন্তী থেকেও কিছু জানার উপায় নেই। ভাগ্য চিরতরে সেসব ঘটনাপঞ্জীর গ্রন্থ বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু পুনরায় ভাগ্যের চাকা আবর্তিত হলো। একজন পরাক্রমশালী সম্রাট সিংহাসনে বসলেন। সম্রাট তোগলকের কাছে এরূপ অভিযোগ আসতে লাগলো যে, সোনারগাঁওয়ের আমীর-ওমরাহ্ এবং প্রশাসকদের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং অবিচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই তিনি এসব অভিযোগের প্রতিকার এবং বাহাদুর খানের অবাধ্যতা ও কুকর্মের জন্যে তাঁকে শায়েস্তা করার অভিপ্রায়ে পূর্ব বাংলার পথে বহির্গত হলেন। সম্রাট সোনারগাঁওয়ে প্রবেশ করামাত্র বাহাদুর খান তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে

বশ্যতা স্বীকার করলেন। দীর্ঘদিনের শাসনামলে বাহাদুর খান সৈন্যদের বিশ্বস্ততা এবং আমীর-ওমরাহ্‌দের ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হননি। প্রয়োজনের সময় সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেলো। কাজেই তিনি সম্রাটের অনুগ্রহ এবং করুণার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেন। সম্রাট অবশেষে তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। তবে তার পদ ও ধন-সম্পদ সব কিছুই তাঁকে হারাতে হয়েছিলো এবং বাদশাহ্‌র সাথে দিল্লীতে ফিরে যেতে হয়েছিলো। সোনারগাঁওয়ের প্রথম মুসলমান সুবেদার স্বাধীন হওয়ার যে চেষ্টা করেছিলেন, তার পরিণামে তাঁর ভাগ্যে জুটলো এমনি লাঞ্ছনা।

বাহাদুর খানের স্থলে বাহ্‌রাম খান সুবেদার নিযুক্ত হলেন। চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি অনন্যসাধারণ কুশলতা এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসনকার্য চালিয়ে যান। আবার নীরব হয়ে আসে বাংলার নৃপতিদের ইতিহাস। তাঁর শাসনকালের কোনো ঘটনাই লিখিত নেই। ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পব দীর্ঘদিনের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ চলার ফলে সোনারগাঁওয়ের শান্তি ব্যাহত হয়; শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি। বিজয়মালা শক্তিমানেরই করতলগত হলো। এই হানাহানিতে বাহ্‌রাম খানের প্রাক্তন বর্মবাহী ফখরুদ্দীনের জিত হয়। তিনি বাংলার সুবেদার হলেন। কিন্তু তিনি এতেও সন্তুষ্ট থাকলেন না—সম্রাটের প্রতি অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করার ধৃষ্টতা ও দু:সাহস প্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। তিনি সুলতান সিকান্দার উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই জবর দখলকারী বেশীদিন শান্তিভোগ করতে পারলেন না। দ্রুতগতিতে রাজনৈতিক আবর্তন শুরু হলো। ফখরুদ্দীনেয় শাসনকাল দুই বৎসর মাত্র। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে সোনারগাঁওয়ে বড়ো কৌতূহলোদ্দীপক রাজনৈতিক নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। বাহ্‌রাম খানের মৃত্যুর ফলে যে সন্ত্রাস ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিলো, তার সংবাদ পেয়ে সম্রাট গৌড়ের সুবেদার কদর খানকে দ্রুত সোনারগাঁওয়ে উপস্থিত হয়ে জবরদখলকারীকে শায়েস্তা করতে নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধে ফখরুদ্দীনের পরাজয় হলো। তিনি কতিপয়

বিশ্বস্ত অনুচরসহ পলায়ন করলেন এবং জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকলেন সুযোগের অপেক্ষায়। সে সুযোগ আসতে দেরী হলো না। কদর খান সোনারগাঁও দখলের পর সেখানে বিপুল ধনরত্নের সন্ধান পেলেন এবং সাথে সাথেই তা দিল্লীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। এই ধনরত্ন ফখরুদ্দীন নিজে জমিয়েছিলেন। দিল্লীতে এগুলো প্রেরণ করা হবে জানতে পেরে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ এগুলো হাতছাড়া হয়ে গেলে এই প্রদেশ পুনর্দখলের সকল আশাই তিরোহিত হবে। কাজেই তিনি এই ধনরত্ন ছিনিয়ে নেওয়ার এক ফিকির আঁটলেন। তিনি কতিপয় গুপ্তচর কদর খানের সেনাদলের কাছে গোপনে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাদের বলে দিলেন যে, তারা যেন কদর খানের সৈন্যদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, তারা তাদের নেতাকে হত্যা করে ফখরুদ্দীনকে যদি রাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করে, তবে সমস্ত ধনরত্ন তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। অর্থই সৈন্যদের, বিশেষ করে ভাড়াটিয়া সৈন্যদের, কাছে ছিলো বড়ো কথা। আকস্মিকভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থলাভের আশায় তারা প্রলুব্ধ হয়ে পড়লো এবং নিরূপিত দিনে কদর খানকে হত্যা করে নূতন নেতার দলে যোগদান করলো। ফখরুদ্দীন তখন জঙ্গলে আত্মগোপন করে ছিলেন। বিজয়োল্লাসের সাথে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। প্রতিপক্ষের যেসব সৈন্য তাঁর দলে যোগদান করেছিলো, তাঁর ভাগ্য নির্ভর করছিলো তাদের উপর। কাজেই তিনি প্রতিশ্রুতি মতো সমস্ত ধনরত্ন তাদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বাধ্য হলেন।

তখনকার মতো ফখরুদ্দীনের বিজয় সুসমাপ্ত এবং তাঁর পথ নির্বিঘ্ন হলো। গৌড়ের সুবেদার নিহত হওয়ায় তিনি গর্বিতভাবে নিজেকে বাংলার রাজা বলে ঘোষণা করলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রবর্তন করলেন। সম্রাটের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হলো। বলা বাহুল্য, অচিরেই তাঁর জয়ের পরমায়ু শেষ হয়ে এলো। সোনারগাঁও রাজ্য নিয়েই তিনি খুশী থাকতে পারলেন না। বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাঁকে পেয়ে বসলো। শুধু ষড়যন্ত্র

আর উপস্থিত বুদ্ধি বলে ফখরুদ্দীন নিজের পথ পরিষ্কার করতে পেরে-ছিলেন। সৈনাপত্যের কোন যোগ্যতা তাঁর ছিলো না। রণকুশলতা অথবা সৈন্যদের মনে প্রেরণা সৃষ্টির ক্ষমতা কোনটিই তাঁর ছিলো না। এ-কথা তিনি নিজেও জানতেন। তাই তাঁর বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মুকলেস খানকে সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে গৌড় আক্রমণে প্রেরণ করলেন। মুকলেস খানের সেনাপতির যোগ্যতা ছিলো। কিন্তু গৌড়ের সুবেদার আলী মুবারকের সেনাবাহিনীর প্রতি-আক্রমণে তাঁর সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। মুকলেস খান স্বয়ং নিহত হলেন। সম্রাটের আদেশক্রমে আলী মুবারক সোনারগাঁওয়েব পথে ধাবিত হলেন। ফখরুদ্দীন পরাজিত হলেন এবং পলায়ন করতে গিয়ে ধৃত হলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে রাজধানী সোনারগাঁওয়ে বহু নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো। ধূমকেতুব মতো তিনি রাজনৈতিক নাটমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এখানে। আর এখানেই তাঁর জীবনের শেষ যবনিকা নেমে এলো। বিজয়ীর হাতে বড়ো নিষ্ঠুরভাবে তাঁর মৃত্যু হলো। মাত্র কয়েকদিন আগে যে রাজধানীতে তিনি উন্মত্ত বিজয়োল্লাসের সাথে প্রবেশ করেছিলেন, তারই বহির্দ্বারে পরম ঘৃণাভরে ঝুলিয়ে রাখা হলো তাঁর দেহাবশেষ। বস্তুতঃ ফখরুদ্দীনের জীবনী যেন বাংলায় মুসলিম শাসনকালের দ্রুত আবর্তনশীল ভাগ্যচক্রেরই প্রতীক। জীবনের নিম্নতম স্তর থেকে তিনি ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার শীর্ষ-চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন শুধু শঠতা, আর দুর্নীতির দ্বারা। স্বল্পকালের জন্যেই সমৃদ্ধি তাঁর ভাগ্যে এসেছিলো। তাঁর স্থলে আর একজন শক্তিশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হলো। আর কোথায় বিলীন হয়ে গেলেন ফখরুদ্দীন।

ফখরুদ্দীনের পর আলী মুবারক সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা হলেন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল আরও সংক্ষিপ্ত। মাত্র এক বৎসর পাঁচ মাস শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর তাঁর পালকভ্রাতা হাজী ইলিয়াস কর্তৃক তিনি নিহত হন। হাজী ইলিয়াস সঙ্গে সঙ্গেই শাসনক্ষমতা হাতে নিলেন। সেকালের মুসলমান শাসনকর্তাদের জীবনেতিহাস অত্যন্ত অদ্ভুত এবং

বিস্ময়কর বলে মনে হবে। হাজী ইলিয়াস বিশ্বাসঘাতকতা করে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। অথচ তাঁর চরিত্র ছিলো উদার এবং স্বভাব ছিল বিনয়-নম্র। 'তিনি জনসাধারণের বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করে-ছিলেন।' সাম্রাজ্য লাভের পথকে নির্বিঘ্ন করার জন্যে এতো ঘন ঘন ভ্রাতৃহত্যা, ষড়যন্ত্র এবং নরহত্যা সাধন করা হয়ে এসেছিলো যে, প্রতিটি নূতন নৃপতির শাসন-ক্ষমতা লাভের সাথে এগুলো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকবে বলে মনে করা হতো। তাই ভ্রাতৃরক্তে তাঁর রাজ্যাভিষেক হলেও সে-যুগে ওটি ছিলো স্বাভাবিক ব্যাপার। অথচ ইলিয়াস সোনারগাঁওয়ে প্রজারঞ্জক, ন্যায়পরায়ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম; শামসুদ্দীন নাম গ্রহণ করে তিনি সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসন করেন। দিল্লী-কর্তৃপক্ষ তাঁর শাসনকালে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু অতঃপর একজন শক্তিশালী সম্রাট দিল্লীর তখ্‌তে আসীন হলেন এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলোকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার আয়োজন করলেন।

সম্রাট ফিরোজ শাহ্‌ বিদ্রোহী সুবেদারদের অবাধ্যতা বরদাশ্‌ত করার পাত্র ছিলেন না। তিনি জানতেন যে, সুবেদারদের দুর্জয় আকাঙক্ষা অতীতে বার বার সাম্রাজ্যের ধ্বংস বহন করে এনেছে। শামসুদ্দীনের প্রভূত ঐশ্বর্য এবং শক্তি সঞ্চয়ের সংবাদ ফিরোজ শাহ্‌কে সন্দিগ্ধ করে তোলে। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটিকে দিল্লীর আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করার জন্যে তিনি এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। সম্রাট-বাহিনী রাজ্যের নিকটবর্তী হলে শামসুদ্দীন বানার নদীতীরস্থ একডালা দুর্গে সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সোনারগাঁও রাজ্য-মধ্যে এটিই ছিলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ। পাল রাজাদের আমলে এটি নির্মিত হয়েছিলো। কিন্তু মুসলিম আক্রমণে পালরাজশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে এটি অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। শামসুদ্দীন দুর্গটির অবস্থানের কথা বিবেচনা করে এটিকে দুর্ভেদ্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি দ্রুত

এটির সংস্কার সাধন করলেন। দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। এই ধ্বংসাবশেষ থেকেও পরিষ্কার অনুমান করা যায়, কত নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়ে এটি তৈরি হয়েছিলো। এর সম্মুখ ভাগে অবস্থিত তিনশত গজ প্রশস্ত এবং চল্লিশ ফুট গভীর নদীটিই একটি মস্তবড়ো রক্ষাব্যূহ। এখানকার নদীর পাড় ভারতের অধিকাংশ নদী থেকে আলাদা ধরনের। পানি থেকে অকস্মাৎ পাড়টি খাড়া হয়ে উপরে উঠে গেছে। নদীতে পানি যখন কম থাকে, তখন পাড়টি ঠিক একটা দেয়ালের মতো মনে হয় এবং তা বেয়ে উপরে উঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর বহিঃপ্রাকারটি ঠিক অর্ধচন্দ্রের মতো এবং প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ। চারদিকে প্রশস্ত পরিখা। এই বহিঃপ্রাকারের মধ্যে এখনও দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ, দুর্গ, প্রাচীর এবং গম্বুজের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। দূরে জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চভূমি এবং অসংখ্য সংকীর্ণ পথ। সম্রাট-বাহিনী শীঘ্রই শত্রুপক্ষের অনুকূল অবস্থা ও অবস্থানের কথা উপলব্ধি করলো। বাইশ দিন ধরে সম্রাট ফিরোজ শাহ্ অবরোধ করে রইলেন; কিন্তু কোনো ফল হলো না। পরিকল্পনা পরিবর্তনের জন্য ফিরোজ শাহ্ দুর্গের অপর এক অংশে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত করলেন এবং সেনাবাহিনীকে অপসারণ করলেন। শত্রুপক্ষকে প্রলুব্ধ করার কৌশল হিসেবেও যদি তিনি পলায়নের ভান করতেন, তাতেও বিশেষ ফল হতো না। শামসুদ্দীন এটিকে পশ্চাদপসরণ বলে ভুল করে দুর্গ থেকে বহির্গত হয়ে ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সম্রাট দুর্গ অধিকারে ব্যর্থ হলেও পরাজিত হন নাই। তিনি শত্রুপক্ষকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন যে, শামসুদ্দীন পুনরায় দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন এবং তাঁর চুয়াল্লিশটি হাতী, রাজছত্র এবং রাজকীয় প্রতীক সম্রাট-বাহিনীর হস্তগত হলো।

সেনাবাহিনীকে নূতনভাবে সংগঠন করে সম্রাট অবরোধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এর পর কি ঘটেছিলো, ইতিহাস তৎসম্পর্কে নীরব। তবে কিংবদন্তী মতে দুর্গের নিকটে বিয়াবানী বলে একজন ফকির বাস করতেন। শামসুদ্দীন তাঁকে খুব ভক্তি করতেন। অবরোধাবস্থায় ফকিরের মৃত্যু হয়।

তাঁর বন্ধুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে শামসুদ্দীন খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং ফকিরের ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে বহির্গত হয়ে বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। ফেরার পথে তিনি গোপনে একাকী সম্রাটের শিবিরে প্রবেশ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন।

বহুদিন ধরে সম্রাট-বাহিনী একডালা দুর্গ অবরোধ করে রইলো; কিন্তু তা অধিকার করতে পারলো না। ইতিমধ্যে নদীর পানি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং বর্ষা নেমে আসে। আর বেশী দেরী করলে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে রাজধানী থেকে এতদূরে আটকা থাকতে হবে চিন্তা করে অবশেষে সম্রাটকে পরাজয় মেনে নিতে হলো। শামসুদ্দীনের কাছ থেকে বার্ষিক করদানের একটা অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি অবরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিন বৎসর পর ফিরোজ শাহ্ শামসুদ্দীনের সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন।

বিপুল সম্মান, যশ এবং নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের মধ্যে দীর্ঘ ষোল বৎসর ধরে রাজত্ব করার পর ১৩৫৮ খ্রীস্টাব্দে শামসুদ্দীন পরলোকগমন করলেন। ফিরোজ শাহ্ তাঁর এই শত্রুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্র বাংলা দেশকে পুনরায় করতলগত করার আয়োজন শুরু করলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ্ শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, শামসুদ্দীনের পুত্র সেকান্দার শাহ্ পিতা অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নন এবং একডালা দুর্গ পূর্ববৎ দুর্ভেদ্য বলে প্রতিপন্ন হলো। সম্রাট-বাহিনীর আগমনমাত্র সেকান্দার শাহ্ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন এবং দুর্গমধ্যে প্রবেশ করলেন। পূর্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য নিয়োগ করে দীর্ঘদিন ধরে দুর্গ অবরোধ করে রাখা সত্ত্বেও ফিরোজ শাহ্ কিছুই করতে পারলেন না। পুনরায় নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। এভাবে দু'-দুবার একডালা দুর্গ ভারত-সম্রাটের আক্রমণকে প্রতিহত করে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে রইলো। আটচল্লিশটি হাতী এবং কিছু অর্থ সেকান্দার শাহ্‌র কাছ থেকে উপঢৌকন নিয়ে ফিরোজ শাহ্ দ্বিতীয় বারের জন্যে দিল্লী

প্রত্যাবর্তন করলেন। সেকান্দার শাহ্ও ভাবলেন যে, নামমাত্র মূল্য দিয়ে তিনি রাজ্য কিনে নিলেন।

এর পর সামান্য কয়েক বৎসরের জন্যে দেশে শান্তি ছিলো। সেকান্দার শাহ্ পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করে নগরীর নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। তাঁর মনে উচ্চাভিলাষ ছিলো না। সদ্য-অর্জিত স্বাধীনতা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলেও তাঁর পারিবারিক জীবন সুখের হয় নাই। শেষ জীবনে পরিবারের মধ্যে কলহ ও বিরোধের ফলে তাঁকে অশান্তি ভোগ করতে হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সেই আমীর-ওমরাহ্ আর বেগমদের মধ্যে ষড়যন্ত্র আর পাল্টা-ষড়যন্ত্রের পুরানো কাহিনী। সেকান্দার শাহ্র দুই পত্নী ছিলেন। প্রথমা বেগমের সাত সন্তান এবং দ্বিতীয়া বেগমের গর্ভে গিয়াস উদ্দীন নামে একটি মাত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু প্রথম পক্ষের সকল সন্তান অপেক্ষা দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান গিয়াস উদ্দীনকে সুলতান বেশী ভালবাসতেন। ফলে প্রথমা বেগম গিয়াস উদ্দীনকে তাঁর সন্তানদের উত্তরাধিকারের পথে কণ্টক বলে মনে করতে থাকেন এবং তাঁর প্রতি ঈর্ষা এবং ঘৃণা পোষণ করেন। গিয়াস উদ্দীনের বিরুদ্ধে তিনি নানাভাবে সুলতানের কান ভারি করে তোলার এবং পুত্রের প্রতি তাঁর মনকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সুলতানকে বোঝাতে লাগলেন যে, গিয়াস উদ্দীন কেবল তাঁর সন্তানদের বিরুদ্ধেই নয়— পিতার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁদের প্রাণনাশের চেষ্টা করছে। অতঃপর বেগম প্রস্তাব করলেন যে, তাঁর সন্তান এবং তাঁর জীবন রক্ষার জন্যে গিয়াস উদ্দীনকে 'হয় কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক, নয় তো তাঁর চোখ উপড়ে ফেলা হোক— যাতে করে তাঁর ষড়যন্ত্র করার পথ বন্ধ হয়ে যায়।' সেকান্দার শাহ্ শিউরে উঠলেন এবং ঘৃণাভরে এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এদিকে গিয়াস উদ্দীন তাঁর পিতার উপর বিমাতার প্রভাবের কথা স্মরণ করে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি সোনারগাঁওয়ে পলায়ন করলেন এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ

ঘোষণা করলেন। প্রাণপ্রতিম পুত্রের কৃতঘ্নতায় সুলতান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। পুত্রকে শায়েস্তা করার জন্যে সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। গোয়ালপাড়ায় উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে গিয়াস উদ্দীন সৈন্যদের কঠোরভাবে সাবধান করে দিলেন, যেন তাঁর পিতার কেশাগ্রভাগেও তারা আঘাত না করে। কিন্তু যুধ্যমান অবস্থায় তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাঁর পিতা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব না করে তিনি ত্বরিৎপদে পিতার শিবিরে ধাবিত হলেন। তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে শোকে ভেঙে পড়লেন। গিয়াস উদ্দীন রোদন করতে থাকেন আর বার বার অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তাঁর কাছে কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা প্রকাশ আর পিতার মার্জনা ভিক্ষা করতে লাগলেন। মুমূর্ষু সুলতান ধীরে ধীরে তাঁর হাতখানা তুলে পুত্রের মস্তকে স্থাপন করলেন। তারপর অস্পষ্টকণ্ঠে বললেন, 'আমার রাজ্য চলে গেলো। দোওয়া করি, তোমার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হোক এবং চিরকাল তা বেঁচে থাক।'

পিতার মৃত্যুর পর তাড়াতাড়ি তাঁর দাফন-কার্য সমাপ্ত করে গিয়াস উদ্দীন দ্রুতগতিতে পাণ্ডুয়ার পথে ধাবিত হলেন সিংহাসন হস্তগত করার জন্যে। সেখানে পেঁছেই তিনি এক চরম নৃশংস কার্য করে বসলেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের চক্ষু উৎপাটিত করে এক রেকাবীতে সাজিয়ে তাদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অংশতঃ বিমাতার শত্রুতাচরণের প্রতিশোধ গ্রহণের এবং সিংহাসনের দাবী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভবনাকে নির্মূল করার জন্যে গিয়াস উদ্দীন এই নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। অথচ এই গিয়াস উদ্দীনই আদর্শ নরপতিরূপে ইতিহাসে কীর্তিত। তাঁর স্বভাব ছিলো নম্র-উদার। তিনি ছিলেন খুব ন্যায়পরায়ণ শাসক। আজো তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার কাহিনী লোক-মুখে কীর্তিত হয়ে থাকে। সত্য বটে, প্রাচ্যবাসীদের চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণের অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সুলতান গিয়াস উদ্দীনের কাহিনী পাঠে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। যে-ব্যক্তি নিজের রক্তের প্রতি এত হৃদয়হীনতা ও অবিচার

করতে পেরেছিলেন, পরবর্তী কালে তিনি ন্যায়পরায়ণতার যে-সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান, তা যেনো বিশ্বাস করাই কঠিন। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত একটি কাহিনী নিম্নরূপ :

একদা ধনুর্বিদ্যা অনুশীলনকালে হঠাৎ একটি তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং তা এক বিধবার একমাত্র পুত্রের দেহে বিদ্ধ হয়। বিধবা সুলতানকে চিনতে না পেরে তীরন্দাজের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ করে এবং সুবিচার প্রার্থনা করে। কাজী বুঝতে পারলেন, কার তীরে বিধবার পুত্র আহত হয়েছে। একদিকে বিচারকের কর্তব্য, অন্যদিকে রাজভয়— এই মহাদ্বন্দ্ব কাজীর মনকে ব্যাকুল করে তুললো। কিন্তু মহান কাজী অবশেষে মনস্থির করলেন। সুলতানের ভয়ে তিনি যদি বিচারকের কর্তব্যে অবহেলা করেন, তবে খোদার কাছে তাঁকে দায়ী হতে হবে। সুলতানকে ভয় না করে তিনি খোদাকেই ভয় করলেন। কাজী তাঁর আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দীনের কাছে পরওয়ানা পাঠিয়ে দিলেন। সুলতান এই পরওয়ানার কারণ বুঝতে পারলেন এবং তাঁর পোশাকের নীচে একটি ক্ষুদ্র তরবারি লুকিয়ে রেখে কাজীর আদালতে হাজির হলেন। কাজী সুলতানকে রাজোচিত কোন সম্মান না দেখিয়ে তাঁকে অভিযোগকারিণী বিধবার ক্ষতিপূরণ করবার রায় দান করলেন। সুলতান সাথে সাথে বিধবাকে প্রচুর অর্থ দান করে কাজীর হুকুম তামিল করলেন। বিধবা হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলো। মামলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কাজী তঁ'র এজলাস থেকে নেমে এসে সুলতানের পায়ে পড়লেন। গিয়াস উদ্দীন কাজীকে হাত ধরে উঠিয়ে লুকানো তরবারিটি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'কাজী সাহেব, আপনি পবিত্র আইনের রক্ষক। তাই আপনার পরওয়ানা পাওয়ামাত্র আমি আদালতে হাজির হই। কিন্তু আমি এই তরবারি স্পর্শ করে শপথ করছি, আপনি যদি আপনার কর্তব্য থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হতেন, তা হলে আমি এই তরবারি দিয়ে আপনার শিরশ্ছেদ করতাম।' কাজী তখন বিচারকের দণ্ডটি হাতে নিয়ে বললেন,

'আমিও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যে, আপনার উপর যে পরওয়ানা জারি করা হয়েছিলো, তা অমান্য করলে সাধারণ অপরাধীর মতো এই দণ্ডটির আঘাতে আপনার পৃষ্ঠদেশও রক্তাক্ত হয়ে যেতো।' রাজ্যে নিরপেক্ষ বিচারের এই দৃষ্টান্তে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং কাজীকে পুরস্কৃত করলেন।

সুলতান গিয়াস উদ্দীন ছিলেন সদানন্দ এবং কাব্যোৎসাহী। গিয়াস উদ্দীনই কবি হাফিজের নিকট অত্যুৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান মসলিন বস্ত্র উপ-ঢৌকন পাঠিয়ে তাঁকে সোনারগাঁওয়ে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু মনোরম শিরাজ নগরী ছেড়ে কবি পূর্ব বাংলার মতো এতো দূর দেশে পাড়ি জমাতে রাজী হননি। কবি সুলতানকে একটি গজল উপহার দেন। কবিতাটি হাফিজের 'দিওয়ানে' সঙ্কলিত রয়েছে। গিয়াস উদ্দীনের তিনজন প্রিয় পত্নীকে কবি কাব্যিক নামে অভিহিত করেছিলেন। সুলতান একবার মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে মনে করে সুলতান বললেন যে, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর এই তিন পত্নী ব্যতীত আর কেউ যেনো তাঁর লাশ গোসল না করায়। কিন্তু সুলতান শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়ে উঠলেন। হেরেমের অন্যান্য মহিলারা তখন তিন মহিষীর উপর প্রতিশোধ নিলো 'লাশ ধোয়ানী' নাম দিয়ে।

সোনারগাঁওয়ে সুলতান গিয়াস উদ্দীনের কবর এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। পান্নাম গ্রামের উপকণ্ঠে জীর্ণ ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সে-কবর। কিন্তু জীর্ণদশায়ও এটি মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। গাঢ় ধূসর বর্ণের পাথরে তৈরি এ-কবর। নিখুঁতভাবে খোদিত এই সব পাথরের পার্শ্বে এবং কোণায় সূক্ষ্ম এবং জটিল কাজ-করা রয়েছে। পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্বের এই সব কাজ আজকের দিনের মতোই নিখুঁত। বহু বর্ষের ঝড়ঝঞ্ঝা, বর্ষা ও বৃষ্টিপাতের ফলে পাথরগুলো খুলে গেছে এবং ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। মাথার দিকে বেলে পাথরের একটি স্তম্ভ মাটিতে অর্ধপ্রোথিত। নি:সন্দেহে এটি চেরাগদানরূপে ব্যবহৃত

হতো। বাংলার এই মহান এবং বিখ্যাত নৃপতির স্মৃতি যতদিন পর্যন্ত না মানুষের মনে মলিন হয়ে এসেছিলো, ততদিন পর্যন্ত এখানে প্রদীপ জ্বলতো।

গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী যাবৎ সোনারগাঁওকে নিয়ে দিল্লীর শাহী দরবারে তেমন তোলপাড় হয়নি। এর স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। এর সকল গৌরব আর মর্যাদা অধিকার করে নিলো গৌড় এবং পাণ্ডুয়া নগরী। সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় সোনারগাঁও পরিত্যক্ত হলো। এটিকে স্থানীয় মুসলিম রাজকর্মচারী-দের শাসনাধীনে রাখা হলো। সোনারগাঁওয়ে যেসব প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গেছে, তা এই যুগের। মগরাপাড়া গ্রামে আধুনিককালের নির্মিত একটি মসজিদের সম্মুখে ইটের দেয়ালে ঘেরা একটা ক্ষুদ্র গোরস্তান আছে। এর দেয়ালগুলোর একটিতে একটা কালো পাথর সংলগ্ন রয়েছে। এটিকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটা অন্ধ বিশ্বাস বেঁচে আছে। এই পাথরের উপর ঘন করে চুনের প্রলেপ দেয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী কোনো স্থানে চুরি হলে গ্রামের সব লোক ডেকে এখানে জমায়েত করা হতো। তারা এর উপর হাত রেখে শপথ করতো যে, তারা নিরপরাধ। তারা বিশ্বাস করতো যে, চোরের হাত তাতে এমনভাবে আটকা পড়বে যে, তা খুলে নিতে তাকে হয়রান-পেরেশান হতে হবে। পাথরটিতে এখনও চুনের ঘন প্রলেপ বিদ্যমান। সম্প্রতি এই পাথরের তলদেশে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। তাতে খোদিত আছে জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ্‌র (৮৮৯ হিজরি: ১৪৮৪ খ্রীস্টাব্দ) নাম। পূর্ববঙ্গে এটি থেকে প্রাচীনতম একটি মাত্র শিলালিপি পাওয়া যায়। এটি এক বছর আগের। রামপালে বাবা আদমের মসজিদে এটি পাওয়া গিয়েছিলো।

১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ সুলতান গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর একশত ষাট বৎসর পর বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চ আবার পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তরিত হলো। একডালা দুর্গের খ্যাতির কথা শুনে হুসেন শাহ্ সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর সদর দফতর সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুসলমান আমলের প্রথম যুগে

সাম্রাজ্যের সীমান্তাঞ্চলে ভাগ্যান্বেষীদের জন্যে অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা অপেক্ষা করতো। এসব সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্যে যেসব গুণের দরকার হতো হুসেন শাহ্‌র মধ্যে সেগুলো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। আরবের মরুভূমি পরিত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণের জন্যে তিনি হিন্দুস্তানে আগমন করেন। এখানে এসে বাংলার সুবেদারের অধীনে তিনি একটি চাকরি সংগ্রহ করেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি চাঁদপুরের কাজীর কন্যাকে বিয়ে করতে সমর্থ হন এবং অদ্ভুত নৈপুণ্য ও প্রতিভাবলে শীঘ্রই শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বাংলার সুলতানরূপে তিনি এত বিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার সাথে রাজ্য শাসন করেন যে, তাঁর সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের রাজত্বকালে দেশে কোনো বিদ্রোহ বা গোলযোগ হয়নি। একজন ইউ-রোপীয় পরিব্রাজক সমসাময়িক কালের একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে লিউইচ ভার্টোমেনাস নামক একজন রোমবাসী হুসেন শাহ্‌র উড়িষ্যা অভিযান কালে তাঁর রাজ্য পরিদর্শন করেন। এই পরিব্রাজক হুসেন শাহ্‌র রাজ্যের বিস্তার ও সেনাবাহিনীর আকার দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তাঁর মতে, হুসেন শাহ্‌র সৈন্য সংখ্যা দুই লক্ষের কম ছিলো না।

সকল মুসলিম নৃপতির মতো হুসেন শাহ্‌ও বহু ইমারত নির্মাণ করে যান। সোনারগাঁওয়ে একটি মসজিদ অদ্যাবধি তাঁর স্মৃতি বহন করছে। গোয়ালদিতে অবস্থিত এই মসজিদটির নাম পুরানো মসজিদ। এককালে এটি অত্যন্ত সুদৃশ্য ছিলো। এই মসজিদের তিনটি মিহ্‌রাবের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে যেটি অবস্থিত, সেটি কালো পাথরের তৈরী। এটি নিপুণভাবে খোদিত এবং নিখুঁতভাবে কাজ-করা। পাশের মিহ্‌রাব দুটো সুদৃশ্য ইটের দ্বারা তৈরী। মসজিদের স্তম্ভগুলো বেলে পাথরের তৈরী। এগুলো হিন্দুদের কোনো মন্দির থেকে এনে কাজে লাগানো হয়েছিলো বলে মনে হয়। কিছুদিন আগেও এই মসজিদে সুমধুর আজান ধ্বনিত হতো। কিন্তু কালের করাল হাতের স্পর্শ লেগে এই বিপুলাকার ইমারতটি এখন জীর্ণদশাপ্রাপ্ত। প্রায় চারশ' বৎসর ধরে এখানে নিয়মিত নামাজ আদায় হওয়ার পর এটি

এখন পরিত্যক্ত। এর একশত গজ দূরে আবদুল হামিদের মসজিদ থেকে এখন সকাল-সন্ধ্যায় আজান-ধ্বনি শ্রুত হয়।

হুসেন শাহ্‌র মৃত্যু কালে ভারতের অন্যান্য স্থানে চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছিলো। বহুকাল ধরে আফগানদের করতলগত থাকার পর সাম্রাজ্যের একটির পর একটি অংশ দিগ্বিজয়ী মোগলদের পদানত হয়ে পড়ছিলো। মহান বাবর ছিলেন এই দুর্ধর্ষ মোগলদের নেতা। কিন্তু বাবর বেশীদিন সাম্রাজ্য-সুখ ভোগ করতে পারেননি। ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে কিছুদিনের জন্যে আফগান-শক্তির পুনরভ্যুদয়ের সূচনা হয়। ত্বরিৎগতিতে প্রদেশগুলোর আবার হাতবদল শুরু হয়। ইতিহাস-খ্যাত আফগান নেতা শের শাহ্ হুসেন শাহ্‌কে পরাভূত করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন এবং নয় বৎসরের সংগ্রামের পর হুমায়ুনকে চূড়ান্ত-ভাবে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

যেসব কারণে পূর্ববর্তী শাসকদের রাজ্য বার বার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, শের শাহ্ সেগুলোকে নির্মূল করে ফেলেন। তিনি নিজেই বাংলার স্বাধীন কর্তারূপে সাম্রাজ্যের ভীতির কারণরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেন। সুতরাং তাঁর প্রথম কাজ হলো রাজ্যের কোনো প্রজাই যাতে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না পারে, তার বিহিত ব্যবস্থা করা। তিনি সমগ্র বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে একজন শাসনকর্তার অধীনে আনলেন এবং তাঁদের কেউ যাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারেন, তার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর এই পরিকল্পনা খুবই সাফল্য লাভ করে এবং তাঁর আমলে বাংলায় এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তা শেরশাহী আমলের সুখ-শান্তি নামে খ্যাতি অর্জন করে। জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, শের শাহ্ দুষ্কৃতিকারীদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন যে, তাঁর আমলে মানুষ রাত্রিকালে নির্ভয়ে রাজ-পথে ঘুমাতো। তিনি সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু মহানদ পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই রাজপথের দৈর্ঘ্য তিন হাজার মাইল। এর প্রতি

কুড়ি মাইল পর একটি করে সরাইখানা এবং এক ক্রোশের ব্যবধানে একটি করে কূপের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাস্তার পাশে বহু মসজিদও তৈরী করা হয়েছিলো। পথচারীদের ছায়াদান এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তিনি পথিপার্শ্বে বৃক্ষরাজি রোপণ করেছিলেন, চিঠিপত্র এবং সংবাদাদি আদান-প্রদান ত্বরান্বিত করার জন্যে তিনি ঘোড়-ডাকের প্রবর্তন করেন। ফলে কোন স্থানে গোল-যোগের সূত্রপাত হওয়া মাত্রই সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। মাত্র পাঁচ বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে তিনি এতগুলো সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জীবনের শেষের দিকে আঙুলে শ্মশ্রু সঞ্চালন করতে করতে বড় করুণ সুরে শের শাহ্ বলতেন, 'এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হলাম। কিন্তু বড় দেরীতে—জীবন-সায়াহ্নে। কিন্তু সে তো মঙ্গলময় আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা'—কিন্তু এই নিরর্থক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বলে উঠতেন, 'এই কারণেই রাত নেমে আসার আগেই আমাকে সর্বশক্তিতে কাজ করে যেতে হবে।'

এই সংক্ষিপ্ত আফগান-শক্তির পুনরভ্যুদয়কালে বাংলা দেশের অবস্থা সম্পর্কে একটা সুন্দর চিত্র রেখে গেছেন আর একজন ইউরোপীয় পর্যটক। ভেনেশীয় বণিক সিজার ফ্রেডারিক ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে এই অঞ্চল পর্যটন করেন এবং এখানকার দ্রব্যমূল্যের সুলভতায় বিস্মিত হয়ে যান। তিনি লিখে গেছেন যে, তিনি '২ শিলিং ৬ পেন্সে দুটো গরু, একই দামে চারটি শূকর এবং এক পেনীতে একটা মোটা তাজা মোরগ এবং অনুরূপ সুলভ মূল্যে অন্যান্য দ্রব্য' খরিদ করেন। তিনি অকপটে একথাও স্বীকার করেন যে, ঐ দ্রব্যগুলো তিনি বাজার-মূল্যর দ্বিগুণ দরে খরিদ করেছিলেন বলে তাঁর লোকেরা তাঁকে জানিয়েছিলো। পূর্ব বাংলায় বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন দ্রব্য এরূপ সুলভ ছিলো বলে মনে হয়। এর শতবর্ষ পর বার্নিয়ার লিপিবদ্ধ করে যান, 'যুগ যুগ ধরে একথা বলা হয়ে এসেছে যে, মিসর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম অংশ; কিন্তু দু'-দুবার বঙ্গরাজ্য পর্যটন করে আমি এই অভিমতে এসেছি যে, একথা মিসর অপেক্ষা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রেই

অধিকতর প্রযোজ্য।' হ্যামিলটন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা দেশ ভ্রমণ করে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'এখানে এতো পর্যাপ্ত জিনিস পাওয়া যায় এবং সেগুলো এতো সুলভ যে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এ এক আশ্চর্য দেশ। এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, মন্বন্তর-মহামারী, অত্যাচার-অরাজকতায়ও এর সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য হ্রাস পায়নি।'

কিন্তু পরাক্রান্ত শের শাহের মৃত্যুর পর বাংলা দেশে দ্রুত নেমে আসে আবার গোলযোগ এবং অরাজকতা। শের শাহের পরবর্তী শাসনকর্তাগণ সমগ্র বাংলা দেশের জন্যে একজন সুবেদার নিযুক্ত করলেন। এর মারাত্মক ফল ফলতে বিলম্ব হলো না। এই সুবেদার এবং তাঁর পরের সুবেদারেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। মহামতী আকবর যখন ভারত সম্রাট, দায়ূদ খান তখন বাংলার শাসনকর্তা। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে দায়ূদ খানের মৃত্যু হলে বাংলাদেশে দীর্ঘ কালের আফগান-শাসনের অবসান ঘটে। বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক এই প্রদেশ অধিকৃত হওয়ার পর বাংলায় যে আফগান শাসন-শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিলো, দীর্ঘ চারশ' বৎসর রাজদণ্ড চালানোর পর তা চিরতরে অস্তমিত হলো।

কিন্তু আফগানরা অতো সহজে পরাভব স্বীকার করার পাত্র ছিলো না। বাংলার মধ্যভাগ থেকে বিতাড়িত হয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়ে তারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাতে থাকে। পূর্বান্তে অবস্থিত সোনারগাঁওয়ে কেন্দ্রীয় আধিপত্য বরাবর ক্ষীণ ছিলো। এই স্থানটিকে তারা নিরাপদ মনে করে খ্যাতনামা ঈসা খাঁর নেতৃত্বে প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরোধিতা করতে লাগলো। ঈসা খাঁ হিন্দু ধর্মাবলম্বী কালীদাস গজদানীর পুত্র ছিলেন বলে কথিত আছে। কালীদাস গজদানী ধর্মীয় বাদানুবাদ ও বিতর্ক ভালবাসতেন। একদা একজন মুসলিম মনীষীর সাথে ধর্মীয় বিতর্কে পরাজিত হয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

ঈসা খাঁর জীবন ছিলো বিচিত্র। তিনি বহু দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর অসম সাহসিকতার পরিচয়

পাওয়া যায়। অল্পবয়সেই বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলে। সোনাকে পাওয়ার পথে বিপত্তির অন্ত ছিলো না। কিন্তু সকল বিপদকে উপেক্ষা করে তিনি তাঁকে জয় করে নেওয়ার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হলেন। ধর্মীয় বাধা ছাড়া আর একটি বাধা ছিলো সোনার বৈধব্য। হিন্দুমতে কোনো বিধবার বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু ঈসা খাঁ শক্তিবলে তাঁকে জয় ক.র নিয়ে এলেন মেঘনা ও লাক্ষার সঙ্গমস্থলে কলাগাছিয়া দুর্গে। উত্তেজিত চাঁদ রায় এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন ঈসা খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেও তাঁকে কাবু করতে পারলেন না। কলাগাছিয়া আক্রান্ত হলো। কিন্তু সকল আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হলেন তিনি। সোনা ঈসা খাঁর বীরত্ব ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সকল দুঃখ-বেদনা কোথায় মিলিয়ে গেলো। পরম আগ্রহে তিনি ঈসা খাঁর কণ্ঠে মাল্যদান করলেন। হিন্দুধর্ম ত্যাগ ক.রে তিনি স্বামীর ধর্ম গ্রহণ করলেন। অতঃপর আজীবন ঈসা খাঁর জীবন-সঙ্গিনীরূপে এই পতিপ্রাণা রমণী তাঁকে সাহায্য করে:ছন; তাঁর সুখ-দুঃখের সমান ভাগ নিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁকে অফুরন্ত প্রেরণা। স্বামীব মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য রক্ষার জন্যে সোনাবিবি পরম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর পরমাত্মীয়গণই তাঁর চরম শত্রু হয়ে উঠেছিলেন। বার বার তঁরা রাজ্য আক্রমণ করেছেন। সোনাবিবি আমরণ সংগ্রাম করেছেন তাঁদের সাথে।

দায়ুদ খাঁর মৃত্যু হলে ঈসা খাঁ চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে ময়মনসিংহ জেলার হায়বৎনগরের নিকট জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে পলায়ন করেন। তিনি এত বড় এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন যে, তাঁর আগমন সংবাদে কুচবিহারের রাজা পালিয়ে যান। বাংলায় মোগল রাজশক্তির প্রভাব থেকে অনেক দূরে এইখানে তিনি রাজধানী স্থাপন করলেন। অতঃপর ঈসা খাঁ ক্রমে ক্রমে রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকেন। তাঁর রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বে চক্রব্যূহের মত তিনি দেওয়ানবাগ, হাজীগঞ্জ, এগারসিন্দু, শেরপুর, রাঙ্গামাটি ইত্যাদি স্থানে কেল্লা নির্মাণ করেন— যাতে করে যে-কোন দিক থেকেই

আক্রমণ আসুক না কেন, তা যেনো প্রতিহত করা যায়। তিনি এতো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে, তাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে সম্রাট আকবর শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রসিদ্ধ রাজপুত সেনাপতি মানসিংহকে পাঠতে বাধ্য হন। মানসিংহ এবং ঈশা খাঁর যুদ্ধাবতরণের কাহিনী উপন্যাসের মতই চমকপ্রদ। লাক্ষা নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে মানসিংহ ডেমরায় শিবির স্থাপন করলেন। মানসিংহ যেখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন, তার কাছে গঙ্গাসাগর নামে একটি দীঘি আজো অস্তিত্বমান। নদী ধরে এগুতে এগুতে মানসিংহ ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত ঈসা খাঁর দুর্গ এগারসিন্দুতে এসে পৌছলেন। দুর্গ-প্রাকারের বহির্দেশে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। সারাদিন ধরে অবিরামভাবে চলল সে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। সন্ধ্যা নেমে এলো। কিন্তু জয়-পরাজয় কিছুই সুনিশ্চিত হলো না। রাত নেমে এলো। পরদিন আবার যুদ্ধ হবে। আবার রক্তক্ষয় হবে। সে রক্তক্ষয় বন্ধ করার জন্যে ঈসা খাঁ এক দূত মারফৎ মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। রাজপুত সেনাপতি সে-আহ্বান গ্রহণ করলেন। কিন্তু নিরূপিত সময়ে মানসিংহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজে অবতীর্ণ না হয়ে তাঁর জামাতাকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ঈসা খাঁ এই চালাকি ধরতে পারেননি, ফলে মানসিংহের জামাতার সাথেই লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হলেন। সিংহ-জামাতা অচিরেই ধরাশায়ী হলেন এবং সাথে সাথেই প্রাণত্যাগ করলেন। ঈসা খাঁ মানসিংহের ফাঁকি ধরতে পেরে তাঁকে পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। এবার রাজপুত সেনাপতি আফগান-নায়কের সাথে যুদ্ধে নামলেন। অশ্বপৃষ্ঠে দুই বীরের মধ্যে চললো লড়াই, তাতে ঈসা খাঁর জয় হলো। অতঃপর এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। মানসিংহ তাঁর অশ্ব থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ঈসা খাঁ অশ্ব থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ভূপতিত সেনাপতিকে মাটি থেকে হাত ধরে উত্তোলন করলেন। ঈসা খাঁর শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে সেনাপতি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে ছুটে এলেন সেখানে মানসিংহের পত্নী। তিনি শিবির থেকে দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তখনকার দিনের রীতি-রেওয়াজ উপেক্ষা করে এই রাজপুতানী ঈসা খাঁর

পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। রোরুদ্যমানা এই মহিলা ঈসা খাঁর কাছে মিনতি জানালেন যে, তাঁর স্বামী পরাজয়ের কলংক নিয়ে ফিরে গেলে তাঁর শিরশ্ছেদ হবে। কারণ পরাভূত ব্যক্তির প্রতি আকবরের ক্ষমা নেই। ঈসা খাঁ কি তাঁকে পতিহারা এবং সন্তানদের পিতৃহারা হতে দেখে খুশি হবেন? ব্যাকুল কণ্ঠে মহিলা বিজয়ীর করুণা প্রার্থনা করেন। দু' চোখে তাঁর কি করুণ আকুতি। মহিলার দুরদৃষ্টের কথা শুনে ঈসা খাঁর চিত্ত বিগলিত হলো। তাঁর মনে জেগে উঠলো এক অপরূপ শৌর্যবোধ। ঈসা খাঁ মানসিংহের সাথে দিল্লী যেতে এবং সম্রাটের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে রাজি হলেন। দিল্লী পৌঁছুলে সম্রাট আকবর ঈসা খাঁকে একজন সাধারণ বিদ্রোহী আফগান মনে করে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু পরে তাঁর বীরত্ব এবং মহানুভবতার কাহিনী শুনে তাঁকে মুক্তি দেন এবং বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। তাঁকে 'মসনদে আলী' খেতাবে ভূষিত করে বাংলার সিপাহ্-সালার নিযুক্ত করেন এবং তাঁর রাজধানীর পার্শ্ববর্তী চব্বিশটি পরগণা তাঁকে দান করেন। ঈসা খাঁ অতঃপর জঙ্গলবাড়ী প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বারোজন মন্ত্রী নিয়োগ করে প্রত্যেকের উপর প্রদেশের এক একটি অংশের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ঈসা খাঁর নামে স্ব স্ব অংশের শাসনকার্য পরিচালনার নির্দেশ দান করেন। ঈসা খাঁর শাসনকালে বাংলা দেশের প্রচুর সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য ছিলো। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিলো। টাকায় নাকি তখন চার মণ চাল বিকোত। তিনি কঠোর হস্তে দেশ শাসন করে গেছেন। কাজেই তখন এখানে শান্তি অব্যাহত ছিলো। বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বহু দিন ধরে রাজত্ব করার পর তিনি পরলোকগমন করেন। বিখ্যাত এগারসিন্দু দুর্গের অদূরে বখতিয়ার-পুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মহিষী সোনাবিবি বেঁচে ছিলেন। স্বামীর মহান ঐতিহ্যকে অবিম্লান রাখার জন্যে এই বীরাঙ্গনা মহিলা পরম সাহসি-কতার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। সোনারগাঁওয়ের ইতিহাসে এই মহিলার

দৃষ্টান্ত একক এবং অনন্যসাধারণ। ঈসা খাঁর মৃত্যুর সুযোগে তাঁর শক্ররা তাঁর রাজ্যে একযোগে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো এবং অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করলো। ঈসা খাঁর জীবদ্দশায় এরা বার বার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে; কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। চাঁদপুরের রাজা কেদায় রায় ত্রিপুরা-রাজের সাথে মিলিত হয়ে মেঘনায় এক বিরাট নৌবহর সাজিয়ে রওয়ানা হলেন। তঁদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিলো যে, ঈসা খাঁ যখন নেই, জয় তাঁদের হবেই। কিন্তু শীগ্‌গীরই তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, ঈসা খাঁ মরে গেলেও তাঁর পুণ্য স্মৃতি এবং রাজ্যকে রক্ষার জন্যে তিনি রেখে গেছেন এক অসম সাহসিকা বীরাঙ্গনাকে। তাঁদেরই একান্ত আপনার জন ঈসা খাঁর পত্নী সোনাবিবি স্বামীর মতোই তাঁদের কাছে অদ্ভুত তেজস্বিনী এবং শক্তিশালিনী শক্র বলে প্রতিপন্ন হলেন। লাক্ষা নদীর তীরস্থ সোনাকুণ্ডা দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে শক্রদের মোকাবেলা করলেন। শক্র-সেনাদের আক্রমণ তিনি প্রতিহত করতে লাগলেন। কিন্তু অবশেষে চরম ক্ষণ ঘনিয়ে এলো। স্বামীর দুর্গ কিছুতেই শক্রদের পদপিষ্ট হতে দিবেন না তিনি। তাই তিনি আদেশ দিলেন দুর্গটিকে ভস্মসাৎ করে দিতে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বীরবাহু মসনদে আলী ঈসা খাঁর দুর্গ। আর সেই সর্বভুক হুতাশনে তাঁর প্রিয় জীবনসঙ্গিনী ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিলেন। লাক্ষা নদীর তীরে তীরে আজো সোনাবিবির স্মৃতি পরম শ্রদ্ধাভরে কীর্তিত।

আর একজন বিদেশী পর্যটকের লেখা থেকে সমসাময়িক কালের বাংলা দেশের একটা চিত্র পাওয়া যায়। ঈসা খাঁর আমলে চীন-সম্রাটের নিকট প্রেরিত রাণী এলিজাবেথের দূত রাল্‌ফ ফিচ্ পূর্ব বাংলা সফর করেন। তিনি লিখেছেন, এসব দেশের প্রধান রাজার নাম ঈসা খাঁ। তিনি এই অঞ্চলের সকল রাজার রাজা। তিনি খ্রীস্টানদের পরম বন্ধু।...এটি অত্যন্ত উর্বর দেশ এবং চাল, তূলা ও রেশমজাত দ্রব্য এখানকার প্রধান পণ্য। এখানকার অধিবাসীরা খুব ধনাঢ্য এবং সমৃদ্ধিশালী।' '...নারীরা তাদের কণ্ঠে রূপোর হাঁসুলী, হাতে বাজুবন্দ্, পায়ের আঙুলে রূপো ও তামার অথবা হাতির

দাঁতের আংটি পরিধান করে থাকে।' সোনারগাঁও সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সোনারগাঁও শ্রীপুর থেকে নয় ক্রোশ দূরে। এখানে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট সূতী কাপড় তৈরী হয়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও গৃহগুলো ক্ষুদ্রাকার এবং সেগুলোতে খড়ের ছাউনি। বাঘ ও শেয়ালের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বাড়ীর চারিদিক চাটাইয়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। অধিকাংশ লোকই ধনী। তারা মাংস খায় না অথবা পশু বধ করে না। পরনে তাদের সামান্য মাত্র বস্ত্র এবং শরীরের অন্যান্য অংশ খোলা। ভাত, দুধ ও ফলমূল তাদের প্রধান খাদ্য। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সূতীবস্ত্র এবং চাল ভারতের অপরাপর অংশে, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং আরও বহু স্থানে রফতানী হয়।'

যেসব ঘটনা সোনারগাঁওয়ের ইতিহাসের যবনিকা টেনে আনে, সোনাকুণ্ডার পতন তার অন্যতম। চাঁদপুর ও ত্রিপুরার রাজা সমগ্র দেশ লুণ্ঠন করে ছারখার করে ফেলেন। তার সাথে সাথেই এসে পড়লো লুণ্ঠনজীবী বন্য মগ জাতি। পূর্ব বাংলার নদী-তীরবর্তী শান্তিপ্রিয় কৃষকদের অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠতো মগদের নামে। প্রাচীন নগরী সোনারগাঁওয়ের দুঃখের দিন নেমে এসেছিলো। এর অন্তিম ক্ষণ আসন্ন হয়ে এলো। নেতা নেই, ঐক্য নেই—চারিদিকে শুধুই বিশৃঙ্খলা। এতোদিন যেসব শত্রু নগরীর বহির্দ্বারে প্রতিহত হয়ে বার বার ফিরে গেছে, অতঃপর তারা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করলো। ভবঘুরে পর্তুগীজদের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে মগদের শক্তি বৃদ্ধি পেলো। পর্তুগীজগণ ছিলো নৌবিদ্যায় সুনিপুণ। তারা মগদের নৌবিদ্যা ও জলপথে আক্রমণের কৌশল শিখিয়ে দিলো। এরা এমন ত্রাসের সৃষ্টি করতে থাকে যে, বাংলায় নবোত্থিত মোগল শক্তি তাদের আর বেশীদিন উপেক্ষা করে থাকতে পারলো না। ইসলাম খাঁ রাজমহল পরিত্যাগ করে মগদের দমন করার জন্যে পূর্বাঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের সংকল্প করলেন। সোনারগাঁওয়ের পতন এসে গিয়েছিলো এবং মগদের আক্রমণের পক্ষে সুবিধাজনক স্থান-

হয়ে পড়েছিলো। কাজেই রাজধানীর পক্ষে সোনারগাঁও অনুকূল নয় মনে করে তিনি একটি অধিকতর নিরাপদ স্থানে রাজধানী স্থাপন করলেন। অতঃপর বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকায় দ্রুত গড়ে উঠলো বাংলার রাজধানী। এর পর থেকে সোনারগাঁও ইতিহাসের অন্তরালে চলে গেলো। সে নিঃশেষে তলিয়ে গেলো— যেন সোনারগাঁও নামে কোনো নগরীর অস্তিত্ব কোনো কালে ছিলো না— এমনিভাবে।

সোনারগাঁওয়ের অতীতের যে সামান্যমাত্র নিদর্শন আজো টিকে রয়েছে, সেগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে-সেখানে পড়ে আছে। কতকগুলো বা ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন দিত। আবার কতকগুলো ধানের ক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে। ভুলেও সেগুলোর দিকে কেউ তাকায় না। বড়ো বড়ো দীঘি এবং রাস্তাঘাট বৌদ্ধ রাজাদের স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের দুর্গের ভগ্নাবশেষ যেখানে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানেই আফগানগণ তাদের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে এখন তরবারির স্থলে লাঙলের প্রভুত্ব। অসংখ্য মসজিদ আর মাজার শত শত বৎসর ধরে অবলোকন করেছে একটা মহান ধর্মের শক্তি ও অনুপ্রেরণা। সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে মাটির ঢিবি বা পীরের গদী। সোনারগাঁওয়ের গৌরবময় যুগের শেষ দিকে নাকি ভারতের নানা স্থান থেকে বহু পীর-ফকির এখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চপীরের স্মৃতিই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের পরিচয় বা জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাঁদের অনুসারী ভক্তদের মতে তাঁরা পশ্চিম দেশ থেকে এখানে আগমন করেছিলেন। ভক্তদের মনে তাঁদের পবিত্র স্মৃতি আজো জাগরুক রয়েছে। সমান্তরালভাবে স্থাপিত পাঁচটি কবরের মধ্যে তাঁরা শায়িত রয়েছেন। একটি ক্ষুদ্র মসজিদ প্রহরীর মতো তাদের পাশে দণ্ডায়মান— যদিও ঝড়ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাতে তা ধ্বংসোন্মুখ। এক কালে এর পাশ দিয়ে বয়ে যেতো ব্রহ্মপুত্র নদ। কিন্তু চঞ্চলগতি এই নদীর স্রোতধারা এখন দূরে সরে গেছে। পঞ্চপীরের মাজারের পদতল ধৌত করে আর সে বয়ে যায় না। পাঁচপীরের মাজারকে

লোকে খুব ভক্তি করে থাকে। হিন্দুরা এসব মাজার অতিক্রমকালে এগুলোকে প্রণাম করে থাকে। আর মুসলমানগণ মাজার জিয়ারতের জন্যে বহু দূর দূরান্ত থেকে এখানে আগমন করে। পূর্ব বাংলার আরো যেসব মাজার মুসলমানগণ জিয়ারত করে থাকে এদের একটি হচ্ছে ঢাকা থেকে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মীরপুরের শাহ্ আলী সাহেবের দরগাহ্ এবং অপরটি চট্টগ্রামে পীর বুড়া আউলিয়ার মাজার। হিন্দু ও মুসলমান নাবিকদের রক্ষা করে থাকেন তিনি।

মগবাপাড়া নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে মুন্না শাহ্ দরবেশের মাজার অবস্থিত। এখানেই এককালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তাদের রাজধানী ছিলো। এখনো এই মাজারে বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে এবং মুসলমানগণ এর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া পাঠ করে। এর পাশেই অবস্থিত পীর শেখ মোহাম্মদ ইউসুফের দরগাহ্। তিনি অধিকতর খ্যাতি-সম্পন্ন পীর। গম্বুজবিশিষ্ট দু'টো লম্বা দালানের মধ্যে পীর সাহেব, তাঁর পত্নী ও পুত্রের মাজার রয়েছে। গম্বুজের চূড়া এককালে নাকি স্বর্ণমণ্ডিত ছিলো। অবশ্য এখন তার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। হিন্দুরাও শেখ মোহাম্মদ ইউসুফের মাজারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে থাকে। শস্যহানির আশংকা দেখা দিলে কৃষকেরা মাজারে একমুঠ চাল প্রদান করে। কারুর সন্তান অসুস্থ হলে অথবা গবাদিপশুর রোগ দেখা দিলে সে এই মসজিদে শিরনি দেয় অথবা ক্ষেতে ভালো ফসল হলে ক্ষেত থেকে এক গোছা ধান এনে মাজারে উপহার দেয়। হাসি-কান্নায়, আনন্দে-বিষাদে, সম্পদে-আপদে এই মহাপুরুষের মাজার তাদের জীবনের সাথে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে।

এর কাছেই একটা বিধ্বস্ত ফটক। এটি নহবতখানা নামে পরিচিত। সোনারগাঁওয়ের সমৃদ্ধির যুগে এখানে একটা মুসাফিরখানা ছিলো। ফকির-দরবেশ ও পথিককে এই মুসাফিরখানার সন্ধান জ্ঞাপনের জন্যে এখানে বাজতো নহবত। নহবতখানার সে সুরমূর্চ্ছনা কবে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু এই সেদিন পর্যন্তও এর কাছেই জীর্ণ ইমারতের মধ্যে শ্রুত হতো পবিত্র কোরানের মহান অমিয় বাণী। এখানে প্রৌঢ় শিক্ষকগণ যুবকদের মহান ইসলাম ধর্মের মূলনীতি শিক্ষা দিতেন এবং আবৃত্তি করতেন কোরানের ঝঙ্কারময় মধুবর্ষী আয়েতসমূহ।

এখানে জঙ্গলের মধ্যে তৃণ-গুল্ম ঢাকা অবস্থায় আর একজন পীরের মাজার আছে। এই পীর পোনাকী দরবেশ নামে কথিত। কিংবদন্তী মতে আল্লাহ্‌র পথে জীবন যাপনের জন্যে তিনি পৃথিবীর মায়াবন্ধন ছিন্ন করে জঙ্গলে যান এবং এবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি বারো বৎসর ধরে ধ্যানমগ্ন থাকেন এবং এবাদতে এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর হুশ ছিলো না। তাঁর ভক্ত-চেলাগণ তাঁর সন্ধান না পেয়ে বহুদিন ধরে তাঁকে খুঁজতে থাকে। অবশেষে তারা দেখতে পেলো যে, তাঁর আসনের চারিদিকে গলা পর্যন্ত উঁই পোকার ঢিবি গড়ে উঠেছে। সে-ঢিবি ভেঙে ফেলে তাঁকে বের করা হয়। অধিকতর সাম্প্রতিককালে এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিলো বলে মনে হয়। কারণ এমন বহুলোক জীবিত আছে, যারা পীরের ছেলেকে দেখেছে বলে দাবী করে থাকে। পীর এবং তাঁর সন্তানের কবর পাশাপাশি। বারো বছর ধরে যে পাথরের উপর বসে পীর সাহেব এবাদৎ করেছিলেন, সেটি তাঁর শিরোদেশে স্থাপিত।

সামান্য কিছুদূরে মাঠের ওপারে পাগলা পীরের দরগাহ্। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তি করে থাকে। এঁকে কেন পাগলা পীর বলা হতো, তার কারণ অনুসন্ধান করা বৃথা। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, খোদার প্রেমে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আর এক কিংবদন্তী মতে তিনি চোরদের উপর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে, তাদের সবাইকে শেষ করে ফেলার সংকল্প করেন। অতঃপর সব চোরকে একটা দেয়ালে বেঁধে তাদের মাথা কেটে ফেলেন। কাটা মুণ্ডগুলোকে মালার মতো করে গেঁথে ঐগুলো পার্শ্ববর্তী খালে ফেলে দেন। সেই থেকে ঐ খালটি মুণ্ডমলা নামে পরিচিত হয়ে আসছে।

একরূপ কতকগুলো কিংবদন্তী ছাড়া সোনারগাঁওয়ের অস্তায়মান দিনগুলোর আর বিশেষ কোনো ইতিহাস আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বুড়িগঙ্গার তীরে নবপ্রতিষ্ঠিত এক নগরী ক্রমে হয়ে উঠলো সকল আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। সোনারগাঁওয়ের যে সামান্য মাত্র কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছিলো, তা-ই বেঁচে রইলো। আর এর সকল অলিখিত কাহিনী ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেলো। পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত সোনারগাঁও ইতিহাসের রাজ্য থেকে নির্বাসিত হলো। পরিতাপের কথা, সোনারগাঁওয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করেনি। কেউ লিখে যায়নি তার কথা। তাই ইতিহাসের অগোচরেই ঘুমিয়ে পড়লো সে। কেউ তার কথা ভাবেনি। সোনারগাঁও-ও কারুর কথা ভাবে না। নিশ্চিন্ত মনে সে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত।

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকার অভ্যুদয়

সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খাঁ সম্পর্কে লিখে গেছেন, 'তিনি শৈশবে আমাব সাথেই বেড়ে উঠেছেন এবং আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। তিনি খুব সাহসী এবং চরিত্র তাঁর মহৎ। তাঁর বংশ এবং পরিবারের মধ্যে তিনি সর্বদিক দিয়ে স্বতন্ত্র ধরনের। আজ পর্যন্ত তিনি কোন মাদক দ্রব্য স্পর্শ করেননি। আমার প্রতি তিনি এতো অনুরক্ত যে, আমি তাঁকে 'ফরজন্দ' (পুত্র) খেতাবে সম্মানিত করি।' সমগ্র বাংলা দেশের নয়া রাজধানী ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁকে তাঁর প্রভু সম্রাট জাহাঙ্গীর কি চোখে দেখতেন, এ-থেকে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার পর ইসলাম খাঁর স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা খুব সহজ ছিলো না। বহুদিন ধরে আফগান-মোগল সংঘর্ষের ফলে সমগ্র প্রদেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হযেছিলো। শক্তিশালী স্বাধীন নরপতিদের আমলে যে ঐক্য ও শান্তি ছিলো, তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুদ্র দলপতিদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা ঘোষণা করার প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আফগানগণ বার বার পরাজিত হয়ে প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং সেখান থেকে এখানে-সেখানে বার বার হানা দিতে থাকে। ঐ সময়ে পর্তুগীজগণ সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলো। নৌবিদ্যায় পারদর্শী দু:সাহসিক পর্তুগীজগণ নূতন নূতন দেশের সন্ধানে সমুদ্রপথে দূর দূরান্তে পাড়ি জমাতে থাকে। এ ব্যাপারে ইউরোপের অন্যান্য জাতির পুরোভাগে ছিলো এরা। ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে চারটি জাহাজের এক নৌবহর পর্তুগীজ পতাকা উড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে আসে এবং গঙ্গায় প্রবেশ করে। কুড়ি

বৎসর পরে হতভাগ্য মোহাম্মদ শাহ্ রাজধানী গৌড়ে আফগানদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং ভারতের পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকদের গবর্নর-জেনারেল নুনোদ্য কুনার সাহায্য চেয়ে পাঠান। তাঁর আহ্বানে গোয়া থেকে নয়টি জাহাজভর্তি সৈনিক এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছুবার আগেই শত্রুর হ'তে রাজধানী সমর্পণ করতে হয়। বাংলায় পর্তুগীজদের সশস্ত্র আ'বির্ভাবের পথ এভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেলো এবং এর ফলে যে বিরাট সুযোগ তাদের কাছে এলো, তা তারা হাতছাড়া করার পাত্র ছিলো না। একটা প্রচুর সম্ভাবনাময় এবং সম্পদশালী দেশের সন্ধান তারা পেয়ে গেলো। সামুদ্রিক জীবনে অভ্যস্ত এই লোকগুলোকে বাংলার বিরাট বিরাট নদী বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তুললো। তাদের অনেকে চট্টগ্রাম ও আরাকানে ইতিমধ্যে বসতি স্থাপন করেছিলো। তাদের একটি দল সোনারগাঁওয়ের কুড়ি মাইল দক্ষিণে শ্রীপুরে বসতি গড়ে তোলে।

বাংলায় প্রথমাগত পর্তুগীজদল ছিলো অদ্ভুত প্রকৃতির। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক ফ্রাঙ্কইচ বার্নিয়ার তাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন যে, এরা ভারতে পূর্বাগত এবং অধিকতর আইনানুগ পর্তুগীজদের উপনিবেশগুলো থেকে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলো। 'এরা এমন লোক ছিলো যে, মঠ-গীর্জা ছেড়ে দিয়েছিলো। এক একজন দু'বার তিন বার বিয়ে করেছিলো। এরা ছিলো খুনি। যারা ফাঁসির যোগ্য, এদের কাছে তারাই ছিলো সব চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র।' বস্তুতঃ এরা বিবেকবর্জিত অসম সাহসিক বোম্বেটে জলদস্যু। এদের স্বভাব ছিলো বন্য এবং বর্বর। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সভ্যতার কোনো বিধি-বিধানই এদের জীবনে ন্যূনতম প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি। বার্নিয়ারের মতে এদের জীবন ছিলো 'জঘন্য ধরনের এবং এরা খ্রীস্ট-ধর্মের কলঙ্কস্বরূপ। এরা একে অন্যকে নির্মমভাবে হত্যা করতো অথবা দেহে বিষ প্রয়োগ করতো, এমন কি, নিজেদের পাদ্রীদের পর্যন্ত মেরে

ফেলতো। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাদ্রীরাও তাদের চেয়ে কোনো অংশে ভালো ছিলো না।' তাদের সম্পর্কে বার্নিয়ার যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তা বেশ হৃদয়গ্রাহী এবং বাস্তবধর্মী। তিনি বলেন, 'স্থল ও জলপথে চুরি-ডাকাতি করাই তাদের পেশা ছিলো। কয়েকটি ক্ষুদ্র এবং দ্রুতগামী নৌকায় সমুদ্রোপকূল এবং নদীর মধ্যে এসব বোম্বেটে লুটতরাজ করে বেড়াতো। কখনও কখনও ওরা নদী বেয়ে দেশের পঞ্চাশ/ষাট মাইল অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতো এবং আকস্মিকভাবে আক্রমণ করতো শহর, বন্দর, লোকালয়, সভা-সমিতি, বিবাহ ও উৎসবাদি। চালাতো নিরবচ্ছিন্ন লুটতরাজ। ধনী-দরিদ্র, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সবাইকে বেঁধে তাদের উপর চালাতো ভয়াবহ নৃশংসতা। লুণ্ঠিত সম্পদের সাথে এসব নর-নারীকেও নিয়ে যেতো তাদের সাথে ক্রীতদাসরূপে। লুণ্ঠন-পর্ব সমাপ্ত হ'লে ঐসব শহর, বন্দর এবং লোকালয়ে অগ্নিসংযোগ করে সেগুলোকে মহাশ্মশানে পরিণত করার পর ওরা ফিরে যেতো। যাদের তারা লুঠের মালরূপে গোলাম করে নিয়ে যেতো, তাদের মধ্যে বৃদ্ধও থাকতো। এসব বৃদ্ধকে কাজে লাগানো যাবে না দেখে ওদের বেচে ফেলতো। তারা এতোই দুরন্ত এবং বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো যে, যেখান থেকে এসব বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, সেখানেই ওরা আবার ফিরে আসতো তাদের বিক্রয় করতে। আক্রমণের সময় যারা পলায়ন করতো অথবা বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে পড়তে পারতো, তারা হয়তো মুক্তিপণ দিয়ে তাদের পিতা-মাতাকে উদ্ধার করে নিতো এদের কাছ থেকে।'

এইসব বেপারোয়া দুর্ধর্ষ বোম্বেটেকে যে আরাকান-রাজ প্রথম দিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখতে থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ফলতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এরা এমন বিজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তিনি তাঁর রাজ্য থেকে এদের মূলোৎপাটন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় এবং এদের অনেকে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে গঙ্গার মোহনায় আড্ডা বাঁধে। এখান থেকে তারা নির্বিঘ্নে চালিয়ে

যেতে থাকে তাদের দস্যুবৃত্তি। ইসলাম খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার আগের বৎসর এই অঞ্চলের স্থানীয় মোগল শাসনকর্তা বোম্বেটেদের দমন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি তাদের শক্তির পরিমাণ আন্দাজ করতে পারেননি। ফলে তাদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। তিনি নিজে এবং অধিকাংশ সৈন্যই তাদের হাতে নিহত হন এবং তাঁর নৌবহরটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম খাঁ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে এখানে আগমন করলে তাঁকে এসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। পূর্ব বাংলাকে এই মহাবিপদ থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যভাগে রাজধানী স্থাপনের সংকল্প করেন। তাঁর দফতর এবং উজির-আমলাদের নিয়ে তিনি রাজমহল পরিত্যাগ করে পূর্ব বাংলার পথে যাত্রা করলেন। তাঁর আগমন সংবাদে আফগানগণ বংশী নদীর তীরে অবস্থিত তাদের কেল্লা পরি-ত্যাগ করে। কথিত আছে যে, তিনি এস্থানে রাজধানী স্থাপন করবেন মনস্থ করে এখানে এসে থেমে যান। কিন্তু পরে যখন দেখলেন যে, স্থানটি অত্যন্ত নীচু এবং বংশী নদীর বন্যায় এটি প্রায় ডুবে যায়, তখন তিনি রাজধানী করার পক্ষে অনুকূল একটি স্থানের সন্ধানে পুনরায় যাত্রা করলেন এবং ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার ভাটির দিকে চলতে শুরু করলেন। এখন যেখানে ঢাকা নগরী অবস্থিত, ঠিক তার বিপরীত দিকে এসে তিনি থেমে গেলেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন এই স্থানটি দেখে। বুঝতে পারলেন সামরিক দিক দিয়ে এটি হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তা ছাড়া দূরবিস্তৃত উচ্চভূমি থাকায় এখানে যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যাবে। তিনি সাথে সাথেই এখানে রাজধানী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ইসলাম খাঁ যখন তাঁর এই ভাবী রাজধানীর জায়গায় উপস্থিত হয়েছিলেন সে-সময় এখানে কি ছিলো, তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। এর পূর্ববর্তী ইতিহাস এতোই কুয়াশাচ্ছন্ন যে, এখানে কোনো শহর ছিলো অথবা কয়েকটি পল্লীমাত্র ছিলো, তা বলা অসম্ভব। ইউরোপীয় পর্যটকগণ

এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে-নগরটিকে 'বেনগলা' বলে উল্লেখ করে গেছেন, এখানেই সেটি ছিলো বলে প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে , -মোগল যুগে এখানে বাহান্ন বাজার ও তেপ্পান্ন গলিবিশিষ্ট একটি শহর ছিলো এবং সেটি 'বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি' নামে খ্যাত হয়েছিলো। এই বাহান্নটি বাজারের মধ্যে একটি বেনগলা নামে পরিচিত ছিলো এবং বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে এই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। হয়তো বা 'বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি'র মতো একটা বিরাট নামের পরিবর্তে এই গুরুত্বপূর্ণ বাজারটির নামেই পর্যটকগণ শহরটির পরিচয় দিয়ে থাকবেন। ষোড়শ শতাব্দীতে পরিব্রাজক মেথল্ড রাজমহল এবং বেনগলাকে সুদৃশ্য নগরী বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ঢাকার কোনো উল্লেখ করেননি। ঐ সময়ে মাণ্ডেল্স্লো বঙ্গদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে ঢাকা, রাজমহল এবং সাতগাঁওয়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন; কিন্তু গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট মানচিত্রে তিনি বেনগলার উল্লেখ করেছেন— ঢাকার উল্লেখ সেখানে নেই। বেনগলা আর ঢাকা যদি এক না হয়, তবে এই শহরটি কোথায় অবস্থিত ছিলো তা রহস্যাবৃত্ত রয়ে যায়। শ্রীপুরের মতো এটি নদীর আক্রমণের ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে থাকলেও এর সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু কিছু জনশ্রুতি বা কিংবদন্তী থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা কিছুই নেই।

ঢাকা নামটিই বা কোথা থেকে এলো, তা-ও এক রহস্য এবং এই রহস্য উদ্ধারের প্রচেষ্টা অনেক উর্বর মস্তিষ্কের খোরাক জুগিয়েছে মাত্র। একটা প্রচলিত কাহিনীতে প্রাক-মুসলিম যুগ থেকে এই নগরী ঢাকা নাম বহন করে আসছে। রাজা বল্লাল সেন জঙ্গলে-ঢাকা দেবী দুর্গাকে উদ্ধার করে ঢাকা-ঈশ্বরী নামে তাঁর একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই থেকে মন্দিরের নাম হয় ঢাকেশ্বরী এবং ধীরে ধীরে ঢাকা নাম ধরে এর চার পাশে একটা শহর গড়ে ওঠে। আর এক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, নদীর তীরে প্রাচীন কাল থেকে একটা বিরাট ঢাক বৃক্ষ ছিলো এবং গাছের নাম

থেকেই শহরটির নাম ঢাকা হয়েছে। অপর এক জনশ্রুতি অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্র ঢাক থেকে ঢাকার উৎপত্তি হয়। কথিত আছে, ইসলাম খাঁ যেখানে নয়া রাজধানীর স্থান নির্বাচনের জন্যে নৌকা থেকে অবতরণ করেন, সেখানে হিন্দুরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা করছিলো। ঢাকের শব্দে ইসলাম খাঁ চমৎকৃত হয়ে পড়েন। তিনি বাদকদের নদীর তীরে দাঁড়িয়ে খুব জোরে ঢাক-ঢোল বাজাতে বলেন এবং তিনজন পরিচারককে তিন দিকে প্রেরণ করলেন। এক দিকে থাকবে নদী আর তিনজন তিন দিকে যাবে। যতোদূরে গিয়ে আর ঢাকের শব্দ শোনা যাবে না, সেখানে তাদের সীমান্ত-পতাকা স্থাপন করতে বলা হয়। এইসব স্থানে সীমান্ত-স্তম্ভ নির্মিত হলো। এভাবে ইসলাম খাঁ তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর সীমানা নির্দেশ করেছিলেন।

সম্ভবতঃ ইসলাম খাঁর আমলে আগে থেকেই কাছাকাছি স্থাপিত অনেক-গুলো বাজারের মধ্যে একটি ঢাকা নামে পরিচিত হয়ে আসছিলো এবং এসব বাজার নিয়ে এই শহর গড়ে উঠেছিলো। ভারতীয় শহরগুলোর উৎপত্তির সন্ধান করলে পুনঃ পুনঃ এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যাবে যে, কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে একটি মাত্র বিরাট পল্লীতে পরিণত হয়েছে এবং এই সব গ্রামের সবচেয়ে যেটি বড়ো ছিলো, তার নামে অথবা স্থানীয় কোনো পবিত্র স্থান বা মন্দিরের নামে গোটা পল্লীটার নাম হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পূর্বোক্ত গ্রামগুলো বহু দিন পর্যন্ত স্ব স্ব নাম বজায় রাখতে সমর্থ হতো। ঢাকা শহরটি এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শহরের বিভিন্ন অংশের স্থানীয় নাম আজো বেঁচে রয়েছে। এটিই হওয়া সম্ভব যে, ঢাকেশ্বরী মন্দিরের খ্যাতি অথবা ইসলাম খাঁর এখানে প্রথম অবস্থিতির দরুনই নূতন রাজধানীর ঢাকা নাম হয়েছিলো। ইসলাম খাঁ সম্রাটের প্রতি সম্মানের নিদর্শন-স্বরূপ রাজধানীর সরকারী নাম দিলেন জাহাঙ্গীরনগর। মুসলমান ঐতিহাসিক-দের লিখিত গ্রন্থে এই নগরী জাহাঙ্গীরনগর নামেই উল্লেখিত হয়েছে।

রাজধানী স্থাপিত হওয়া মাত্রই ইসলাম খাঁ মগ ও পর্তুগীজদের দমনে মনোনিবেশ করলেন। এই দুই জাতির লোকদের সম্পর্কের মধ্যে একটা

অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে এবং ফলে তারা পূর্ব বাংলার পক্ষে আরও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতোদিন পর্যন্ত এদের মারাত্মক শত্রুতা ছিলো। আকস্মিকভাবে আরাকানীবা পর্তুগীজদের পরম মিত্র হয়ে দাঁড়ালো। এদের মূল লক্ষ্য হলো মোগলদের প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করা। পর্তুগীজ-গণ স্থানীয় মোগল শাসনকর্তাকে পরাভূত করতে পারায় তাদের দম্ভ এবং উচ্চাশা বেড়ে যায়। তাদেব ভেতর থেকে গনজালেস নামক একজন সাধারণ নাবিককে নেতৃপদে নির্বাচিত করে। তার পর তার সৈনাপত্যে তাবা সন্দীপ অধিকার করে। পর্তুগীজগণের বাসনা ছিলো বাংলায় স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে সন্দীপে তাদেব সদব দফতর প্রতিষ্ঠা করা। গনজালেসের অসম সাহসিকতাপূর্ণ কাহিনী মধ্যযুগের উপন্যাসের মতোই চমকপ্রদ। বিবেকবর্জিত, অপরিণামদর্শী এই দুঃশীল বোম্বেটের মধ্যে ছিলো সীমাহীন উচ্চাকাঙক্ষা। লুটপাট এবং লড়াই ছাড়া অন্যকিছু সে বুঝতো না। তবে তার মধ্যে নেতৃত্বেরও কতক-গুলো গুণ ছিলো। এক সহস্র মুসলমানকে সন্দীপে হত্যা করে এবং ভয়ার্ত হিন্দুদের গোলামে পর্যবসিত করে সে সন্দীপে জেঁকে বসে। তার দস্যুবৃত্তি, লুটতরাজের কাহিনী দিক-বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং চাবিদিক থেকে নানা ধরনের দুঃসাহসিক বদমায়েশদের আকৃষ্ট করে। এরা গনজা-লেসের দলে ভিড়ে যায়। তার দলে পতুগীজদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার, ভারতীয় নাবিক দু'হাজার এবং অশ্বারোহী দস্যু দুইশত। তা ছাড়া তার নৌবহরে কামান সংযুক্ত আশিটি নৌকাও ছিলো।

পর্তুগীজ বোম্বেটেদের এইরূপ শক্তি আরাকান-রাজের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করে। তিনি মুসলমান সম্রাটদের ভাগ্যের উত্থান-পতনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন। মুসলমান রাজশক্তিকে তিনি একটা বিপজ্জনক এবং শক্তিশালী প্রতিবেশীরূপে মনে করে এসেছেন। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় এবং বাংলার রাজধানী প্রদেশের পূর্ব প্রান্তে স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁর বিপদাশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে আসে। ইসলাম খাঁ যখন উড়িষ্যায়

আফগানদের সাথে শেষ মোকাবেলায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় আরাকান-রাজ নয়া রাজধানীকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার সংকল্প নিলেন। এই অভিসন্ধিকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি পর্তুগীজদের প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করলেন। মোগলদের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের দ্বারা যথেষ্ট কাজ হবে বিবেচনা করে তিনি সন্দীপে দূত প্রেরণ করলেন এবং গনজালেসের সাথে সন্ধি করে তার সাহায্য ভিক্ষা চাইলেন। সন্ধির শর্ত স্থির হলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, পর্তুগীজরা নদীপথে এবং আরাকানীরা স্থলপথে অগ্রসর হয়ে ঢাকার ভাটিতে এক স্থানে মিলিত হবে এবং একযোগে রাজধানী আক্রমণ করবে। যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁরা বাংলা দেশ তাঁদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন। কিন্তু ইসলাম খাঁকে তাঁরা চিনতে পারেননি। তিনি এই অভিসন্ধির কথা জানতে পেরে মগদের বিরুদ্ধে এক বিরাট অশ্বারোহী সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। পর্তুগীজদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভের আগেই মগেরা মোগল সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত হয়। বহু আরাকানী সৈন্য নিহত হয়। এদিকে গনজালেস কেবল তার নিজের সৈন্যদের নিয়ে মোগলদের সম্মুখীন হতে সাহস করলো না। সে সসৈন্যে সন্দীপে ফিরে গেলো। অতঃপর মগেরা বোম্বেটেদের আর বোম্বেটেরা মগদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে লাগলো। যা হোক, এদের দুরভিসন্ধি বানচাল হয়ে যাওয়ার ফলে পূর্ব বাংলায় কিছুকালের জন্যে শান্তি ফিরে আসে।

পাঁচ বৎসর শাসনকার্য পরিচালনার পর ইসলাম খাঁ ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অন্ততঃ এই আনন্দ ও সন্তোষ নিয়ে মরে যেতে পেরেছিলেন যে, সর্বত্রই তাঁর শ্রম ও উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাঁরই প্রচেষ্টায় মগ ও বোম্বেটেরা পর্যুদস্ত হয়েছিলো এবং তাঁরই সেনাবাহিনী বাংলা ও উড়িষ্যা থেকে আফগানদের শেষ শক্তি নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলো। তাঁর মৃত্যুর আগের বৎসর তাঁর সেনাপতি শুজাত খান আফগান নেতা ওসমান খানের পুত্র ও ভ্রাতাকে বন্দী করে বহু হস্তী, মণিমুক্তা ও অন্যান্য

মহামূল্য সম্পদসহ বিজয়ানন্দে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। সম্রাট ইসলাম খাঁকে খুব প্রীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর নিদর্শনস্বরূপ তিনি ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা কাসেম খাঁকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ভাইয়ের মতো প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর পাঁচ বৎসরের শাসনামলে পর্তুগীজ ও মগদের তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পায় এবং তিনি তাদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে অবশেষে দিল্লীতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। আরাকানের রাজার সাথে সেবাস্টিন গনজালেসের আবার বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে কাসেম খাঁর শাসনকালে তারা মিলিতভাবে বাংলার মোগল-শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে যায়। অনেক বৎসরের দুঃসাহসিক ও বেপরোয়া জীবন যাপনের পর অবশেষে গনজালেসের অন্তিম ঘনিয়ে আসে। সে চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। কিন্তু আরাকানীদের হাতে পরাজিত হয়ে সন্দীপে ফিরে আসে। আরাকানীরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে অবশেষে পরাজিত ও নিহত করতে সমর্থ হয়। মগেরা আবার সন্দীপ অধিকার করে নেয়। পর্তুগীজদের ভয় দূরীভূত হওয়ায় তারা নূতন করে আবার পূর্ব বাংলায় হানা দিতে শুরু করলো।

তৃতীয় সুবেদার ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন তেজস্বী ও শক্তিমান পুরুষ। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভগ্নীপতি বলে সম্রাট-দরবারে তিনি যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে বিরাট সাফল্যের ফলে তাঁর মর্যাদা আরও উন্নীত হয়। ইব্রাহীম খাঁ চার বৎসর ধরে দৃঢ় হাতে পূর্ব বাংলা শাসন করেন এবং এই সময় প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ না থাকায় কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। দেশের এই অংশ মসলিন বস্ত্রের জন্য বহু দিন ধরে খ্যাতি অর্জন করে আসছিলো। বাদশাহী পৃষ্ঠপোষকতা এই শিল্পে এক নূতন প্রেরণা দান করলো। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সম্রাটের চোখে নিজেকে মোহনীয়-রমণীয় করে তোলার জন্যে দেহ-সজ্জা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির নব নব ঢং বা ফ্যাশনের প্রবর্তন করেন। ঢাকার সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।

পঞ্চম অধ্যায়

ঢাকার অভ্যুদয়

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঢাকা যে পরবর্তী কালে সমৃদ্ধি ও সাফল্যেব সর্ব্বোচচ শিখরে আরোহণ করে, তার সূচনা হয়েছিলো এই সময়ে।

বাংলা দেশে শান্তি বেশীদিন স্থায়ী হলো না। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে সম্রাট-পবিবাবে যে চক্রান্ত, বিরোধ ও অশান্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তার কালো ছায়া বাংলাকেও গ্রাস করলো। নূবজাহান সম্রাটের চতুর্থ পুত্র শাহ্‌রিয়াবের জন্যে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের ঔরসে তাঁর কোনো সন্তান জন্মেনি। প্রথম স্বামী শেব আফগানের ঔরসে নূবজাহানের যে-কন্যা জন্মেছিলো, তাব সাথে শাহ্‌রিয়ারের বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাহান পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করে সিংহাসন দখলের জন্যে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সসৈন্যে দিল্লীর পথে ধাবিত হলেন। পীড়িত হলেও জাহাঙ্গীর জীবদ্দশায় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে বরদাশ্‌ত করার পাত্র ছিলেন না। পুত্রের অবাধ্য আচরণে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। রোগশয্যা ত্যাগ করে তিনি পুত্রকে শায়েস্তা করতে অগ্রসর হলেন। নিজেই সৈনাপত্য গ্রহণ করে তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। শাহ্‌জাহান পরাভূত হয়ে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করলেন। সেখানে গিয়ে অনেক বিবেচনার পর স্থির করলেন যে, ভবিষ্যতে সিংহাসন লাভ করতে হলে বাংলা দেশের শাসনভার হস্তগত করা একান্ত দরকার। জাহাঙ্গীরের অনুরক্ত সুবেদার ইব্‌রাহীম খাঁ প্রভুর বিদ্রোহী পুত্রকে মোকাবেলার জন্যে ঢাকা থেকে দ্রুত রওয়ানা হলেন। কিন্তু বাংলার প্রবেশ-পথ বিখ্যাত তেলিয়াগড়িয়া সংকটে পরাজিত ও নিহত হলেন। শাহ্‌জাহান এই সাফল্যের পর দ্রুত বাংলায়

তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করলেন। আশে পাশে যতো নৌকা পাওয়া গেলো, সবগুলো সংগ্রহ করে বিপুল সমারোহের সাথে তিনি ঢাকার পথে ধাবিত হলেন। ঢাকায় পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন যে, রাজধানীর ফটক উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্যে। ইব্‌রাহীম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে রাজধানীর ভার ন্যস্ত ছিলো। শাহ্‌-জাহানকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো না। তিনি নিজেই এসে শাহ্‌জাহানকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর চাচার সবগুলো হাতী ও সম্পত্তিসহ সরকারী কোষাগারের চল্লিশ সহস্র টাকা তাঁকে উপঢৌকন দিলেন।

শাহ্‌জাহান প্রথম থেকেই ঢাকা এবং বঙ্গদেশকে সিংহাসন লাভের প্রথম ধাপমাত্র বলে মনে করেছিলেন। তিনি এই শহরে বেশীদিন অবস্থান করলেন না। নগরীর ফটক আবার উন্মুক্ত হলো। সাম্রাজ্য দখলের জন্যে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান শুরু হলো। সঙ্গে রইলো এক বিপুল অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী। শাহ্‌জাহানের প্রিয় অমাত্য আমিরুল উমারার (খান খানান) পুত্র দারাব খাঁর উপর বাংলার শাসনভার ন্যস্ত হলো। কিন্তু শাহ্‌জাহান প্রিয়তম জনকেও বিশ্বাস করতে জানতেন না। দারাব খাঁর পুত্রকে সাথে নিয়ে তিনি চললেন খানিকটা সম্মানিত অতিথি এবং খানিকটা জামিনরূপে। শাহ্‌জাহানের অভিযান এতো ঘটা এবং আড়ম্বরের সাথে শুরু হয় যে, শত্রুর মনে তা শংকার সৃষ্টি করে এবং অনেকে ভয়ে পলায়ন করে। তাঁর আগমন সংবাদে পাটনার সুবেদার পলায়ন করেন এবং নগরীর প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রোহ্‌তাসের শাসনকর্তা সেখানকার দুর্ভেদ্য দুর্গের চাবি শাহ্‌জাহানের হাতে অর্পণ করেন। কিন্তু বাদশাহী ফৌজের হাতে অচিরেই শাহ্‌জাহানকে পরাজয় বরণ করতে হলো। তিনি কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে রোহ্‌তাস দুর্গে আশ্রয় নিতে সমর্থ হন। সেখানেই তাঁর পরিবার-পরিজনবর্গ অবস্থান করছিলো। সেখান থেকে তিনি ঢাকায় দারাব খাঁর কাছে এক জরুরী সংবাদ প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করবার

নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু দারাব খাঁ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বলচেতা ব্যক্তি। শাহ্‌জাহানের কাছে তাঁর পুত্র নজরবন্দী অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তিনি মনিবের বিপদকালে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পশ্চাদপদ হলেন না। তিনি শাহ্‌জাহানের কাছে এই মর্মে এক মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, ঢাকার চারদিকে জমিদারগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছে এবং দারাব খাঁকে তারা ঢাকার বাইরে যেতে দিচ্ছে না। দারাব খাঁর পত্র আসার সাথে সাথে রোহতাস দুর্গে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত দিতে হলো তাঁর পুত্রকে। কিন্তু দারাব খাঁকে শীঘ্রই প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হতে হলো। মনে অনেক আশা নিয়ে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিজয়ী সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন। সাথে সাথেই পেয়ে গেলেন যোগ্য পুরস্কার। তাঁর শিরশ্ছেদ করে মুণ্ডখানা পাঠিয়ে দেওয়া হলো দিল্লীতে—যাতে করে সবাই জানতে পাবে বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম।

বাংলা দেশ থেকে শাহ্‌জাহান পলায়ন করলে তাঁর পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর খান আজাদ খানকে সুবেদার নিয়োগ করেন। তাঁর শাসনকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তাঁর আমলের তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি। তবে একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে; তা হচ্ছে এই যে, তিনি বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব হিসাবে অন্ততঃ বাইশ লক্ষ টাকা দিল্লীতে প্রেরণ করেন। একটি বিদ্রোহী সেনাহিনী কর্তৃক বাংলা দেশ অধিকৃত হওয়ার অব্যবহিত পরেই যে তিনি এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ দিল্লীতে প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রদেশটি কতো সমৃদ্ধিশালী ছিলো। এঁর পর মুকর্‌রম খান সুবেদার হন। তিনি মাত্র ছ'মাস শাসনকার্য চালান। স্বল্পকালের জন্যে হলেও তিনি প্রচুর জাঁক-জমক ও শান-শওকতের সাথে শাসনকার্য চালিয়ে যান। মুকর্‌রম খান নদীবক্ষে যে-সব নয়নাভিরাম দৃশ্য ও সমারোহের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিলো অতুলনীয়। তিনি জলক্রীড়া এবং সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি ভালোবাসতেন। শহরের যে অংশটি নদীর তীরে অবস্থিত ছিলো, সেখানে প্রতি রাতেই

আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হতো এবং নদীতে অসংখ্য নৌকায় জ্বলতো উজ্জ্বল আলো। তাতে এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হতো। কিন্তু হতভাগ্য সুবেদার! যে-নদীকে তিনি এতো ভালবাসতেন, অবশেষে সেটিই একদিন তাঁর মৃত্যু ডেকে আনলো। সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার ছ'মাস যেতে না যেতেই সম্রাট এক ফরমানে তাঁকে নূতন খিলাতে ভূষিত করেছেন এবং ফরমানবাহী দল সম্রাটের কাছ থেকে ঢাকার পথে অনেক পথ এগিয়ে এসেছেন। সম্রাটের ফরমান ও অনুগ্রহ যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করার জন্যে তিনি এক প্রকাণ্ড নৌ-মিছিলের আয়োজন করলেন। নানা বর্ণে সুশোভিত শাহী বজরা-বহর উজান পথে চললো সারাদিন ধরে—প্রতিটি নৌকায় সাদা পাল। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসে। বাদশাহী ফরমান নিয়ে যে-দলটি আসছিলো, পথে তাদের উপস্থিতি বিলম্বিত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মাগরিবের নামাজের সময় হলো। নদীর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো আজান। নামাজের জন্যে সুবেদার বজরা তীরে ভিড়াতে হুকুম করলেন। তিনি নিজের জন্যে যে নৌকাটি বেছে নিয়েছিলেন, সেটি ছিল সরু, লম্বা এবং দ্রুতগামী। এ ধরনের নৌকা সাধারণতঃ দাঁড়ে চলে। কিন্তু এতে পাল খাটানো হয়েছিলো। তখন প্রবল স্রোত। নৌকা তীরে ভিড়ানোর সময় অকস্মাৎ এক ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে ওটি ডুবে গেলো। সুবেদার এবং তাঁর যে-সমস্ত অমাত্য নৌকার প্রকোষ্ঠে ছিলেন, তাঁরা কেউ বেরুতে পারলেন না। এতোগুলো নাবিক এবং বিরাট নৌবহরের সামনেই এমন শোচনীয়ভাবে তাঁদের মৃত্যু হলো।

অতঃপর ফিদা খান এক বছরের জন্যে সুবেদাররূপে বাংলা দেশ শাসন করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে পুত্র শাহ্‌জাহানের সাথে তাঁর মিট্‌মাট হয়েছিলো। পিতার মৃত্যুর পরে শাহ্‌জাহান তাঁর প্রিয়পাত্র কাসেম খাঁকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। কাসেম খাঁ অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। খ্রীস্টানদের ধর্মীয় উপাসনা তাঁর মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিলো বলে মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে শাহ্‌জাহানের সাথে বঙ্গদেশে অবস্থানকালে তাঁর সুন্দরী মহিষী মমতাজমহলের মনেও খ্রীস্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এরূপ

বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। পর্তুগীজদের বড় দুর্দিন এসে গেলো। বঙ্গোপসাগরের কাছে হুগলীতে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কুঠি স্থাপনের পর থেকেই তারা সেখানে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি করতে থাকে। তাদেরই স্বজাতি যে-সব জলদস্যু মগদের সাথে মিত্রতা করে মোগল সুবেদারদের হয়রান করে তুলেছিলো, তাদের সাথে হুগলীর কুঠিয়াল পর্তুগীজদের কোনো মিল ছিলো না। এরা ছিলো উন্নত ধরনের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। হুগলীতে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে বলে আশা করেছিলো। সেখানে তারা রীতিমতো গীর্জা এবং বহু দুর্গ স্থাপন করেছিলো। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি কাসেম খাঁর মনে সন্দেহ ও আশংকার সঞ্চার করে। তিনি সম্রাটের নিকট এই মর্মে এক অভিযোগ পাঠালেন যে, পর্তুগীজগণের ঔদ্ধত্য এতো বেড়ে গিয়েছে যে, যেন তারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এরূপ আচরণ শুরু করেছে। ভাটির দিকে যে-সব নৌকা চলাচল করে, সেগুলোর ওপর তারা শুল্ক ধার্য করছে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর তাদের বর্বর আইন-কানুন প্রয়োগ করছে। সম্রাটের প্রজাদের ওপর তারা নানাবিধ অত্যাচার করছে। যা হোক, তারা নিজেদের এলাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্য এমনভাবে জাঁকিয়ে তুলেছিলো যে, সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। তাদের কুকীর্তি এবং ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপের কথাও লোকে বলাবলি শুরু করে। তারা নাকি মুসলিম শিশুদের চুরি করে গোয়ায় চালান দিতো এবং সেখানে তাদের খ্রীস্টান করতো। সুদৃশ্য গীর্জার মধ্যে এনে তাদের ক্যাথলিকপন্থীদের আধ্যাত্মিকরূপক বিশিষ্ট ধর্মীয় বাণী এমনভাবে শোনানো হতো যে, তারা ভয়ে-বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতো। গীর্জার অভ্যন্তরভাগ যে-সব মূর্তি দিয়ে সজ্জিত করা হতো, তা মমতাজমহল ও কাসেম খাঁর মতো গোঁড়া মুসলমানদের কাছে মূর্তি-পূজারই নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে হয়।

বাদশাহী দরবারে তাদের কুকীর্তির সংবাদ পৌঁছুলে শাহ্‌জাহানের কাছ থেকে পর্তুগীজদের কোনো প্রকার সহানুভূতি লাভ করার আর কোনো কারণ রইলো না। কয়েক বছর আগে সম্রাট শাহ্‌জাহান যখন চরম

ভাগ্যবিপর্যয়েব সম্মুখীন হযেছিলেন, তখন তিনি হুগলীস্থ পর্তুগীজ গভর্নব মাইকেল বডবিগেব কাছে সাহায্য চেযেছিলেন। সাহায্য তো দূবেব কথা পর্তুগীজ গভর্নব চবম অভব্যত ব সাথে তঁব আবেদনেব জওযাব দিযেছিলেন। সেদিনেব কথা শাহ্জাহান মনে বেখেছিলেন। তা ছাড়া সম্রাজ্ঞী মমতাজমহল এইসব পৌত্তলিকেব নিশ্চিহ্ন কবে ফেলাব জন্যে সম্রাটকে পুনঃ পুনঃ অনুবোধ কবতে থাকেন। কাজেই সম্রাট শাহ্জাহান বাংলা থেকে পর্তুগীজদেব বিতাড়িত কবাব হুকুম দিলেন।

তাঁব নির্দেশ অনুযাযী ১৬৩১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে এক বিরাট বাহিনী বওযানা হলো। কাসেম খাঁ পূর্ণ দক্ষতাব সাথে এই অভিযানেব পবিকল্পনা তৈবী কবেছিলেন। মোগল-বাহিনী চাবদিক দিযে পর্তুগীজদেব নগবী ঘিবে ফেলে। সাডে তিন মাস ধবে অবরুদ্ধ বইলো হুগলী নগবী। পর্তুগীজগণ দিনের পব দিন ধবে আক্রমণ প্রতিরোধ কবে চললো। তারা ভেবেছিলো, গোযা থেকে তাবা সাহায্য পাবে। কিন্তু কোনো সাহায্যই এলো না। অবশেষে অববোধকাবিগণ দুর্গেব বৃহত্তম ফটকটি ভেঙে ফেললো। আব পর্তুগীজদেব সকল শক্তি ধূলিসাৎ হযে গেলো। এতে এক হাজাব পর্তুগীজ নিহত এবং চার হাজাব বন্দী হয। তাদেব অনেকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় আগ্রায প্রেবিত হয়। পর্তুগীজগণ এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিলো যে, তাদেব চৌষট্টিটি বড় বড় জাহাজ, সাতান্নটি খুব দ্রুতগামী এবং দু'শতটি ক্ষুদ্র পোতেব মধ্যে মাত্র তিনটি ক্ষুদ্র পোত কোনো রকমে পলাযন করতে সমর্থ হয়েছিলো। গীর্জা ও অন্যান্য ধর্মীয প্রতীকসমূহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হলো। কাসেম দ্রুততাব সাথে সেখানে দুর্গ এবং নগবীব পুনর্গঠন কবে বাংলার শাহী দুর্গ স্থাপন কবলেন। এই বিরাট সাফল্যেব পর তিনি অল্প দিন মাত্র জীবিত ছিলেন। ঐ বছরই তিনি ঢাকায় পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে এরূপ একটা জনশ্রুতি গড়ে ওঠে যে, হুগলীর পর্তুগীজ গীর্জার বেদীতে যে পুরোহিতকে হত্যা করা হয়েছিলো, তিনি কাসেম খাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন।

মাত্র দু'বছর পরই ঘটনার মোড় অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হলো। আজিম খান তখন বাংলার শাসনকর্তা। এই সময় ইংরেজগণ বাংলায় ব্যবসায় করার প্রথম অনুমতি লাভ করে। ১৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্রাট শাহ্‌জাহান এক ফরমানে তাদের ব্যবসায়ের অনুমতি দান করেন। কিন্তু বিদেশী বণিকদের গঙ্গার উজানে আসতে দেওয়ার এবং এই নদীর কূলবর্তী এলাকায় তাদের বসতি স্থাপন করতে দেওয়ার বিপদ মোগল শাসনকর্তাগণ ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন পর্তুগীজদের ক্ষেত্রে। তাই বালাসারের পিপ্‌লি বন্দর পর্যন্ত উজানে ইংরেজ-জাহাজের চলাচল সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। এখানেই তারা বাংলায় তাদেব প্রথম কুঠি স্থাপন করে। ইংরেজগণ যে প্রথম ফরমান লাভ করেছিলো, সম্ভবতঃ তার মূলে ছিল আজিম খানের অবহেলা এবং স্বভাবসুলভ উদাসীনতা। আজিম খান ঢাকায় আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন। সামরিক যশ বা শাসন-খ্যাতির প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিলো না। তাঁর আমলে শাসন-ব্যবস্থা এমন শিথিল হয়ে পড়ে যে, সুবেদারেব দুর্বলতার কথা অবগত হওয়ামাত্র মগ এবং আসামীরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা নদীপথে পুনরায় আরম্ভ করে দিলো তাদের পুরানো দস্যুবৃত্তি আর ধ্বংসলীলা।

আজিম খানকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু যেহেতু তাঁর কন্যার সাথে শাহ্‌জাদা শুজার বিয়ে হয়েছিলো, সেহেতু তাঁর দুর্বলতাকে ক্ষমা করা হলো এবং তাঁকে এলাহাবাদের শাসনকর্তা করে পাঠানো হলো।

পরবর্তী শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ কিন্তু ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতের মানুষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রবীণ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং যোদ্ধা। সাম্রাজ্যের এই পূর্বান্ত প্রদেশে তখন যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছিলো, সেগুলোর মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা তাঁর ছিলো। তিনি ঢাকায় আসতে না আসতেই মগদের এক নৌবহর এসে হাজির হলো— যুদ্ধ করতে নয়, শান্তি প্রার্থনা করতে। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মকট রায়ের সাথে আরাকান-রাজের বিবাদ শুরু হলে মকট রায় মোগল সুবেদারের আশ্রয় লাভের জন্যে

এখানে আগমন করেন। ইসলাম খাঁ তাঁর প্রাসাদে তাঁকে সাক্ষাৎদান করলেন এবং সাম্রাজ্যের একজন সামন্তরূপে তাঁকে স্বীকৃতিদান করলেন। সুবেদারের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে তাঁর নাম অনুসারে ইসলামাবাদ নাম রাখা হলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলাম খাঁকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিলো বলে তিনি এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করতে সমর্থ হননি। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁকে সুবেদার পদে প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে মোগল সার্বভৌমত্ব নামেমাত্র বিদ্যমান ছিলো।

একই বছর আর একটি নৌবহর ঢাকার অতি সন্নিকটে এসে পড়ে। কিন্তু এটি রীতিমতো রণ-পোতবহর। আসামীরা মোগল দরবারের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার জন্যে সব সময় ওঁৎ পেতে থাকতো। পূর্ববর্তী শাসনকর্তার নিষ্ক্রিয়তায় উৎসাহিত হয়ে তারা বাংলা দেশ লুণ্ঠন এবং বিরান করে ফেলার এবং এর রাজধানী দখল করার মতলবে পাঁচশ' নৌকার এক বিরাট বহর সজ্জিত করলো। ব্রহ্মপুত্রের উভয় পার্শ্বের লোকালয়গুলো লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত করতে করতে তারা ঢাকার পথে অগ্রসর হতে থাকে। লোকে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলো। কেউ কেউ জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিন্তু ইসলাম খাঁ ত্বরিৎগতিতে তাদের মোকাবেলার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। নদীতীরে কামান স্থাপন করে তিনি আসামীদের বিধ্বস্ত করে ফেললেন। কামান দাগানোর ফলে অধিকাংশ রণপোতে আগুন ধরে গেলো এবং আসামীরা সেগুলো কূলে ভিড়াতে বাধ্য হলো। মোগল অশ্বারোহী-বাহিনী হামলাকারীদের তৃণখণ্ডের মতো কেটে ফেললো। মোগলদের সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সাথে বন্য অসভ্য আসামীদলের পেরে ওঠার কথা ছিলো না। ইসলাম খাঁ পলায়নপর রণপোতগুলোর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে সমগ্র কুচবিহার রাজ্য এবং সীমান্তের বহু দুর্গ অধিকার করে নিলেন; কিন্তু তিনি রসদের অভাব ও পরিবহন সংক্রান্ত অসুবিধার জন্যে পূর্ববর্তী সকল অভিযানকারীর মতো বর্ষারম্ভের পূর্বেই ঢাকায় ফিরে আসতে

বাধ্য হলেন। ঢাকায় পৌঁছামাত্র তিনি উজীর-পদে নিযুক্তির এক পরোয়ানা লাভ করলেন। তাঁর স্থলে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র হতভাগ্য সুলতান শুজা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলেন।

কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শুজা ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সেখানে তিনি এক সুরম্য প্রাসাদ তোলেন এবং পরম বিলাসিতার সাথে কালাতিপাত করতে থাকেন।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, যে ঢাকা তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলো, কয়েক বছর পর সেখানেই তাঁকে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছিলো। সম্রাট শাহ্জাহান বার্ধক্য-দশায় উপনীত হলে আর একবার সিংহাসন দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হলো। সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হয়। শাহ্জাহান এক সময়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর শেষ জীবনে তাঁর পুত্রগণও যে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এটা ভাগ্যেরই পরিহাসমাত্র। বাংলা দেশ নিজের অধিকারে থাকায় সুলতান শুজা তাঁর শক্তি সম্পর্কে অনেক আশাবাদী হয়েছিলেন। এই সংগ্রামে তিনিই প্রথমে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আওরঙ্গজেব আগেই দিল্লী অধিকার করে ফেললেন। পিতাকে নজরবন্দী করে আওরঙ্গজেব নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। তারপর এক বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে শুজার মোকাবেলায় বহির্গত হলেন। শাহ্ শুজা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। রণকুশলতায় বা সৈনাপত্যে শাহ্ শুজা অপেক্ষা আওরঙ্গজেবের স্থান অনেক উচ্চে ছিলো। পরাজিত হয়ে শুজা টোণ্ডা দুর্গে আশ্রয় নিলেন। সেখানেও পরাভূত হয়ে তিনি পরিবার-পরিজনসহ দ্রুতগামী নৌকায় করে যাত্রা করলেন ঢাকা নগরীতে—যে নগরীকে একদিন তিনি অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করেছিলেন। অতি দীনাবস্থায় তিনি ঢাকায় প্রবেশ করলেন। কোনো সুবেদার এমন হীনাবস্থায় এই রাজধানীতে প্রবেশ করেননি। কেউ এলো না তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে। একজন শাহ্জাদার প্রাপ্য সম্মানও দিতে এলো না কেউ। শাহ্ শুজা এবং

তাঁর মুষ্টিমেয় সহচরগণ যখন দেশী নৌকা থেকে নদীর ঘাটে অবতরণ করলেন, সাথে সাথে একটা ভিড় জমে গেলো—নির্বাক সে জনতা, বিস্ফারিত তাদের দৃষ্টি। শাহ্ শুজা এবং তাঁর সহচরদের মুখে পরাজয়ের সুস্পষ্ট ছাপ।

সুলতান শুজার বিপদের দিনে যেসব বিশ্বস্ত অনুচর তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আওরঙ্গজেব-তনয় মোহাম্মদ। টোণ্ডা দুর্গে যখন আওরঙ্গজেবের সাথে শুজার যুদ্ধ চলছে, সেই চরম বিপর্যয়ের দিনে শুজার কন্যার সাথে মোহাম্মদের বিয়ে হয়। ভ্রাতৃ-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে শাহ্ শুজার কন্যা মোহাম্মদের সাথে বিয়ের জন্যে বাগদত্তা হয়েছিলেন। তাঁর রূপ নাকি পিতামহী মমতাজমহলের অসামান্য সৌন্দর্যকেও ম্লান ক'রে দিয়েছিলো। বাগদানের অব্যবহিত পরেই ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ায় বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হতে পারেনি। মোহাম্মদকে পিতার আদেশে শুজার বিরুদ্ধে প্রেরিত মীরজুমলা-বাহিনীর সাথে যুদ্ধে গমন করতে হয়েছিলো। টোণ্ডায় উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী স্ব স্ব শিবিরে বর্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। বর্ষার পরেই আবার যুদ্ধ শুরু হবে। পিতার দুর্দশার কথা স্মরণ করে শুজা-কন্যার মন ব্যথায় অধীর হয়ে ওঠে। তিনি নিজের হাতে মোহাম্মদের কাছে মর্মস্পর্শী ভাষায় এক পত্র লিখলেন। একদিন তাঁর স্বামী হওয়ার কথা যাঁর, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ তিনি তাঁর পিতার চরম শত্রু। তাঁর মর্মস্পর্শী বিলাপ মোহাম্মদকে বিচলিত করে তোলে। বাগদত্তার সাহায্যার্থে যে-কোন আত্মত্যাগে তিনি প্রস্তুত হলেন—আওরঙ্গজেবের জ্যৈষ্ঠ্যপুত্রের ভাবী সম্ভাবনার পথ যদি তাতে চিরকালের জন্যে রুদ্ধ হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও। উভয় পক্ষের শিবিরের মাঝখানে বিরাট নদী। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তিনি নদী পার হলেন। ভেবেছিলেন প্রভাত হওয়ার সাথে তাঁর সেনাবাহিনীর একটা বিরাট অংশ তাঁর অনুসরণ করবে। মোহাম্মদের আগমন-বার্তা শুজা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তিনি নদীর তীরে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন।

তাঁর দলে মোহাম্মদের যোগদানের ফলে যতোদূর সুবিধা হবে বলে শুজা ভেবেছিলেন, তা হলো না। মীর জুমলার সতর্কতা এবং ত্বরিৎ ব্যবস্থার ফলে মোহাম্মদের সেনাবাহিনী শত্রুশিবিরে যোগদান করতে পারলো না। এতদ্‌সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব-তনয়ের যোগদানের ফলে শুজা-বাহিনীতে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার হলো। টোণ্ডায় উৎসব লেগে গেলো এবং একটা অবরুদ্ধ নগরীর পক্ষে যতোখানি সম্ভব, ততোখানি শান-শওকতের সাথে মোহাম্মদের বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হলো।

শাহ্ শুজার পরাজয়ের পর নবদম্পতি ঢাকায় তাঁর সাথে পালিয়ে এলেন। পুত্রের আচরণে আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। শুজার এই শক্তিশালী অনুচরকে তাঁর শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি পুত্রের উদ্দেশে একটি পত্র লিখে এক বিশ্বস্ত সংবাদবাহকের মারফত পাঠিয়ে দিলেন। তাকে সাবধান করে দেওয়া হলো যেনো সে শুজার গুপ্তচরদের হাতে পড়ে। তাকে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনা-চক্রে সে গুপ্তচরদের হাতে পড়েছে। সে প্রথমে কিছুতেই পত্রটি হাতছাড়া করতে চাইবে না এবং তার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত সে বাধা দিতে থাকবে। আওরঙ্গজেব যে পত্রটি পাঠিয়েছিলেন, তার অনুবাদ নিম্নরূপ:

'প্রিয় পুত্র মোহাম্মদ—যার সুখ এবং নিরাপত্তা আমাদের জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তারই উদ্দেশে। শুজার সাথে লড়াই করার জন্যে যখন তার শৌর্যবীর্য প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন বেদনা-ভারাক্রান্ত চিত্তে আমরা আমাদের পুত্রকে বিদায় দান করি। আমাদের প্রথম সন্তানের প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসাই আমাদের এরূপ আশায় অনুপ্রাণিত করে তোলে যে, সে শীগ্‌গীরই ফিরে এসে আমাদের আনন্দিত করে তুলবে, এক মাসের মধ্যেই শত্রুকে বন্দী করে নিয়ে আমাদের কাছে হাজির করবে এবং আমাদের উদ্বেগ ও ভয় দূর করবে। কিন্তু সাত মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো, তথাপি আওরঙ্গজেবের ইচ্ছা পূর্ণ হলো না।

মোহাম্মদ, তুমি তোমার কর্তব্য পালন তো করই নি, বরং পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছো এবং নিজের সুনামকে কলঙ্কলিপ্ত করেছো। নারীর বঙ্কিম হাসির কাছে মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্য হার মেনেছে। তার রূপের প্রাখর্যে তোমার চোখ ঝলসে গিয়েছে—নিজের সম্মান ও মর্যাদার কথাও ভুলে গিয়েছো তুমি। একদিন যার সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহ্ হওয়ার কথা, সে নিজে আজ গোলাম বনে গেছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের এরূপ প্রতীতি জন্মেছে যে, মোহাম্মদ তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে অনুতপ্ত, সেহেতু আমরা তার অপরাধ ক্ষমা করলাম। সে খোদার নামে শপথ করে বলেছে যে, সে কোনো কপট আচরণ করেনি; তার প্রতি আমাদের অপত্য স্নেহ ফিরে এসেছে। তাকে আমরা মাফ করেছি বটে, কিন্তু আমাদের অনুগ্রহ লাভের তার একমাত্র পথ হচ্ছে তার প্রস্তাবিত কার্যের রূপায়ণ।'

আওরঙ্গজেবের অভিসন্ধি অনুযায়ী এই পত্রটি শুজার হস্তগত হলো; ফলে ঐ জামাতার প্রতি শুজার মনে গভীর অবিশ্বাসের সঞ্চার হলো। শুজা মোহাম্মদকে গোপনে ডেকে পত্রখানা দেখালেন। মোহাম্মদ তাঁর নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু শত প্রতিবাদ ও ব্যাকুল মিনতি সত্ত্বেও শুজার সন্দেহ দূর হলো না। প্রথম দিকে শুজা মোহাম্মদের শৌর্যপূর্ণ আচরণে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে পত্রবৎ স্নেহ করতে থাকেন। কিন্তু মোহাম্মদ বিশ্বাসহন্তার কার্য করতে পারেন, এ আশঙ্কা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিলো। অবশেষে নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর প্রাসাদে তিনি দরবার আহ্বান করে সেখানে মোহাম্মদকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের মধ্যে আগের মতো ভালোবাসা এবং বিশ্বাস আর বিদ্যমান থাকা অসম্ভব। সেই হানাহানির যুগে শুজা যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অপূর্ব। তিনি মোহাম্মদকে তাঁর সহধর্মিণীসহ বিদায় নিতে আদেশ দিলেন এবং তাঁর কাছে যে-সম্পত্তি হীরা-জহরত ছিলো, সবই তাঁদের উপহার দিলেন। তিনি বললেন, 'শুজার সম্পদ-ভাণ্ডার

তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিলাম। সেখান থেকে তোমাদের যতো খুশি, যা খুশি নিয়ে যাও। আমার দৃষ্টি থেকে দূরে চলে যাও, যাতে করে যাকে এতোদিন পুত্রবৎ জ্ঞান করেছি তাকে শত্রু বলে মনে করতে বাধ্য না হই।' সেই দুঃখ আর অবিশ্বাসের মধ্যেও তিনি মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

মোহাম্মদ আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। মক্কা শরীফের নামে শপথ করে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চাইলেও শুজা সঙ্কল্পে অটল। মোহাম্মদকে তাঁর সহধর্মিণীসহ সুবেদারের নিজস্ব বজরায় বিদায় করে দেওয়া হলো। শুজা নিজে ঘাটে এসে তাঁদের বিদায় দিলেন। এই বিদায়-অভ্যর্থনায় মোহাম্মদকে সর্ব প্রকার সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিলো। মোহাম্মদ শুজার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত— শুজার মনে এরূপ সন্দেহ বদ্ধমূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁকে রাজোচিত মর্যাদার সাথে বিদায় করে দিলেন। সে-যুগে এ-ধরনের মহত্ত্ব ও ঔদার্যের দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। এই মহত্ত্ব ও ঔদার্যের জন্যেই তিনি এমন কতকগুলো বন্ধু ও অনুচর লাভ করে-ছিলেন, যাঁরা এই হতভাগ্য শাহ্‌জাদাকে কখনও পরিত্যাগ করেননি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে গেছেন।

মীর জুমলা পশ্চিম বঙ্গে আওরঙ্গজেবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই শুজার পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন। মীর জুমলার বিপুল বাহিনীর আগমন সংবাদে শুজা বুঝতে পারলেন যে, এর মোকাবেলা করা তাঁর সাধ্যের অতীত। তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরকালে অধিকাংশ সৈন্য এবং নৌ-বাহিনীর বৃহত্তর অংশটিও সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে এই নগরীর অবরোধ প্রতিরোধের শক্তি ছিলো না। পরিবারের সকলকে নিয়ে অবশিষ্ট ধন-দৌলতসহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগরীর পূর্ব তোরণ দিয়ে তিনি ঢাকা ত্যাগ করলেন পলাতক বেশে; কয়েক মাস আগে তিনি পলাতক বেশেই এই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। সাথে চললো একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সেনাদল। নদী পার হয়ে তিনি

ত্রিপুরার গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলেন—দ্রুত এগিয়ে চললেন এক চরম মর্মান্তিক পরিণামের পথে। অশেষ দুঃখ-ক্লেশ আর দুঃসাহসিক অভিযাত্রার পর আরাকানীদের হাতে হতভাগ্য সুলতানের শোকাবহ জীবন-নাট্যে শেষ যবনিকা নেমে এলো।

সুলতান শুজার সুবেদারি লাভের ছ' বছর আগে থেকে ইংরেজ কোম্পানী উড়িষ্যায় অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণপণ সংগ্রামে রত ছিলো। শুজা তাদের কোনো প্রকার বাধা দেননি। ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের একটি ক্ষুদ্র দল হরিহরপুর ও বালাশোরে কুঠি স্থাপন করে। আঠারো বছর পরে সুবেদারের অনুগ্রহে তারা হুগলীতে বসবাসের এবং পাটনা, কাসিম-বাজার ও রাজমহলে আড়ৎ খোলার অনুমতি লাভ করে। ইংরেজদের প্রতি সুলতান শুজা কেন অসাধারণ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন, তা নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সুলতান শুজার ভগ্নী এবং সম্রাট শাহ্‌জাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের জ্যেষ্ঠা এবং অত্যন্ত প্রিয় কন্যা জাহান আরা অবগুণ্ঠিতাবস্থায় প্রাসাদের দরদালান অতিক্রম করছিলেন। সেখানে অবস্থিত প্রদীপ থেকে হঠাৎ তাঁর অতি সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্রে আগুন ধরে যায়। কিন্তু পাছে তাঁর কণ্ঠস্বর অন্য লোকে শুনে ফেলে এবং বাদশাহী হেরেমের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে তিনি কাউকে ডাকতে পারলেন না। তিনি নিজের প্রকোষ্ঠে দৌড়ে গেলেন। হাওয়া লেগে আগুন আরও প্রবলভাবে জ্বলে উঠলো এবং তাঁর শরীর এমন সাংঘাতিকভাবে পুড়ে গেলো যে, তাঁর জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। তাঁর অতি আদরের কন্যার এই দুরদৃষ্টে সম্রাট অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সুরাটস্থ ইংরেজ কোম্পানীকে এক জরুরী পত্রে তাঁর কন্যার জন্যে একজন চিকিৎসক পাঠাতে বললেন। কোম্পানী গ্যাব্রিয়েল ব্রাউটন নামে এক জাহাজী চিকিৎসককে প্রেরণ করলো। সৌভাগ্যবশতঃ এই চিকিৎসকের দ্বারা জাহান আরা আরোগ্য লাভ করেন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই শাহী দরবারে ব্রাউটন বিশেষ অনুগ্রহ ও সুবিধা লাভ করতে লাগলেন। এই অনুগ্রহের ভাগ থেকে

তাঁর স্বদেশী ভাইয়েরাও বঞ্চিত হলো না। মিঃ ব্রাউটন সুলতান শুজার সাথে কিছুদিন রাজমহলেও অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ কিছুটা তাঁরই প্রভাবে ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী প্রথম 'নিশান' প্রাপ্ত হয়েছিলো। মূল সনদটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে স্ট্রেনশাম মাস্টারের ডাইরিতে এর একটি নকল সংরক্ষিত আছে। পরবর্তী কালে ইনি কোম্পানীর বিভিন্ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত সনদে 'মহান সম্রাট যাঁর হুকুমের খেলাফ করার সাহস কোনো মানুষের নেই' নির্দেশ দিলেন, ইংরেজ কোম্পানী স্থল বা জলপথে কোনো পণ্য আমদানী বা রফতানী করলে অতঃপর শুল্কের জন্যে তাদের কোনো হয়রানি করা চলবে না।' 'মহান সম্রাটের— যাঁর হুকুমের খেলাফ করার সাহস কোন মানুষের নেই'— আদেশ 'কিরূপ বিশেষ যত্নের সাথে' প্রতিপালিত হয়েছিলো, পরবর্তী ঘটনাবলীতে তার পরিচয় মিলবে।

মীর জুমলা শুজাকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করার পর এখানকার সুবেদার নিযুক্ত হলেন। তিনি ছিলেন ইরানের অধিবাসী। তাঁর স্বদেশবাসী আরো বহু ব্যক্তির মতো ভাগ্যান্বেষণের জন্যে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন। সম্রাট শাহ্জাহানের চার পুত্রের যে-কোনো জন অপেক্ষা আওরঙ্গজেব যে অনেক বেশী দক্ষতা ও যোগ্যতার অধিকারী, তা বুঝতে পেরে তিনি প্রথম থেকেই তাঁর সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করেন। আওরঙ্গজেবের প্রভাবেই তিনি উজির নিযুক্ত হন এবং ছয় হাজার অশ্বারোহী সেনার মনসবদারি প্রাপ্ত হন। তাঁর যুদ্ধ-নৈপুণ্য এবং সাফল্য দ্রুত স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। ফলে পরে তিনি বাদশাহী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন এবং আমীর-উল-উমারা খেতাবে ভূষিত হন। শুজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য এবং আওরঙ্গজেবের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি বাংলায় সুবেদারি পদ লাভ করলেন। ঢাকায় অবস্থানকালেই তিনি সুবেদারি লাভের সংবাদ পান। সাথে সাথেই তিনি ঢাকায় পুনরায় প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করে এর পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়ে

আনার সংকল্প করলেন। স্বল্পকালের জন্যে হলেও এর পর থেকে দ্বিতীয়বারের জন্যে ঢাকার চূড়ান্ত সমৃদ্ধির সূচনা হলো।

মীব জুমলার সংক্ষিপ্ত তিন বছরের শাসনকালের অধিকাংশ সময় কুচবিহাব এবং আসামের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয়িত হয়। সৈনিক জীবনের প্রতি তাঁব ছিলো স্বাভাবিক আসক্তি। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনাপত্য করতেই তিনি আনন্দবোধ করতেন। সামরিক যশ ও কীর্তির আকাঙক্ষা তাঁব জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। কুচবিহার বাজ্য বহুবাব বিজিত হলেও এবং এটিকে করদানে বাধ্য করা হলেও এই রাজ্যটি নামেমাত্র মোগল সাম্রাজের অঙ্গীভূত ছিলো। বাংলায় শুজার সেনাবাহিনীব সাথে আওরঙ্গজেব-বাহিনীর যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সুযোগ নিয়ে রাজা ভীমনারাযণ মোগল সাম্রাজ্যের কামরূপ জেলা অধিকার করে নিলেন। সুতরাং আর একটি যুদ্ধযাত্রার অজুহাত সাথে সাথেই মিলে গেলো। এই অভিযানেব জন্যে তাঁর পতাকাতলে হাজারে হাজারে লোক এসে মিলিত হলো। এবং এভাবে গড়ে উঠলো এক বিরাট সেনাবাহিনী। এখানে এতো বড়ো বাহিনী কোনোদিন গঠিত হয়নি। ঢাকার উত্তরদিকের ফটকের বাইরে মাইলের পর মাইল ধরে সৈন্যদের ছাউনি পড়লো এবং নদীতেও গড়ে উঠলো এক বিবাট নৌবহর। রসদ ও সমরোপকরণ নৌকাগুলোতে বোঝাই করে নদীর ডান তীর দিয়ে তিনি এই বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করলেন। এ পথে কোনো তৈরি রাস্তা ছিলো না। ফলে প্রায়শঃই তীরবর্তী গহন অরণ্য কেটে সাফ করার প্রয়োজন হয়েছিলো। তিন মাসের দীর্ঘপথ— সে-পথের বিপত্তির অন্ত ছিলো না। মীর জুমলা স্বয়ং সৈন্যদের সাথে হাতে কুঠার নিয়ে জঙ্গল কেটে সাফ করতে থাকেন। বিজয়গর্বী মোগল অশ্বারোহী সেনাবাহিনী সেনাপতির এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে অগ্রসর হতে লাগলো। অগ্র-বাহিনীর তিন শত হস্তীর সাহায্যে অবশেষে এই দীর্ঘ পথ নির্মাণের কার্য সমাপ্ত হয়। রাজা ভীমনারায়ণ কল্পনাও করতে পারেননি যে,

দুর্ভেদ্য অরণ্যবেষ্টিত এরূপ নিরাপদ অঞ্চলে কোনোদিন শত্রুসেনারা হানা দিতে পারবে। মোগল সেনাদের আগমন সংবাদে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। রাজা ভীমনারায়ণ রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করলেন। মীর জুমলা বিজয়ীর বেশে কুচবিহারে প্রবেশ করলেন এবং সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এর নাম রাখলেন আলমগীরনগর। তাঁর পদার্পণের পর এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। মীর জুমলা ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। মোগল সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে অবস্থিত এই বিজিত রাজ্যটিতে তখনও হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতাপ। শহরের মধ্যভাগে সর্বপ্রধান মন্দিরে নারায়ণের বিগ্রহ স্থাপিত ছিলো। এটি ছিল রাজা এবং তাঁর প্রজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মন্দিরের কাছে এসে বিজয়দৃপ্ত মীর জুমলা অপেক্ষা করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে গোটা সেনাবাহিনী তাঁর সম্মুখে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র জনতা রুদ্ধশ্বাস। মীর জুমলা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বিগ্রহটি বের করে এনে সকলের সামনে ওটিকে ভেঙে ফেললেন। তখন নমাজের সময়। মন্দিরের ছাদে আরোহণ করে তিনি নিজেই আজান দিলেন। সমগ্র মুসলিম ইতিহাসে কুচবিহার রাজ্যের প্রধান মন্দির থেকে এই প্রথম নমাজের আহ্বান ধ্বনিত হলো।

বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনীর মনে ইসলামের এই জয়যাত্রা অভূতপূর্ব প্রেরণার সৃষ্টি করে। এই অভিযানে তাদের অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও আর একটি দেশে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করার জন্যে তারা মীর জুমলার সাথে আসাম অভিযানে অংশ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। হিন্দুধর্মের দমন ছাড়া মীর জুমলা কুচবিহারের বিজিত অধিবাসীদের উপর কোনোরূপ নির্যাতন চালাতে দেননি। বিজিত দেশটিতে সুশাসনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। দেশটি রক্ষার জন্যে চৌদ্দশত অশ্বারোহী এবং সাত হাজার বন্দুকধারী সৈন্যের একটি বাহিনী সেখানে রেখে দিলেন। কুচবিহারের রাজস্ব ধার্য করা হলো দশ লাখ টাকা।

পূর্ববর্তী অপরাপর মুসলমান সুবেদারদের ক্ষেত্রে আসাম অভিযান যেরূপ বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো, মীর জুমলার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হলো না। এটি ছিলো ভয়াল অরণ্যাচ্ছাদিত বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল দেশ। পথঘাটের কোনো বালাই ছিলো না। বহু দূর-ব্যবধানে ছড়ানো ছিলো লোকালয়গুলি। হামলাকারীদের প্রতিরোধ করার মতো জনবল ছিলো না সেখানে। অথচ প্রতি পদেই সেনাবাহিনীর জন্যে অপেক্ষা করতো অজ্ঞাত বিপদ। সমধিক যশের একান্ত উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত যে-কোনো সেনানায়কই এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হতে চাইতেন না। মীর জুমলা সাধারণ সৈন্যের মতো কাজ করে যেতে থাকেন। এরূপ সেনানায়ককে সৈন্যদল অনুসরণ না করে পারে না। পথের বাধা এতো দুরতিক্রমণীয় ছিলো যে, কোনো কোনো দিন এমনও হতো যে, সারাদিন পরিশ্রম করে তারা এক মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করতে পারেনি। সমরাস্ত্র এবং রসদ সরবরাহে যাতে বিঘ্ন না হয়, সেজন্যে তাঁকে নদীর তীর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কারণ এসব ছিলো নৌবহরের নৌকাগুলির মধ্যে। যা হোক, তীর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার ফলে প্রায়শঃই ঘন জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা অপরিহার্য হয়ে পড়তো। পথিমধ্যে এক দুর্গে রাজা পূর্ণশক্তি সংগ্রহ করে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মীর জুমলার কামানের মুখে দুর্গ ভূমিসাৎ হয়ে গেলো। তিনি বিজয়দৃপ্ত পদে দুর্গে প্রবেশ করলেন এবং এই স্থানের নামকরণ করলেন 'আতাউল্লাহ' বা আল্লার দান। কিন্তু শীগ্‌গীরই গ্রীষ্মের অবসান হলো। বর্ষা নেমে এলো। মীর জুমলা এক বিরাট শিবির স্থাপন করে বর্ষার অবসান না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে বাধ্য হলেন। সাত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো সে-শিবির। বিজয়-সাফল্যে বিভ্রান্ত হয়ে মীর জুমলা এখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত পত্র সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। পত্রে তিনি গর্বভরে লিখলেন যে, তিনি চীন অভিযানের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অভিযানে মোগল পতাকা সম্রাটের তাতারী আত্মীয়-দের পতাকার সাথে মিলিত হবে, এ-সম্ভাবনা তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে

পাচ্ছেন। চেঙ্গিস খাঁর বংশধর সম্রাটের এই সব আত্মীয়-স্বজন দূরতম প্রাচ্যে বহুদিন পূর্বেই রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য এরূপে যুক্ত হয়ে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কিন্তু মীর জুমলার বিজয়ের আয়ুষ্কাল নিঃশেষ হয়ে এসেছিলো। এই দেশে বর্ষা-কালীন নদীর ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিলো না। তদুপরি সে বছর নদীতে অভূতপূর্ব প্রলয়ঙ্করী প্লাবনের সৃষ্টি হয়েছিলো। সমগ্র দেশ, পথ, প্রান্তর প্লাবনে নিমজ্জিত হয়ে গেলো। মানুষ এবং পশুর খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। রাজা এবার নববলে বলীয়ান হয়ে চারদিক থেকে মোগল-বাহিনীকে আক্রমণ এবং হয়রান করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে সৈন্য-দলের মধ্যে এক নিদারুণ রোগ-মহামারী আরম্ভ হলো এবং তাদের এক-দশমাংশ আক্রান্ত হযে পড়লো। মীর জুমলা স্বয়ং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সুতরাং বর্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে শুরু হলো অনিবার্য পশ্চাদপসরণ। পূর্বাঞ্চলে যে আশার দীপ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিলো, তা অকস্মাৎ নিভে গেলো। আর সেনাবাহিনী শত্রুদের দ্বারা পরাজিত না হলেও পরাভব স্বীকার করে অস্তায়মান সূর্যের দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হলো। গৌহাটি থেকে আর একটি নূতন দুঃসংবাদ এলো। মীর জুমলার আগমন সংবাদে কুচবিহার-রাজ ভুটানে পলায়ন করেছিলেন। তিনি ফিরে এলে সমগ্র দেশ তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালো এবং তারা মোগল সেনাদলকে বিতাড়িত করে দিলো। ব্যর্থকাম, ভগ্নস্বপ্ন এবং রোগজর্জর মীর জুমলা দ্রুত ঢাকার পথে ধাবিত হলেন। তিন বছর আগে যে-আশার আলোক তাঁর চোখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো, নিঃশেষে তা মিলিয়ে গেলো। কিন্তু রাজধানীতে ফিরে আসা তাঁর অদৃষ্টে ছিলো না। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে ২রা রমজান তিনি খিজিরপুরে পরলোকগমন করেন। চরম দুর্দিনেও যে-সেনাবাহিনী তাদের নায়ককে কখনো পরিত্যাগ করেনি এবং যাঁর প্রতি তাদের আনুগত্যের এতটুকুও ব্যত্যয় ঘটেনি, তাঁর পরলোকগমনে তারা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

মোগল দরবারে মীর জুমলাকে এতোবড়ো শক্তিশালী সুবেদার বলে মনে করা হতো যে, লোকে বলতো যে, যেদিন মীর জুমলার মৃত্যু হয়েছিলো, মাত্র সেদিন থেকেই আওরঙ্গজেব বাংলার রাজা হতে পেরেছিলেন। সম্রাট নাকি মীর জুমলার বিজয়-সাফল্য এবং ক্রমবর্ধমান শক্তিকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন। মীর জুমলার মৃত্যুর সংবাদ যখন তাঁর পুত্র সম্রাটকে জানাতে আসেন, তখন আওরঙ্গজেব তাঁকে বলেন, 'তুমি হারিয়েছো তোমার পিতাকে; আর আমি হারালাম আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক বন্ধুকে।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

শায়েস্তা খাঁ

ঢাকাব সাথে শাযেস্তা খাঁব নাম যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হযে আছে, অন্য কোনো শাসনকর্তা, এমন কি, এ নগবীব প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁব নামও সেরূপ নিবিড়ভবে জড়িত হযে আসেনি। যে-যুগে মোগল সাম্রাজ্যেব পূর্ব সীমান্তেব প্রদেশটি শাহ্‌জাদাদেব মল্লভূমি হযে দাঁডিয়েছিলো, পূর্ব বাংলা যে-সমযে তাঁদেব উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ বলে পবিগণিত হযেছিলো এবং যে-সমযে চাবদিকে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও নৈবাজ্যিক অবস্থা বিবাজ কবছিলো, সেই যুগেই পূর্বাঞ্চলেব এই শ্রেষ্ঠ সুবেদাব দীর্ঘকাল ধবে নিরুপদ্রবভাবে এই অঞ্চল শাসন কবে গেছেন। দিল্লীব দববাবে অপ্রতিহত প্রভাবেব দরুনই প্রায এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী ধবে তিনি শাসন-ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হযেছিলেন। তাঁব সমসামযিক শাসনকর্তাদের যেমন উত্থান-পতনেব, অনুব গ-বিবাগেব এবং যশ-অপযশেব সম্মুখীন হতে হযেছে, শায়েস্তা খাঁব ক্ষেত্রে তাব ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাঁর ক্ষমতা এবং প্রভাব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিম্লান ছিলো। দীর্ঘ একাশি বছব বযসে তিনি পূর্ণ সম্ভ্রম ও মর্যাদা নিযে অবসব গ্রহণ কবেন।

উচ্চ বংশজাত আমীব-উল-উমাবা নওয়াব শাযেস্তা খাঁর বাজনৈতিক জীবন সর্বপ্রকাব সুযোগ-সুবিধাব মধ্যেই শুরু হয এবং সর্বপ্রকাবে রাজানুগ্রহ এবং আনুকূল্য লাভ কবেন। উচ্চ ও সম্মানী বংশে জন্মগ্রহণ করলেও এই পবিবারেব সৌভাগ্যেব সূত্রপাত হয়েছিলো মাত্র দুই পুরুষ আগে। শায়েস্তা খাঁ এমন পবিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার সাথে জড়িত রযেছে একটি প্রেম-কাহিনী। প্রাচ্যের প্রেম-কাহিনী-গুলোর মধ্যে এটির মতো এতো আকর্ষণীয় কাহিনী খুব কমই আছে।

ইতিহাস ও কিংবদন্তী দুনিয়ার আলো সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এবং সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলকে যেভাবে স্মরণ করে এসেছে, পৃথিবীর কোনো রমণীর ভাগ্যে তা মেলেনি। আগ্রার পরমাশ্চর্য তাজমহল মমতাজের স্মৃতিকে চির-জীব করে রেখেছে। মমতাজের সৌন্দর্য আর সম্রাটের বেদনার চিরস্থায়ী সাক্ষী তাজমহল—শাহজাহানের প্রেমের মূর্ত ছবি তাজমহল। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র। আর ছিলেন যে-মহিলা তাজমহলের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন, তাঁর সহোদর।

একদা অজ্ঞাতকুল এই তাতারী পরিবার দ্রুত ঐশ্বর্য আর মর্যাদার উচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিলো। এটি মুসলিম ইতিহাসের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শায়েস্তা খাঁর পিতামহ খাজা গিয়াস ছিলেন পশ্চিম তাতারের অধিবাসী। এক দরিদ্র কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে তাঁর উন্নতির কোনো আশা নেই দেখে তিনি হিন্দুস্তানে আগমন করার কথা চিন্তা করলেন। অভাবী তাতারীদের কাছে তখন এটি একটি স্বর্গরাজ্য। সমসাময়িক কালে তাঁর দেশের বহু লোক এখানে এসে সৌভাগ্যের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছিলো। খাজা গিয়াস সৌভাগ্যের সেই প্রশস্ত সড়কে পদক্ষেপ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তাঁর এই অভিযান চরম দারিদ্র্য, দুর্দৈব এবং দুঃখ-দুর্দশার মর্মান্তিক-কাহিনীতে ভরপুর। ক্ষীণাঙ্গী এবং ভগ্নস্বাস্থ্য সহধর্মিণীকে নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন। রসদ এবং অন্যান্য সামগ্রী বহনের জন্যে সাথে রইলো একটিমাত্র অশ্ব। পথ যেন টেই এগুতে চায় না। যে সামান্য পরিমাণ অর্থ নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন, শীগ্‌গীরই তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। তাতার সীমান্তে অবস্থিত প্রাণঘাতী মরুভূমিতে তাঁরা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেন। এ মরুভূমিটি তাতার দেশকে তৈমুর বংশীয় সাম্রাজ্যের শেষ সীমা থেকে বিভক্ত করে রেখেছিলো। খাদ্যহীন এবং সঙ্গীহীন অবস্থায় তাঁরা দুর্ভাগ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়ালেন। সামনে অগ্রসর হওয়া অথবা স্বদেশে ফিরে যাওয়া—দুই-ই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের কোনো আলোই তাঁরা দেখতে পেলেন না। দুঃখের

পসরা পূর্ণ করার জন্যে এই মহাদুর্যোগের মধ্যে খাজা গিয়াসের পত্নী এক সন্তান প্রসব করলেন—তাঁদের প্রথম সন্তান। ভবিষ্যতের জন্যে এতো যশোকীর্তির সৌভাগ্য নিয়ে যে-শিশু পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি এমন অশুভ অবস্থার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, এ-কথা ভাবতেও কেমন লাগে। সদ্যোজাত এই শিশুকে বুকে নিয়ে পথ চলার শক্তিটুকুও প্রসূতির ছিলো না। কাজেই রাস্তার একধারে তাকে রেখে তাঁরা পথ চলতে শুরু করলেন। কিন্তু শীগ্‌গীরই মাতা দুঃখে-শোকে ভেঙে পড়লেন। খাজা গিয়াসকে তাই ফিরতে হলো। তিনি এসে দেখেন—একটা বিরাট কালো অজগর শিশুটিকে কুণ্ডলি পাকিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে। সন্তানকে সাপের কবল থেকে মুক্ত করে তাঁরা আসন্ন এবং অনিবার্য মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে একদল পর্যটক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তারা এই দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য ও পথ চলার জন্যে অর্থ সাহায্য করে। তাঁদের জীবনের অমানিশার অবসান হয়ে আসে ক্রমে ক্রমে। নির্বিঘ্নে তাঁরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেলেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই খাজা গিয়াস সম্রাট আকবরের চিত্ত জয় করে ফেললেন। তিনি সম্রাটের এমন অনুগ্রহ ও আস্থাভাজন হলেন যে, তাঁকে সাম্রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয় এবং ইতিমাদ-উদ্-দৌলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যে-কঠোর সংকল্প তাঁর স্বজাতির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো, সেই গুণের বলেই খাজা গিয়াস একজন কপর্দকহীন ভাগ্যান্বেষী থেকে অবিশ্বাস্য রকম সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত পদ অধিকার করলেন। পরিবারের বহুজন পরিবৃত হয়ে তিনি আগ্রা'র নয়নাভিরাম সমাধি-সৌধের মধ্যে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাজমহলের অনতিদূরে যমুনার তীরে অবস্থিত এই সমাধি-সৌধ।

যে শিশু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে অগ্নিস্রাবী মরুভূমিতে পরিত্যক্ত হয়েছিলো, পরিণামে তিনিই এই পরিবারের ঐশ্বর্য, সম্ভ্রম ও প্রভাব সর্বোচ্চ চূড়ায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিলো

মেহেরুন্নিসা বা নারী-সূর্য। এই নামের সার্থকতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা। যে-সব গুণ নারীকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করে তোলে, তাঁর সুন্দরী কন্যার মধ্যে সে-সব গুণের বিকাশ সাধনে ভাগ্যান্বেষী খাজা গিয়াস কোনো ত্রুটি করেননি। সঙ্গীতে, নৃত্যে, কাব্যে ও চিত্রবিদ্যায় সেকালে নারী সমাজে তাঁর জুড়ি ছিলো না। তাঁর মধ্যে ছিলো প্রাণের প্রাচুর্য ও ঔদার্য, বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ এবং প্রফুল্লচিত্ততা। সম্ভ্রান্ত তুর্কী বংশজাত বিখ্যাত শের আফগানের সাথে অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু মেহেরুন্নিসা বা নারী জাতির সূর্যের আকাঙ্ক্ষা ছিল আরো ওপরে। সম্রাট জাহাঙ্গীর একবার এক পলকের দেখাতেই তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন এবং তাঁকে প্রধানা মহিষীরূপে লাভ করবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠেন। শের আফগানের স্ত্রীরূপে যখন তিনি বর্ধমানের প্রাসাদে অববোধবাসিনী, তখন তাঁর প্রেমে মুগ্ধ যুবরাজ সেলিম পথের কণ্টক অপসারণের জন্যে চক্রান্তের ঊর্ণাজাল বুনে যাচ্ছেন। এ-যেনো বাইবেলে বর্ণিত ডেভিড আর উরিয়ার কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি। শের আফগান পুনঃ পুনঃ জাহাঙ্গীরের অশুভ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের এই সব চক্রান্ত আর শের আফগানের পৌরুষ ও পরাক্রম এই জাতির কাছে একটা উপাখ্যানের মতো হয়ে আছে। মানুষ অনেক কিছু ভুলে যাবে; কিন্তু এই উপাখ্যান ভুলবে না। অবশেষে শের আফগানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলা হলো এবং মেহেরুন্নিসা বা নারীকূলের সূর্য হলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বা পৃথিবীর আলো।

এই মহিলা, যাঁর উচ্চাভিলাষ নারী জাতির ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে স্বামীর হত্যাকারীকে বিবাহ করতে প্ররোচিত করেছিলো, তিনি পিতৃ-পরিবারের ভাগ্যোন্নয়নে কোনো ত্রুটিই করতে পারেন না, তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য এরূপ অজুহাত দেখানো হয়ে থাকে যে, শের আফগানই মেহেরুন্নিসাকে আদেশ করে গিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরকে পতিত্বে বরণ করতে; কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি যদি হিন্দুস্তানের একজন সম্রাজ্ঞী দান করে না

যান, তাহলে লোকে তাঁর পরাক্রম ও শৌর্য-বীর্যের কথা ভুলে যাবে। যা হোক, জাহাঙ্গীরের ওপর নূরজাহান অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সম্রাটের সাথে যুক্তভাবে তিনি এই সাম্রাজ্য শাসন করেছেন। সে যুগের একটি মুদ্রায় খোদিত রয়েছে, 'সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা শতগুণ অতিরিক্ত মূল্য লাভ করে।'

ইতিমাদ-উদ্-দৌলা তাঁর সম্রাট-জামাতার ছয় বছর পূর্বে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। এর পর নূরজাহান তাঁর জামাতার জন্যে সিংহাসন লাভের পথ নিষ্কণ্টক করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের অন্যতম পুত্র শাহ্‌রিয়ারই তাঁর জামাতা। শের আফগানের ঔরষে তাঁর যে কন্যা সন্তান হয়েছিলো, তাকে তিনি বিয়ে দেন শাহ্‌রিয়ারের সাথে। পিতার মৃত্যুর পর নূরজাহান-ভ্রাতা আসফ খান জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং উত্তরাধিকারী শাহ্‌জাহানের আমলেও ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর পরমাসুন্দরী দুহিতা মমতাজমহলের সাথে সম্রাট শাহ্‌জাহানের বিবাহ হয়েছিলো। কাজেই সম্রাট-জামাতার ওপর মন্ত্রী আসফ খানের প্রভাবের অন্ত ছিলো না। ১৬৪১ খ্রীস্টাব্দে আসফ খানের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র শায়েস্তা খাঁ তাঁর পদে অভিষিক্ত হন। শায়েস্তা খাঁর বয়স তখন মাত্র ৩৩ বছর। পিতা জীবিত থাকাকালেই তিনি বহু দায়িত্ব ও মর্যাদা-পূর্ণ পদে কাজ করেছিলেন। বিহারের শাসনকর্তা, সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী, গুজরাটের সুবেদার, গোলকুণ্ডা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি, দাক্ষিণাত্যের সুবেদার ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনের পর অবশেষে তিনি বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন এবং এই পদে সুদীর্ঘ দিন অধিষ্ঠিত থাকেন।

এভাবে বাদশাহী পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁর পদ এবং মর্যাদার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ছিলো। তাঁর সমসাময়িক অনেক সহকর্মীই এরূপ ভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি ছিলেন এক সম্রাটের শ্যালক আর এক সম্রাটের মাতুল। অথচ সিংহাসনের প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিলো না। সাম্রাজ্য লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা শিকোহ্‌র

সিংহাসন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দিলে শায়েস্তা খাঁ আওরঙ্গজেবকে সিংহাসন অধিকারের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেন এবং এভাবে আওরঙ্গজেবের আজীবন কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি বাংলার নাযেবে নাজিম নিযুক্ত হন, তখনও তিনি একটি ক্ষতের জ্বালায় কষ্ট ভোগ করছিলেন। মারাঠা সরদার শিবাজীর সাথে দাক্ষিণাত্যে যখন আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ চলছিলো, সেই সময় শিবাজী প্রেরিত এক আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ঢাকায় আসা সম্ভব হয়নি। পরের বছর তিনি ঢাকায় আগমন করেন। তাঁর কার্যকাল দু'ভাগে বিভক্ত: ১৬৬৩ থেকে ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়; আর প্রায় দু'বছরের বিরতির পর ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে তাঁর অবসর গ্রহণকাল পর্যন্ত সময়টিকে দ্বিতীয় পর্যায় বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

নয়া সুবেদারকে প্রথমেই যে বিরাট সমস্যার মোকাবেলা করতে হলো, তা হচ্ছে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের হামলা। পূর্ব বাংলার পূর্বতন সুবেদার এবং সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুলতান শুজার প্রতি আরাকান-রাজ যে ঘৃণ্য আচরণ প্রদর্শন করেছিলেন, তার কোনো প্রতিশোধ না নেয়ার ফলে মগদের ঔদ্ধত্য এবং দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলো। নবোদ্যমে তারা লুঠ-তরাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ঢাকার দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসেও তারা অবাধে চালাতে থাকে তাদের লুণ্ঠন আর ধ্বংসলীলা। চার বছর আগে মীর জুমলা ঢাকায় রাজধানী ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু মীর জুমলার সংক্ষিপ্ত শাসনকাল কুচবিহার ও আসাম অভিযানেই ব্যয়িত হয়। মগ ও পর্তুগীজদের সাথে দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ভার যেনো শায়েস্তা খাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো। বঙ্গোপসাগরের মোহনাস্থ নিম্নভূমিতে ইংরেজ বণিকগণ এতোদিন ধরে প্রতিষ্ঠা লাভের আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিলো। শায়েস্তা খাঁর হাতে মগ আর পর্তুগীজগণ দমিত হওয়ার ফলে ইংরেজ বণিকদের পরোক্ষভাবে অনেক উপকার হলো।

জলদস্যুদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারলে হুগলীর মোহনাস্থ ইংরেজ কুঠিগুলির যে কি বিরাট উপকার হবে, তা অনুধাবন করেই শায়েস্তা খাঁ নাকি ইংরেজ কুঠিয়ালদের তাদের গোলন্দাজ সেনাদল পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজগণ এখানকার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করার, বিশেষ করে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িত হয়ে না পড়ার সংকল্পে তখনও অটল ছিলো বলে শায়েস্তা খাঁকে এরূপ সাহায্য প্রেরণে অস্বীকৃতি জানায়। এতে শায়েস্তা খাঁ রুষ্ট হন এবং পরবর্তী কালে যখন কোম্পানী নূতন নূতন সুবিধা লাভের জন্যে ধর্না দিতে শুরু করে, সে-সময় তিনি ইংরেজদের এই ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হননি। ইংরেজদের সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ওলন্দাজদের সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি ব্যাটাভিয়ায় দূত পাঠিয়ে জলদস্যুদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার এবং আরাকান রাজ্য অভিযানে সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। ওলন্দাজ কোম্পানীর সৈন্যাধ্যক্ষ পর্তুগীজ শক্তি বিধ্বস্ত করার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাই তিনি শায়েস্তা খাঁর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হন এবং বঙ্গোপসাগরে মোগল নৌবহরের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে দু'টি বৃহৎ রণপোত প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা প্রকার ভীতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের ফলে সন্দ্বীপের পর্তুগীজগণ বশ্যতা স্বীকার করে। এরপরে ওলন্দাজ নৌবহর এসে উপস্থিত হয়। শায়েস্তা খাঁ তখনকার মতো পর্তুগীজদের উপদ্রব থেকে মুক্ত হওয়ায় বিদেশীদের সাহায্য গ্রহণ করার মতো অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটি সুচতুরতার সাথে এড়িয়ে গেলেন। তিনি পরম শিষ্টতার সাথে ওলন্দাজদের শুভেচ্ছার জন্যে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের আর তাঁর দরকার নেই। বার্নিয়ার লিখেছেন, 'আমি বাংলাদেশে এসব জাহাজ দেখি এবং নৌ-অধ্যক্ষদের সাথে সাক্ষাৎ করি। শায়েস্তা খাঁর এরূপ মৌখিক ধন্যবাদ এবং উদারতায় তারা তুষ্ট হতে পারেনি।'

শায়েস্তা খাঁ মগদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনোর জন্যে ঢাকায় এক

বিরাট বাহিনী গড়ে তুললেন। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর তিনশত যুদ্ধজাহাজ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলো। এগুলোতে রইলো প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ এবং নৌ-সৈন্যদল। তেতাল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী। নদী থেকে জলদস্যুদের বিতাড়িত করার জন্যে হোসেন বেগের সৈনাপত্যে জাহাজে করে তিন হাজার সৈন্য মূল বাহিনীর আগেই প্রেরিত হলো। শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজরগ উমেদ খাঁর নেতৃত্বে অপর একটি বাহিনীকে স্থলপথে অগ্রসর হতে বলা হলো। এই বাহিনী নৌ-বাহিনীর সাথে একত্র হয়ে গঙ্গার বদ্বীপ থেকে মগদের বিতাড়িত করে। পলায়নপর মগদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে মোগল-বাহিনী তাদের নিজেদের দেশে তাড়িয়ে দেয় এবং এভাবে পূর্ব বাংলা তাদের অরাজকতা থেকে চিরতরে উদ্ধার লাভ করে।

বর্ষার শেষে হোসেন বেগ তাঁর নৌ-বাহিনী নিয়ে ঢাকা থেকে রওয়ানা হলেন মেঘনার ভাটিপথে এবং জুগদিয়া ও আলমগীরনগর দুর্গ থেকে আরাকানীদের বিতাড়িত করলেন। এই দুর্গ দু'টি তারা একদিন মোগলদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো। অতঃপর তিনি সন্দ্বীপ অভিযানে যাত্রা করলেন। এই সন্দ্বীপেই ছিলো অসমসাহসিক পর্তুগীজদের প্রধান আড্ডা। কিন্তু এই দ্বীপ থেকে তাদের বিতাড়িত করা সহজ ছিলো না। পঞ্চাশ বছর ধরে তারা ক্রমাগত এর শক্তি বৃদ্ধি করে এটিকে দুর্ভেদ্য করে তোলে। দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা বিস্ময়কর নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলো। যা হোক, প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগের পর অবশেষে মোগল-বাহিনী তাদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়।

প্রচুর কষ্টার্জিত এই বিজয় সংবাদপ্রাপ্তির পর শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম জয়ের পথকে সহজতর করার জন্যে এক উপায় অবলম্বন করলেন। যে-সব পর্তুগীজ সেনা আরাকান-রাজের পক্ষে লড়াই করতো, তিনি তাদের নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করে আরকান-রাজের চাকরি থেকে তাদের টেনে আনলেন নিজের দলে। মগদের কাছে তারা যে-সব সুবিধা ভোগ

করতো, তার চেয়ে অনেক বেশী সুবিধার প্রতিশ্রুতি দান করা হলো। তাদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা এবং রাজধানীর কাছে জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। একদিকে যেমন এসব সুবিধার লোভ দেখানো হলো, অন্যদিকে তেমনি আবার তাদের ভয় দেখানো হলো যে, মগদের সাথে তারা সম্পর্ক ছিন্ন না করলে তাদের ধ্বংস করে ফেলা হবে। এভাবে তিনি পর্তুগীজদের নিজের দলে ভিড়াতে সমর্থ হলেন। পূর্ব বাংলায় শায়েস্তা খাঁর মতো শক্তিশালী একজন শাসনকর্তার প্রয়োজন বহু দিন থেকেই অনুভূত হয়ে আসছিলো। পর্তুগীজরা শায়েস্তা খাঁকে চিনতে পেরেছিলো এবং একথা উপলব্ধি করেছিলো যে, তাদের লুটপাট আর দস্যুবৃত্তির দিন শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই তারা গোপনে আরাকান রাজ্য থেকে পলায়ন করে সন্দ্বীপে উপস্থিত হলো। সেখানে হোসেন বেগ তাদের হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করলেন। মগদের সাথে লড়াইয়ে কাজে লাগতে পারে, এরূপ ব্যক্তিদের বেছে নিয়ে তাঁর সেনাদলে ভর্তি করে নিলেন এবং এদের স্ত্রী, পরিবার এবং বাদবাকী অন্যান্য পর্তুগীজদের ইছামতীর তীরভূমিতে শায়েস্তা খাঁর প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে প্রেরণ করলেন। বিক্রমপুরের অনতিদূরে ফিরিঙ্গি বাজারে তারা বসতি স্থাপন করে শান্তিপূর্ণ পথে জীবন ধারণ করতে শুরু করলো। তাদের অনেকেই শায়েস্তা খাঁর অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগদান করে এবং অনেকে ঢাকায় ব্যবসায় শুরু করলো। তারা ঢাকার দোলাই খালের কাছে বাস করতো এবং সেখানে একটি মঠ ও গীর্জা স্থাপন করেছিলো। ট্যাভারনিয়ার ঢাকা পর্যটনকালে এগুলোর স্থাপত্য-কুশলতার প্রশংসা করেন। তাদের নির্মিত আর একটি গীর্জা শহর থেকে চার মাইল দূরে তেজগাঁয়ে এখনও বিদ্যমান আছে। ঢাকার গৌরবের দিনে শহর তেজগাঁ থেকে আরও দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। আজ শহর সেখান থেকে অনেক পেছনে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে।

ইত্যবসরে শায়েস্তা খাঁর পুত্রের সেনাবাহিনী ফেনী নদীতে উপস্থিত হলো। এটি ছিলো আরাকানী রাজ্যের সীমান্ত। এখানে আরাকানী বাহিনী উমিদ খাঁকে মোকাবেলা করার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু এই প্রথম তারা মোগল অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো। তাদের চেয়ে অনেক সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধনিপুণ সেনাবাহিনীই মোগল অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে পর্যুদস্ত হয়েছে। এদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে বর্বর, অশিক্ষিত মগ সেনারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করলো। এভাবে আরাকানের প্রবেশ-পথ অতি সহজেই বিজিত হলো।

স্থলবাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে হোসেন বেগ তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে সন্দ্বীপ থেকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু আরাকানীরা ওঁৎ পেতে ছিলো। তারা চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে মোগল-বাহিনীর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। বহুদিন থেকে পর্তুগীজদের সংস্পর্শে আসায় আরাকানীরা নৌ-যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলো। তিন শত জাহাজ ভর্তি মগ সৈন্য মোগল সেনাদের আক্রমণ করলো। কিন্তু হোসেন বেগের দলে ছিলো পর্তুগীজদের সবচেয়ে সুদক্ষ নৌ-সেনা। তারা যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করলো। ইতিমধ্যে উমেদ খাঁর সেনাদল এবং মূল বাহিনী সেখানে উপস্থিত হলো। তারা আক্রমণকারী মগদের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করে তাদের বিপর্যস্ত করে তোলে এবং মগ বাহিনী পলায়ন করতে বাধ্য হলো। চট্টগ্রামের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হলো। এইখানেই মগগণ তাদের শেষ শক্তি সমাবিষ্ট করেছিলো। তারা নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়ে এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলো এবং এটিকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করে তুলেছিলো। দুর্গের সৈন্যগণ নৌ-সেনাদের বিজয় সংবাদের জন্যে উৎকর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু তার পরিবর্তে যখন তারা দেখতে পেলো যে, নৌ-বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, তখন তারা যুদ্ধারম্ভের আগেই হতোদ্যম ও ভীত হয়ে পড়লো। স্থল ও জলপথে তারা এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে তারা গভীর নিশীথে

নিজেদের দেশে পলায়নের চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু প্রত্যুষে অরি ত্রাস মোগল অশ্বারোহী দল পলায়নপর মগ-সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং জীবিতাবস্থায় যে দু'হাজার হতভাগ্য আরাকানীকে পাওয়া গেলো, তাদের বন্দী করে গোলামরূপে বিক্রয় করে দেওয়া হলো। চট্টগ্রাম কিন্তু বিজয়ীদের চরম নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। মগেরা সমগ্র দেশ জুড়ে যে ব্যাপক আকারে লুটতরাজ চালিয়েছিলো, তাতে মোগল সেনারা আশা করছিলো যে, চট্টগ্রামে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ পাবে। কিন্তু ১২২৩টি কামান ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু সেখানে পাওয়া গেলো না। শায়েস্তা খাঁ বিজিত শহরটির নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম দিলেন ইসলামাবাদ। মোগলদের সময় এই প্রথম চট্টগ্রাম বিজিত হলো। অতঃপর এটি স্থায়ী-ভাবে বাংলার অঙ্গীভূত হলো।

এই একটিমাত্র অভিযান ব্যতীত বাংলাদেশে শায়েস্তা খাঁর গোটা শাসনকালটিই ছিলো বিস্ময়কর রকমের শান্তিপূর্ণ। মগ ও পর্তুগীজদের পৌনঃপুনিক হানা ও অমানুষিক অত্যাচারে পূর্ব বাংলার দুর্ভাগ্যের অন্ত ছিলো না। এদের অরাজকতার অবসান হওয়ায় প্রদেশে শান্তি ফিরে আসে। এই শান্তি বহু ক্লিষ্ট ও নির্জিত পূর্ব বাংলা এবং এর অধিবাসীদের কাছে এক পরম আশীর্বাদরূপে কাজ করেছিলো। এই সময় ঢাকা সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। এখান থেকে যেসব পণ্য বিদেশে রফতানী হতো, সেগুলোর সংখ্যা ও রকমারীই এর সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই ঢাকা তার উৎপাদিত পণ্য রফতানী করতো। উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হওয়ায় পশ্চিম উপকূলে সুরাট বন্দর ভারত এবং ইউরোপের প্রধান পণ্যকেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে। এই বন্দরের মাধ্যমে ঢাকা তার বিপুল বস্ত্র ব্যবসায় চালাতে থাকে। বস্ত্রের বিনিময়ে শঙ্খ আমদানী করা হলেও বহির্বাণিজ্যে তার লাভের পরিমাণ এতো অধিক হতো যে, সরাসরি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আমদানীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই থেকেই পূর্ব বাংলায় আর্কট মুদ্রার আবির্ভাব

ঘটে। ট্যাভারনিয়ার ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে যখন এই নগরী পরিদর্শন করতে আসেন, তখন তিনি এখান থেকে মসলিন, সিল্ক, সুতীবস্ত্র এবং ফুল-ফলের কাজ-করা বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রভেন্স, ইতালী ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে চালান হতে দেখেন। ভূটান, আসাম ও শ্যাম দেশে রফতানী হতো প্রবাল, স্ফটিক ও শঙ্খ; নেপালে যেতো প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র, ভোঁদড় চর্ম ও শাঁখের চুড়ি। আর করমণ্ডল উপকূলে চালান যেতো চাউল। ঢাকায় ঐ সময় টাকায় আট মণ চাউল বিকোত। প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র বিদেশে রফতানী হতো বটে, কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, সবচেয়ে মিহি ও সবচেয়ে মূল্যবান বস্ত্রগুলো বাদশাহ্ ও সুবেদারদের প্রাসাদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে থাকতো। দেশী বা বিদেশী বণিকদের কাছে একটা নির্দিষ্ট মূল্যের বেশী দামের বস্ত্র উৎপাদন শাহী নির্দেশবলে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। এরূপ নির্দেশের খেলাফ যাতে না হয় সেজন্যে উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে একজন করে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিলো। সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র যাতে বাইরে যেতে না পাবে, তা দেখাই ছিলো তাঁর কাজ। বস্ত্র বয়নকারী এবং ফড়িয়া আড়ৎদারদের ওপর এঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিলো। উৎপন্ন বস্ত্রের প্রতি এঁদের শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো—যাতে করে তাঁদের মনিব ছাড়া আর কেউ উৎকৃষ্টতম বস্ত্র না পায়। শাহী পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে যে-সব বস্ত্র উদ্বৃত্ত হতো, উৎপাদনকারীরা সেগুলো খুশিমতো বেচতে পারতো। যে-সব দ্রব্য বিদেশে রফতানী করা হতো সেগুলোর সাথে এসব উৎকৃষ্ট উদ্বৃত্ত বস্ত্রও চালান হয়ে যেতো। ইরানে এবং আরব বন্দরসমূহেই এগুলো বেশী চালান হয়ে যেতো।

ঢাকাই মসলিনের অতুলনীয় সূক্ষ্মতা ও উৎকৃষ্টতা বর্ণনা করে অনেকেই অনেক কিছু লিখে গেছেন। এ সম্পর্কে লিখিত প্রাচীনতম বিবরণসমূহের একটিতে বলা হয়েছে, 'এই একই দেশে তারা সুতী জামা এমন অসাধারণ-ভাবে তৈরি করে যে, পৃথিবীর কুত্রাপিও সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এইসব জামার বেশীর ভাগই গোলাকৃতি এবং এমন সূক্ষ্মভাবে তৈরি যে, ষাট হাত

দীর্ঘ উৎকৃষ্ট মসলিনের একটা পাগড়ি হাতে নিলে বুঝাই যাবে না যে, হাতে কিছু আছে। উটপাখির ডিমের সমান একটি নারিকেলের খোলের মধ্যে এরূপ একটা পাগড়ি রাখা হয়েছিলো। গুণানুসারে উৎপাদিত মসলিন বস্ত্রের নানা শ্রেণীবিভাগ ছিলো এবং এগুলোর রূপক নাম ছিলো। এসব নামের একটি হচ্ছে আব-ই-রওয়ান বা চলন্ত জল। আর একটি নাম শবনম বা শিশির। এই দুই শ্রেণীর মসলিনই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ফুলের কাজ-করা জামদানী ও মলমল খাসের খ্যাতিও কম ছিলো না। স্বচ্ছতা, সূক্ষ্মতা ও শিল্প-চাতুর্যের দিক থেকে এই শ্রেণীর বস্ত্রের জুড়ি আজো মিলেনি। আধুনিক যুগে বয়ন-শিল্পের যতোই উৎকর্ষ সাধিত হোক না কেনো, উৎকৃষ্টতার দিক দিয়ে এ-শ্রেণীর বস্ত্রের ধারে-কাছে যেতে পারে এমন বস্ত্র উৎপাদনও সম্ভব হয়নি অথচ ঐ ধরনের বস্ত্র বয়নে তারা যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো, সেগুলো ছিলো আদিম কালের। যন্ত্রপাতি বলতে যা ছিলো, তা হচ্ছে কয়েকটি বাঁশের খণ্ড অথবা সুতো দিয়ে বাঁধা কয়েক টুকরো বাঁশের কাঠি। এগুলোর বয়ন-পদ্ধতি কিরূপ ক্লেশকর ছিল, তা এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, আব-ই-রওয়ান বা ঐ শ্রেণীর বস্ত্রের উপযোগী সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত করতে একশত পঁচিশটি যন্ত্রের দরকার হতো। এতে অপরিসীম সাবধানতা, ধৈর্য ও দক্ষতার প্রয়োজন হতো। বয়নকারীদের চোখের ওপর এতো টান পড়তো যে, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে ষোল থেকে ত্রিশ বছর বয়সের তন্তুবায়গণই সুযোগ পেতো। আবহাওয়ার আর্দ্রতার জন্যেই প্রধানতঃ এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব হতো বলে ঢাকার তন্তুবায়গণ মনে করতো। গরমের ফলে বস্ত্রের উৎকৃষ্টতা ক্ষুণ্ন হতে পারে, এই ভয়ে তারা কখনও দুপুর বেলায় বয়নকর্মে হাত দিতো না। মসলিন বস্ত্র কিরূপ সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ছিলো, প্রচলিত একটা কাহিনী থেকে তা কিছুটা অনুমান করা যায়। জনৈক বয়ন-শিল্পী একটি মসলিন বস্ত্র বয়নের পর সন্ধ্যার মৃদু শীতলতার মধ্যে সেটি শুকানোর জন্যে ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু দেখার জন্যে কোনো লোক না রেখেই সে ঐ স্থান থেকে চলে যায়।

নিকটে একটি গরু চরছিলো। গরুটি ঘাসের সাথে বস্ত্রটিও খেয়ে ফেলে। এতে সমব্যবসায়ীরা এতো ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, তারা সবাই মিলে চরম অপমানের সাথে তাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। কোনো দিনই আর তাকে বয়ন কার্যে হাত দিতে দেওয়া হয়নি।

শায়েস্তা খাঁর সুবেদারির আমলেই আর একজন ইউরোপীয় পর্যটকের লেখায় পূর্ব বাংলার আর একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশ পর্যটনকালে ফ্রান্সিস বার্নিয়ার লিখেন, 'চালের সাথে ঘি ও চার-পাঁচ রকমের মটরশুঁটি দিয়ে এখানে এক রকমের খাদ্য তৈরি হয়। এটি অতি সাধারণ লোকের সাধারণ খাদ্য। বলতে গেলে এক রকম বিনা পয়সায় এ-রকম খাবার পাবেন। এক টাকায় (রুপিয়া) কুড়িটি অথবা তারও বেশী মোরগ পাবেন; এ দামে সমান সংখ্যক হাঁসও পাওয়া যাবে। টাটকা ও লোনা মাছও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এক কথায় বাংলা প্রাচুর্যের দেশ—সেখানে সব কিছুরই প্রাচুর্য।' সে-যুগে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে এরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিলো যে, বঙ্গদেশে প্রবেশের শত পথ খোলা আছে; কিন্তু একবার প্রবেশ করে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার একটি পথও নেই। বার্নিয়ার বলেন, 'আমি এমন কোনো দেশের কথা জানি না—যেখানে এখানকার মতো এতো বিচিত্র শ্রেণীর মূল্যবান পণ্য পাওয়া যেতে পারে। এসব মূল্যবান পণ্যই বিদেশী ব্যবসায়ীদের এখানে আকৃষ্ট করে। আমি যে-ধরনের চিনির কথা এর আগে উল্লেখ করেছি, তা হচ্ছে ঐসব মূল্যবান পণ্যের অন্যতম। এখানে এতো বিপুল পরিমাণে রেশমী ও সুতীবস্ত্র পাওয়া যায় যে, বাংলাকে এ দু'টি পণ্যের ক্ষেত্রে মহা মোগল সাম্রাজ্য, পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ এবং সমগ্র ইউরোপের মহাভাণ্ডার বলে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার রকমারী সুতীবস্ত্রের পরিমাণের বিপুলতার কথা চিন্তা করে আমি সময় সময় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। মোটা-মিহি, সাদা-রঙীন, বিচিত্র বর্ণ ও জাতের বস্ত্রসম্ভারের বিস্ময়কর সমাবেশ। ওলন্দাজগণ

বাংলাদেশ থেকে এসব বস্ত্র নিয়ে বহু দেশে, বিশেষ করে জাপানে ও ইউরোপে রফতানী করতো। ইংরেজ, পর্তুগীজ ও ভারতীয় বণিকগণ যে বস্ত্র ব্যবসায় চালাতো, তাদের কথা উল্লেখ না-ই করলাম। রেশম ও রেশমী-বস্ত্র সম্পর্কেও ঐ একই কথা। প্রতি বছর যে কি বিপুল পরিমাণে এইসব পণ্য বিদেশে চালান যেতো, তা কেউ কল্পনা করতে পারবে না।'

বার্নিয়ার ঢাকা পর্যন্ত এতো পুবে না এলেও জলপথে তিনি বঙ্গোপ-সাগরের মোহনাস্থ যেসব অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন, সেগুলো ঠিক পূর্ব বাংলারই অনুরূপ। তিনি বলেছেন যে, এ-দেশের সৌন্দর্য ও উর্বরতার তুলনা হয় না। ফলভারাবনত বৃক্ষরাজী আর শ্যামসম্পদে ভরা এ-দেশ। হাজার হাজার স্রোতস্বিনী বয়ে গেছে এর ভেতর দিয়ে। এই সব নদীর তীরভূমির কোনো কোনো অঞ্চলে ভালো কৃষি আবাদ হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয় তীর যোজনব্যাপী নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিলো। এগুলোতে বাস করতো বাঘ, হরিণ, শূকর ও বুনো মোরগ। পূর্ব বাংলার সে-যুগে এবং তার বহুদিন পরেও বাঘ ছিলো পথিকের পক্ষে একটা বিরাট ভীতির কারণ। বার্নিয়ার লিখেছেন, 'প্রায়শঃই এরা অতর্কিতভাবে হামলা করে বসতো। আমি এরূপ বলতে শুনেছি যে, বাঘের সাহস এতো বেড়েছে যে, এরা নৌকা থেকে ঘুমন্ত লোকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে তাগড়া জোয়ানদের বেছে তুলে নিয়ে যায়। নৌকার মাঝিদের মুখে শোনা এই কাহিনী কতোদূর সত্য, জানি না।' পথের এতো সব বিপত্তি সত্ত্বেও বার্নিয়ারের 'গ্রামাঞ্চলের এসব সৌন্দর্য অবলোকনের আগ্রহের তৃপ্তি হয়নি—যদিও ইতিমধ্যেই আমার ট্রাঙ্ক ও বিছানাপত্র ভিজে গেছে, মোরগগুলো মরে গেছে, মাছ নষ্ট হয়ে গেছে এবং সবগুলো বিস্কুট পানিতে চুপসে গেছে।' অবশ্য বার্নিয়ার এ-দেশের আবহাওয়ার প্রশংসা করতে পারেননি। তাঁর অনুপম ভাষায় তিনি লিখেছেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এখানকার বিশেষতঃ সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া বিদেশীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। প্রথমের দিকে যেসব ইংরেজ ও

ওলন্দাজ বসবাস করতে এসেছিলো, তাদের অনেককেই অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কিন্তু যখন থেকে তারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে যত্ন নিতে শিখেছে এবং যখন থেকে এরূপ নির্দেশ জারী করা হয়েছে যে, তাদের জাতির লোকেরা বিশেষ জাতীয় একটি পানীয় পান করতে পারবে না, আরক এবং তামাক বেশী খাবে না এবং যখন থেকে তারা বুঝতে পেরেছে যে, বের্দোঁ বা ক্যানারী জাতীয় মদ দূষিত আবহাওয়ার প্রতিষেধকের কাজ করে, তখন থেকে তাদের মধ্যে রোগের প্রকোপ কমে যেতে থাকে এবং প্রাণহানিও খুব বেশী ঘটে না। পানিতে এক প্রকার আরক, লেবুর রস ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে ঐ পানীয় তৈরি হতো। খেতে খুব সুস্বাদু হলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ছিলো বিষময়।'

অপর একজন ফরাসী পর্যটক ঐ সময় ঢাকা ভ্রমণ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে যান। এঁর নাম জঁ্যা ব্যাপ্টিস্ট ট্যাভার্নিয়ার। তিনি বার্নিয়ারের সাথে ভারতের কিছু অংশ একত্র ভ্রমণ করেন। পাটনায় এসে এঁদের ছাড়াছাড়ি হয়। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী ট্যাভার্নিয়ার ঢাকায় উপস্থিত হন। শায়েস্তা খাঁ যখন গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন তিনি ইতিপূর্বে একবার তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে আর্থিক লেনদেন হয়, তৎসম্পর্কে বার্নিয়ার এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ রেখে গেছেন। এ বিবরণের উপসংহারে ট্যাভার্নিয়ার বড়ো দুঃখের সাথে বলেছেন, 'এই রাজপুরুষ অন্য সব ব্যাপারে অতিশয় উদার ও মহান হলেও জিনিস কেনার ব্যাপারে কঠোরভাবে হিসাবী।' ঢাকায় সাক্ষাৎকারের পর অবশ্য তিনি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তিনি বলেন, শায়েস্তা খাঁ 'সম্রাট আওরঙ্গজেবের মাতুল এবং রাজ্য-মধ্যে সবচেয়ে চতুর লোক।' অতঃপর তিনি সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেন। ট্যাভার্নিয়ার লিখেছেন, 'ঢাকা আগমনের পরদিন নওয়াবকে সালাম দিতে গেলাম। তাঁকে সোনার বুটিদার ও সোনালী ফিতা জড়িত একটি জমকালো লম্বা জামা ও পান্না খচিত একটি চাদর উপহার দিলাম।

যে ওলন্দাজটির সাথে আমি থাকতাম, সন্ধ্যার দিকে তার কাছে ফিরে এলাম। নওয়াব আমাকে বেদানা, চীনা কমলালেবু, তরমুজ ও তিন প্রকার আপেল পাঠান।' এসব প্রতিদানের দ্বারা ধূর্ত নওয়াব তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর দ্রব্যগুলোকে ফরাসী বণিক-পর্যটক এতোই মূল্যবান মনে করেছিলেন যে, তিনি নওয়াবকে আরো বেশী দামী জিনিস উপহার দিলেন। 'পরের দিন আমি কতকগুলো জিনিস তাঁকে প্রদর্শন করলাম এবং তাঁর পুত্র নওয়াবজাদাকে সোনার গিল্টি করা একটি ঘড়ি, রূপোর এক জোড়া পিস্তল এবং একটি দূরবীন উপহার দিলাম। নওয়াব ও তাঁর দশ বছরের পুত্রকে প্রদত্ত আমার উপহার সামগ্রীর দাম ছিলো ৫,০০০ লিভার।' ট্যাভার্নিয়ারের আপাতঔদার্যের মূল রহস্য প্রকটিত হয়ে পড়েছে তাঁর পরের দিনের ডায়রীতে লিপিবদ্ধ একটি লাইনে। তিনি লিখেছেন, '১৬ তারিখে আমার উপহার সামগ্রীর মূল্য স্থির হলো। অতঃপর আমি মন্ত্রীর কাছ থেকে হুণ্ডি নিতে গেলাম।' বণিক নিশ্চয় তাঁর উপহার সামগ্রীর যথাতিরিক্ত দাম পেয়ে গিয়েছিলেন।

ট্যাভার্নিয়ারের ঢাকা পর্যটনের আরো দু' বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজগণ ঢাকায় কোনো কুঠি স্থাপন না করলেও সেখানে তাদের প্রতিনিধি ছিলো। তিনি লিখেন, '২২ তারিখে আমি ইংরেজদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। মিঃ প্র্যাট ছিলেন ইংরেজদের প্রেসিডেন্ট।' তাঁর বাসস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে ট্যাভার্নিয়ার লিখেন, 'উচচ দেয়ালবেষ্টিত একটি স্থানে তাঁর আবাস। এর ঠিক মাঝখানে একটি অতি সাধারণ কাঠের ঘর। সাধারণতঃ তিনি এই প্রাকার বেষ্টিত স্থানের উঠানে তাঁবুতে বাস করেন। সাধারণ ঘরে পণ্য-সামগ্রী রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ওলন্দাজগণ একটি সুন্দর গৃহ তৈরি করে নিয়েছে। ইংরেজদেরও এরূপ ভালো ঘর আছে। রেভারেণ্ড অগাস্টিন ফাদারদের গীর্জাটি ইটের তৈরি এবং দেখতেও সুন্দর।' ২৩ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত ট্যাভার্নিয়ার তাঁর পণ্য ক্রয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিনি এগারো হাজার টাকার

মাল খরিদ করেন। কি ধরনের জিনিস কিনেছিলেন, তিনি তা প্রকাশ না করলেও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঢাকার বিখ্যাত মসলিন বস্ত্রও তাঁর ক্রয়-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। এই বলে তিনি প্রাচ্যের এই নগরীর কাহিনী সমাপ্ত করেন, '২৯শে সন্ধ্যায় আমি ঢাকা থেকে বিদায় নিই। ওলন্দাজগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সশস্ত্র নৌকায় করে প্রায় ছয় ক্রোশ রাস্তা আমাকে এগিয়ে দেয়। এই বিদায়-উৎসবে স্পেনীয় মদ বাদ যায়নি।"

শায়েস্তা খাঁর সুবেদারী আমলে বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিলো। পর্তুগীজগণ ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে বসবাস শুরু করে। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ শুজা তাদের সেখান থেকে উৎখাত করেন। ওলন্দাজগণ সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগে এখানে আগমন করেছিলো। ইংরেজগণ ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে বিস্তার লাভ করে এবং ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যার হরিহরপুর ও বালাশোরে কুঠি স্থাপন করে। এর আঠারো বছর পরে এবং শায়েস্তা খাঁর বাংলার সুবেদার হওয়ার বারো বছর পূর্বে স্টিফেন্স ও ব্রিজম্যান হুগলীতে কুঠি নির্মাণ করেন এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এটিই তাঁদের সদর মোকামে পরিণত হয়। পরবর্তী কালে শায়েস্তা খাঁর আমলে ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায়, ফরাসীরা চন্দননগরে এবং দিনেমারগণ শ্রীরামপুরে বসতি স্থাপন করে। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজগণ ঢাকায় তাদের নতুন কুঠি স্থাপন করে। ঐ সনেই বেঙ্গল পাইলট সার্ভিসের পত্তন হয় এবং ইংরেজদের প্রথম জাহাজ হুগলী পর্যন্ত উপনীত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শায়েস্তা খাঁ ইংরেজদের দুশমন ছিলেন বলে তাঁর নামে অপবাদ আরোপিত হয়ে থাকলেও এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁর আমলেই সমগ্র বাংলায় ইংরেজদের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়।

১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ সুবেদার হলে বঙ্গোপসাগরে সংগ্রামরত ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটসংকুল হয়ে ওঠে। একটি স্থানীয় নৌকা জবরদস্তিমূলকভাবে আটক করে এরা ইতিপূর্বে

মীর জুমলার রোষানল প্রদীপ্ত করেছিলো। কুচবিহার ও আসাম অভিযান নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকায় তারা সমুচিত শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায়। এই অনধিকার চর্চাকারীর দল পূর্বদেশে তাদের প্রথম আগমনের সাথে সাথেই মোগলদের মনে যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিলো, শায়েস্তা খাঁর মন থেকে তা দূরীভূত হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর প্রথমবারের সুবেদারির আমলে তাঁর সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে তিক্ত হয়ে ওঠেনি। ইংরেজগণ যে-সব বাদশাহী ফরমান লাভ করেছিলো, সেগুলোকে যদি সম্পর্কের মানদণ্ড বলে গণ্য করা হয় তবে দেখা যাবে যে, শায়েস্তা খাঁর সাথে তাদের সম্পর্ক দ্রুত উন্নতি লাভ করে। বঙ্গরাজ্যে ইংরেজরা যে-সব সুবিধা ভোগ করেছিলো, পাঁচ বছর পরে শায়েস্তা খাঁ সে-গুলো পুনরনুমোদন করেন। কোম্পানীর কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারে তিনি মীর জুমলার নীতি অনুসরণ করেন এবং বার্ষিক তিন হাজার টাকা করে আদায় করেন। তিনি এক পরোয়ানা জারি করে রাজকর্মচারীদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেন যেন তাঁরা সরকারের প্রাপ্য কর ছাড়া নিজেদের জন্যে কিছু আদায় না করেন।

মোগল প্রতিবেশীদের সাথে তাদের এরূপ সম্পর্ক ছাড়াও কোম্পানী বিক্ষুব্ধ অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছিলো। এই প্রতিষ্ঠিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত কোম্পানী উচ্ছৃঙ্খল ও বোম্বেটে ব্যবসায়ীদের সাথে তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইংরেজগণ এদের হামলাকারী ও বোম্বেটে বলে আখ্যায়িত করতো। নূতন ও পুরাতন কোম্পানীর মধ্যেকার পুরানো বিরোধ তখন সবেমাত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই বিরোধের ফলে বাংলা দেশস্থ ক্ষুদ্র ইংরেজ সম্প্রদায়টি দুটো পরস্পর-বিরোধী শত্রু-শিবিরে পরিণত হয় এবং তাদের সাধারণ দুশমন ঢাকাস্থ মোগল সুবেদার এবং তাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বোম্বেটেগণ হুগলী পর্যন্ত উজিয়ে এসে কোম্পানীর এলাকায় ঢুকে পড়তো এবং প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীকে বাধা দিতো। এদের মধ্যে সবচেয়ে

দুর্দান্ত ও কুখ্যাত ব্যক্তিটির নাম টমাস পিট। ইনি জগৎখ্যাত হীরকটির আবিষ্কর্তা এবং সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন যে দু'জন রাজনীতিবিদের নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁদের পূর্বপুরুষ। পরবর্তীকালে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং মাদ্রাজে কোম্পানীর গভর্নর ও একজন সম্মানিত কর্মচারীরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী হামলাকারীদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্দান্ত ছিলেন এবং সরকারী দলিল-দস্তাবিজে "জলদস্যু পিট" বলে উল্লেখ করা হতো। পিট বাংলার ইংরেজ কুঠিসমূহের অধ্যক্ষ ম্যাথিয়াস ভিনসেন্টের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করায় ইংরেজ-দরবারে তাঁর বহু বন্ধু-বান্ধব জুটেছিলো। ফলে ভিনসেণ্ট তাঁকে দিয়ে জলদস্যুতা ব্যবসায়ে সাহায্য করেছেন—ঊর্ধ্বমহলে এরূপ একটি সন্দেহ বদ্ধমূল হয়ে ওঠে—কোম্পানীর কোন কর্মচারীর পক্ষে এটি জঘন্যতম অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। বাংলার কুঠিগুলো তখনও মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জের গভর্নর দ্বারা শাসিত হতো। বিলাত থেকে কোম্পানী দু' দু'বার স্ট্রেনশ্যাম মাস্টারকে এই সব অভিযোগের প্রতিকারকল্পে প্রেরণ করে এবং "ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা, ইংরেজ জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি ও বিশৃঙ্খলা রোধকল্পে" নির্দেশ জারী করে।

এইসব বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা ইংরেজ বণিকদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও ঐক্যহীন করে তুলেছিলো। আর শায়েস্তা খাঁ তা সন্তোষের সাথে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংরেজদের ঢাকায় একটি কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন এবং এইভাবে তাদের বাংলাস্থ কেন্দ্রীয় মোগল-শক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আনয়ন করেন। একটি সাধারণ মোকামরূপে শুরু করা হলেও অতি অল্পকালের মধ্যেই—১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে—পণ্য বিক্রয় বিশেষ করে বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন বিক্রয় এতো লাভজনক হয়ে দাঁড়ায় যে, কোম্পানীর গুদামে যে-স্থলে ৮৫ হাজার টাকার মাল মজুদ করা হতো, তা বৃদ্ধি করে এক লাখ টাকার পণ্য স্টক করা হয়। চার বছর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার কুঠিগুলোকে স্বাধীনভাবে

ব্যবসায় পরিচালনার অনুমতিদানে কৃতসংকল্প হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা ভিনসেন্টের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। জলদস্যুদের সাহায্য করে "ভিনসেন্ট যে ঘৃণার্হ ধর্মীয় ব্যভিচারের আশ্রয় নিয়েছিলেন," ডিরেক্টরগণ তাতে তাঁর ওপর রুষ্ট হন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তাঁরা বিশেষ ক্ষমতাসহ উইলিয়াম হেজেসকে বঙ্গোপসাগরের জন্যে কোম্পানীর এজেন্ট ও ডিরেক্টর নিয়োগ করেন। জব চার্নককে তাঁর সহকারী নিয়োগ করা হলো। ইংরেজ-কুঠিতে কার্যরত আরও পাঁচজন কর্মচারীকে নিয়ে একটা কাউন্সিল গঠিত হয়।

অতঃপর এমন একটি প্রহসনের সূত্রপাত হলো, যা বাংলায় ইংরেজদের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কোম্পানীর গভর্নর উইলিয়াম হেজেস একজন কর্পোর‍্যাল ও কুড়িজন সৈনিকের একটি দেহরক্ষীদলসহ বিরাট শান-শওকতের সাথে ইংলণ্ড থেকে রওয়ানা হলেন। তিনি যে জাহাজে রওয়ানা হয়েছিলেন সেটির নাম ছিলো "ডিফেন্স"। ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হিথ ছিলেন এর অধ্যক্ষ। তিন সপ্তাহ পর সংবাদ পাওয়া গেলো যে, "দস্যু পিট"ও "ক্রাউন" নামক একটি জাহাজে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করছেন এবং এটির নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে সাথে তাঁর অধীনস্থ আরও তিন-চারটি জাহাজ থাকবে। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। "দস্যু" ও "লুণ্ঠনকারীদের" যাত্রা বানচাল করে দেওয়ার জন্যে কোম্পানী সর্ববিধ উপায় ও কৌশল গ্রহণ করলো। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেলো। এভাবে বিফলমনোরথ হয়ে ডিরেক্টরগণ এই ভেবে নিজেদের মনকে প্রবোধ দিলেন যে, গভর্নর হেজেস তিন সপ্তাহ আগে রওয়ানা হওয়ায় হয়তো ইতিমধ্যেই ভিনসেন্টকে বিতাড়িত করেছেন এবং পিটকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা "লুণ্ঠনকারীদের বিনাশ" সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলেন এবং বিশ্বাস করেছিলেন যে, তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে "সকল মানুষের মনে এমন

একটি শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে যে, এইসব লোকের দর্প ও মূর্খতা সম্পর্কে এই বিভ্রান্ত জগতের সকল সন্দেহের নিরসন হবে।"

"ডিফেন্স" ও "ক্রাউন" জাহাজ দু'টোর পাল্লা শুরু হলো। ছয় মাসের পথে তিন সপ্তাহের আগে-পিছে যাত্রা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবধান হলেও প্রতিযোগিতায় পূর্বগামী জাহাজটিকে পরাভূত করা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিলো না। টমাস পিটের "ক্রাউন" জাহাজটি ছিলো অত্যন্ত দ্রুতগামী। দু'মাসের মধ্যেই "ক্রাউন" থেকে "ডিফেন্স" দৃষ্টিগোচর হলো। আইনানুগ কর্তৃত্ব নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে "ডিফেন্স" অগ্রসর হচ্ছিলো—কি বিপদ তাকে ধাওয়া করছে, সে-সম্পর্কে সে উদাসীন। "ক্রাউন" অনায়াসেই বৃহদাকার ও স্থূলকায় "ডিফেন্স"কে পেছনে ফেলে ৮ই জুলাই বালাশোরে এসে নোঙ্গর করলো। এর এগারো দিন পর ডিফেন্স দৃষ্টিগোচর হলো। জলদস্যুদের পক্ষে ঐ সময় প্রতিটি দিনের মূল্য অপরিসীম। পিট যে সুবিধা অর্জন করেছিলেন, তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে এতোটুকুও বিলম্ব করলেন না। তিনি প্রচার করে দিলেন যে, একটি নয়া কোম্পানী গঠিত হয়েছে এবং তিনি তার এজেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন। একদল পর্তুগীজ ও এদেশী সৈন্য এবং ভেরিবাদকসহ তিনি তিনটি জাহাজে করে ইংরেজ কোম্পানীর একজন গবর্নরের বেশে শান-শওকতের সাথে হুগলী এসে পৌঁছুলেন। ভিনসেণ্টের ওপর ডিরেক্টর-সভার কোনো আস্থা নেই এবং যে-কোনো সময় তাঁর পদাবনতি হতে পারে—এ-কথা চিন্তা করে তিনি ভাগ্যান্বেষী ভ্রাতুষ্পুত্রের দলে যোগদান করলেন এবং উভয়ে মিলে হুগলীর স্থানীয় শাসনকর্তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কতকগুলো বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করলেন এবং এক পরওয়ানা বলে নয়া কোম্পানীর নামে কুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করলেন।

উপসাগরীয় অঞ্চলে ইংরেজ কুঠিগুলোর প্রথম গভর্নর উইলিয়াম হেজেস এরূপ বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এখানে উপনীত হলেন। তাদের এরূপ অবস্থা দেখে শায়েস্তা খাঁ হয়তো মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন।

তাঁর কাছে হেজেস আবেদন জানালেন। আলোচনা শুরু হলো। কিন্তু তার আর শেষ হয় না। সূক্ষ্ম বুদ্ধি মোগল শাসনকর্তাও চেয়েছিলেন যে, ইংরেজদের মধ্যে এরূপ বিরোধ অব্যাহত থাক। পিট তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়ায় শাসনকর্তা যে-পরিমাণ অর্থ দাবী করলেন, ইচ্ছা করেই তা তিনি পরিশোধ করে দিলেন। কোম্পানীর গবর্নর অবশেষে মোগল শাসনকর্তার কাছ থেকে পিট ও তার অনুচরদের গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করিয়ে নিতে সমর্থ হন। তাদের গ্রেফতার করার জন্যে হুগলীর মোগল শুল্ক কর্মচারী বালচন্দ্র দাস ও স্থানীয় মোগল শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো। কিন্তু পিট আরো অধিক অর্থদান করায় গ্রেফতারী পরোয়ানা আর কার্যকরী করা হলো না। দলবল সহ তাকে বিতাড়িত করে কোম্পানীর পথের কণ্টক অপসারিত করার ও এর উন্নতির পথে সাহায্য করার কোনো ইচ্ছাই শায়েস্তা খাঁর ছিলো না।

পরের বছর "জলদস্যু" বণিকেরা এমন এক কাণ্ড করে বসলো, যেটিকে ডিরেক্টরগণ "চূড়ান্ত ধৃষ্টতা" বলে অভিহিত করেন। জনৈক ক্যাপ্টেন এ্যালি বিরাট আড়ম্বরের সাথে হুগলী আগমন করেন। ভদ্রলোক "দামী জরি লাগানো লাল রঙের পোশাক পরিধান করেছিলেন। তাঁর সম্মুখে মাথায় নীল রঙের টুপি এবং লাল পাড় লাগানো কোট পরিহিত দশজন বন্দুকধারী ইংরেজ। তাদের সম্মুখে ছিলো ৮০ জন পিয়াদা। ক্যাপ্টেনের সামনে দু'টি পতাকা। যেনো কোম্পানীর প্রতাপশালী প্রতিনিধি।" এই বেশে তিনি হুগলীস্থ শাসনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করার মতো ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করলেন। হেজেস তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেন যে, তিনি ব্যতীত কুঠির গণ্যমান্য সবাই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। তিনি প্রকাশ্যভাবেই মোগল শুল্ক কর্মচারী বালচন্দ্র দাসের সাথে আলাপ আলোচনা করলেন এবং যাবতীয় আমদানী ও রফতানী পণ্যের ওপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা করে শুল্ক দিতে সম্মত হলেন। অবশেষে হেজেস লুটেরা দলের ক্যাপ্টেনদের গ্রেফতার করে ঢাকায় যাতে তাদের প্রেরণ করা হয়,

সেই মর্মে শায়েস্তা খাঁর কাছ থেকে এক হুকুমনামা জারি করাতে সমর্থ হন। হুগলীর মোগল শাসনকর্তাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু বালচন্দ্র দাসের কাছে পিটের দলের মূল্য ছিলো অনেক বেশী। তিনি অত সহজে শিকার হাতছাড়া হতে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। শায়েস্তা খাঁর কাছে এক জরুরী আবেদনে তিনি জানালেন যে, এরা তাঁর শত্রু নয়। পুরানো কোম্পানীরই সব দোষ। তারা একচেটিয়া ব্যবসায় করতে চায় বলেই গোলযোগ পাকাচ্ছে। পিটের দলের লোকেরাও ব্যবসায়ী এবং তারা শত-করা পাঁচ টাকা করে শুল্ক দিতে রাজি আছে। তাঁর এলাকা থেকে উপকারী ও দরকারী প্রজাদের কেন তিনি তাড়িয়ে দিবেন? তাঁর সুচতুর শুল্ক অফিসারের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করতে শায়েস্তা খাঁর সময় লাগলো না এবং পুরানো কোম্পানী প্রদত্ত পরওয়ানা সত্ত্বেও পিটের দল তাঁর পক্ষ থেকে কোনো বাধা বা অসুবিধা ভোগ করলো না। হুগলী নদীর তীরস্থ কুঠিতে হেজেস গভর্নর পদে নিযুক্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই কোম্পানীর ব্যবসায়ে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, 'কাউন্সিলকে' এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে, "এখন এজেন্টের স্বয়ং ঢাকায় গিয়ে নওয়াব ও দেওয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করে শুল্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে ফায়সালা করে লুটেরা বণিকদের এই অঞ্চলে বাণিজ্য পরিচালনায় বাধা দেওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।" এজেন্টের সাথে ঢাকায় গমন করার জন্যে রিচার্ড ট্রেঞ্চফিল্ড ও উইলিয়াম জনসনকে মনোনীত করা হলো। ডিরেক্টরদের অনুগ্রহভাজন ও প্রভাবশালী জব চার্নকের সাথে আলোচনা করার জন্যে কাসিম বাজার হয়েই ঢাকা গমন সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হলো।

গভর্নর ঢাকা যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। উপসাগরীয় অঞ্চলস্থ ইংরেজ কুঠিগুলোর অধ্যক্ষের যোগ্য সর্বপ্রকার শান-শওকতের ব্যবস্থা করা হলো। দুটো বজরা এবং পরিচারক ভৃত্যদের জন্যে কয়েকটি ছোট নৌকা ঠিক করা হলো। ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর যাত্রার প্রথম পর্যায়ে তাঁরা হুগলীর উত্তরে কোম্পানীর বাগানবাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন।

গভর্নর হেজেসের সঙ্গে রইলেন ট্রেঞ্চফিল্ড ও জনসন—আরও রইলো তেইশ জন ইংরেজ ও পনেরো জন রাজপুত সৈন্য। স্থানীয় কর্মচারিগণ অনুমান করেছিলেন যে, কোম্পানীর এইসব কর্মচারীকে শায়েস্তা খাঁ কোনো মতেই সাদরে গ্রহণ করবেন না। তাই তাঁরা যাত্রার প্রারম্ভেই নানা প্রকার বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করতে লাগলেন। বালচন্দ্র দাসের একান্ত বশংবদ পরমেশ্বর দাস প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের নৌকা আটক করার জন্যে লোক পাঠান। দু'টো নৌকা আটক রাখা হলে ইংরেজগণ বলপ্রয়োগে সে দু'টোকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। এতে করে পরমেশ্বর দাস হাতের কাছে যে-সব মাঝি ও পদাতিক সৈন্যকে পেলেন, তাদের সবাইকে মারধর করলেন। কোম্পানীর গভর্নরের অনেক এ-দেশী অনুচরকে ভয় দেখিয়ে ও ঘুষ দিয়ে তিনি হাত করলেন। গবর্নর প্রতিবাদ জানালেন কিন্তু কোনো ফল হলো না। পাঁচ দিন ধরে তাঁকে আটক থাকতে হলো। কিছুতেই রওয়ানা হতে পারলেন না। কারণ, পরমেশ্বর দাসের অনুচরেরা তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছিলো এবং তিনি যাত্রা করামাত্রই হয়রানি শুরু করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিলো। অবশেষে ১৪ই অক্টোবর গভীর রাত্রে অন্ধকারে আত্মগোপন করে ইংরেজ কুঠির মহামান্য গবর্নর পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। হেজেসের নিজের লেখায় এই কাহিনীটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "সংকল্প নিলাম যে, এভাবে আর অপমানিত হওয়া চলবে না। মাল বোঝাই জাহাজগুলো জনসনের তত্ত্বাবধানে আগেই পাঠিয়ে দিলাম। সারারাত কোনো স্থানে না থেমে যথাসম্ভব ত্বরিৎগতিতে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। তাদের পর চললো সৈন্য ও অন্যান্য অনুচরগণ। এর পর আমি যাত্রা করলাম। সবার শেষে শক্তিশালী একজন ইংরেজ ও একজন স্পেনীয় একটি হালকা দ্রুতগামী নৌকায় রওয়ানা হলো। দু' ঘন্টা রাত বাকী থাকতে অস্ত্রধারী লোকভর্তি একটা নৌকা স্পেনীয়টির খুব কাছে এসে গেলো। স্পেনীয়টি তাদের পরিচয় দাবী করে তাদের থামতে বললো।

কিন্তু অপর পক্ষ জওয়াব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না। স্পেনীয়টি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করলো। ফলে ওরা ভীত হয়ে পড়ে। এক ঘন্টা পর আমরা এসে ত্রিপানীতে পৌঁছুলে ঐ সশস্ত্র নৌকাটি আবার স্পেনীয়টির কাছাকাছি এসে গেলো। সে হুশিয়ার করে দেয় যে, তারা যদি সরে না যায় তবে সে গুলী করবে। নৌকাটি পেছনে সরে গেলো। আমরা ঐ স্থানে থাকবো না বুঝতে পেরে তারা আর উত্যক্ত করতে আসেনি।"

ইংরেজ কুঠিগুলোর গবর্নরের প্রথম যাত্রাটি এমনি বিড়ম্বনার মধ্যেই শুরু হয়েছিলো। অনুকূল বায়ুপ্রবাহের ফলে ঢাকায় পৌঁছুতে মাত্র এগারো দিন লাগে। হেজেস ২৫শে অক্টোবর ঢাকায় উপনীত হয়েছিলেন। তখন বর্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং নদীগুলো কানায় কানায় ভর্তি। হুগলী থেকে জলঙ্গী ও সেখান থেকে ঢাকায় আসতে তাঁদের গঙ্গা ও পূর্ববঙ্গের বহু নদনদী অতিক্রম করতে হয়েছিলো। তাঁদের নৌকাগুলো ছিলো প্লাবিত নদীসমূহে সহজে চলার উপযোগী। কলকাতার গরম আর অসুবিধা ভোগের পর এরূপ একটি যাত্রা সত্যই খুব আরামদায়ক। বর্ষাকালে নদীতে সব সময় হাওয়া থাকে। এই ঠাণ্ডা হাওয়া ও আরাম নিশ্চয় যাত্রীদের মনে বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সৃষ্টি করে থাকবে। আর নৌকাগুলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিলো। হেজেস এই যাত্রার সকল আকর্ষণ ও নূতনত্ব পূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলেন। পাল তুলে দেওয়া হয়েছিলো অনুকূল হাওয়ায়। বিচিত্র গঠন ও ধরনের দেশী নৌকাগুলো চিত্র-বিচিত্র পাল তুলে উজানে-ভাটিতে চলাচল করছিলো। স্বদেশ থেকে সদ্যাগত গবর্নর হেজেসের কাছে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা ও আকর্ষণের উৎস হয়ে দাড়ায়। নদী-বক্ষে প্রবাহিত সেই বিচিত্র জীবন-ধারা। ধীবরগণ অনুসরণ করে যাচ্ছে তাদের যুগ-যুগান্তের পেশা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙিতে চড়ে বিরাটাকার জাল দিয়ে অদ্ভুত দক্ষতার সাথে তারা মৎস্য শিকার করে। নদীর বুক চিরে দৃপ্তভঙ্গীতে এগিয়ে চলছে বড়ো

বড়ো মালহাহী নৌকা। নিঃসন্দেহে এসব নৌকায় ঢাকা থেকে পণ্য নিয়ে হুগলী পাঠানো হচ্ছে। সেখানে কোম্পানীর জাহাজ ভর্তি হয়ে এগুলো ইংলণ্ডে চালান হবে। দুপুরে মাঝিরা আহারের জন্যে বিশ্রাম নেয়, আর "সাহেব লোগ" নদীর পাড়ে গাছের নীচে বসে আহার্য গ্রহণ করে এবং কিছুক্ষণের জন্যে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে আরাম নেয়। সন্ধ্যা বেলায় দাঁড়-টানা। আর রাত নেমে এলে মাঝিরা তীর ঘেঁসে গুন টানতে লেগে যায়। গুন টানে আর সাথে সাথে বিচিত্র ধরনের গান গেয়ে চলে, যাতে করে বন্য হিংস্র পশুরা ভয়ে পালিয়ে যায় এবং শ্রমের ক্লান্তিরও কিছুটা লাঘব হয়।

হেজেস ও তাঁর সঙ্গীরা ২৫শে অক্টোবর ঢাকায় উপনীত হলেন। ঢাকার সেই ঐশ্বর্যময় ও চোখ-ধাঁধানো রূপ তাঁদের তাক লাগিয়ে দিলো। নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিলো লালবাগ কেল্লার গগনচুম্বী মিনার ও বুরুজগুলো। নদী তখন কেল্লার প্রাচীর ঘেঁসে বয়ে যাচ্ছিলো। আওরঙ্গজেব-তনয় শাহ্‌জাদা মোহাম্মদ আজীম তাঁর সুবেদারী আমলে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এই কেল্লাটির পত্তন করেছিলেন। এর অদূরেই আকর্ষণীয় ও সুউচ্চ বড় কাটরা প্রাসাদ। চল্লিশ বছর আগে শাহ্ শুজা এটি নির্মাণ করেছিলেন। নদীর তীরে এটিই ছিলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য। এর সুউচ্চ মূল ফটকটি অতি উচ্চাঙ্গের গঠনশৈলীর একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এর বিরাটত্ব ও স্থপতি-বৈভব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ফটকের দু'পাশে কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশপথ। মূল ফটক ও অষ্টকোণী গম্বুজটির মুখ নদীর দিকে। পাশেই অবস্থিত শায়েস্তা খাঁ নির্মিত ছোট কাট্‌রা। আকারে ক্ষুদ্রতর হলেও সৌন্দর্যের দিক থেকে বড় কাট্‌রা অপেক্ষা মোটেই হীন নয়। মহান সুবেদার শায়েস্তা খাঁর নামে যে স্থপতি-শৈলী পরিচিত হয়ে এসেছে তারই আদর্শে ছোট কাট্‌রা নির্মিত হয়েছিলো। এর পেছনেই অবস্থিত চক আর তার মনোরম মসজিদটি। শায়েস্তাখানী আদর্শে এই মসজিদটিও নির্মিত হয়েছিলো। আরও পেছনে

রয়েছে হোসেনী দালান। চল্লিশ বছর আগে শাহ্ শুজার আমলে এটি তৈরি হয়। আরো দূরে অবস্থিত ঢাকার প্রথম গৌরবের দিনে নির্মিত ঈদগাহ্। নদীর আরো উজানে—অবশ্য নদীটি এখন সরে গেছে—শায়েস্তা খাঁর তৈরি মনোরম সাত গম্বুজ মসজিদ। শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তারিত ছিলো অসংখ্য রাজপথ, জনপদ ও সৈন্য-শিবির। শহরের কাছে নদীতে ছিলো সুবেদারের শাহী বজরা এবং সাত শত রণতরীর নাওয়ারা বা নৌবহর। এই রণপোতগুলো মগদের রাজ্য জয় করে কিছুদিন পূর্বে ফিরে এসেছিলো।

এখন যেখানে কলেজটি অবস্থিত, সেস্থানেই ছিলো ইংরেজদের কুঠি এবং হেজেস এখানেই অবস্থান করেন। অবশ্য কুঠির অস্তিত্ব অনেকদিন আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কুঠিটির নির্মাণে কোনো চাকচিক্য ছিলো না এবং একমাত্র কারবারের উপযোগী করেই এটি তৈরি হয়েছিলো। বর্তমানে ঢাকার নওয়াব-প্রাসাদ যেখানে রয়েছে, সেখানে ছিলো ফরাসীদের কুঠি। ওলন্দাজ-দের কুঠি ছিলো নদীর পাড় ঘেঁষে—এখন যেখানে মিটফোর্ড হাসপাতাল। মনে হয়, শায়েস্তা খাঁ লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে কোনো এক প্রাসাদে বাস করতেন। গবর্নর হেজেস এখানেই সুবেদারের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর মালিক কোম্পানীর জন্যে অধিকতর সুবিধাজনক শর্ত প্রার্থনা করেন। সাক্ষাৎকারে শায়েস্তা খাঁ কূটনৈতিক চাল খেললেন। ইংরেজদের অনেক আপ্তবাক্য শোনালেন। অনেক মিষ্টি কথা বললেন এবং তাদের জন্যে সুবিধাজনক শর্ত মনজুরের প্রতিশ্রুতি দান করলেন। অবৈধ ব্যবসায়ী বা লুটেরাদের আর মোটেই সমর্থন করা হবে না। ব্যবসায়ীদের আর নির্যাতন করতে দেওয়া হবে না এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থের অধিক কিছুই আদায় করতে দেওয়া হবে না। জমকালো পরিবেশে ও শাহী কায়দায় আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং আলোচনার অগ্রগতিতে হেজেস উৎফুল্লবোধ করেন। শায়েস্তা খাঁ খুব মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। ঢাকায় দেড় মাস ধরে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে কোম্পানীর

গবর্নর ও দূত হেজেস পরম পরিতুষ্টির সাথে ঢাকা ত্যাগ করলেন। শায়েস্তা খাঁর মিষ্টি কথায় আহ্লাদিত হয়ে লিখে পাঠালেন, 'আমার ঢাকা গমনের সাত মাস সময়ের মধ্যে একটি ফরমান সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত', বর্তমান ও বিগত তিন বছর ধরে সকল আমদানী পণ্যের ওপরই শতকরা ৫৲ টাকা করে যে শুল্কের দাবী করে আসা হচ্ছে, তা প্রত্যাহার করানো সম্ভব হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে সাধারণতঃ শতকরা দেড় টাকা হিসেবে যে-শুল্ক দেওয়া হয়ে এসেছে, তার ওপর আরও ৫৲ টাকা দাবী করা হচ্ছিলো। তৃতীয়ত, আমাদের যেসব পণ্যের চলাচল সাধারণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো, এখন থেকে সেগুলো পূর্ববৎ অবাধে চলাচল করানো যাবে। চতুর্থতঃ, পরমেশ্বর দাসকে তার স্থান থেকে অপসারিত করার হুকুমনামা মনজুর করাতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের কাছ থেকে জোর করে যে-সব অর্থ আদায় করা হয়েছে, সেগুলো প্রত্যর্পণ করা হবে। পঞ্চমতঃ, আমাদের জন্যে বাদশাহের কাছ থেকে একটি ফরমান সংগ্রহের যৌক্তিকতা নওয়াবকে উপলব্ধি করাতে সমর্থ হয়েছি।...হে মহামহিম কোম্পানী, এই ফরমান হস্তগত করার মতো পরমায়ু যদি ঈশ্বর আমায় দেন, তবে কোম্পানীকে আর লুটেরা বণিকদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হতে হবে না। আমার ঢাকা সফরের ফলে যে আশাতীত ও মহান সাফল্য অর্জন করেছি, তজ্জন্য ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।'

নবাগত হেজেস ভারতীয় কূটনীতির কুটিল ধারার খবর রাখতেন না। কিন্তু যে উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে তিনি তাঁর ঢাকা সফরের সাফল্যের কথা বর্ণনা করেছিলেন, তা নিবে যেতে দেরি হলো না। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। সব কিছুই আগের মতোই চলতে থাকলো। শায়েস্তা খাঁর সকল প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বালচন্দ্র দাস ও তাঁর অনুচর পরমেশ্বর দাসের শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত রইলো। গবর্নর হেজেস অচিরেই উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর ঢাকা সফরের ফলে কতকগুলো প্রতিশ্রুতি ও মিষ্টি কথা ছাড়া আর কিছুই তিনি পাননি। তাঁর ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে তিনি আশার যে বিরাট সৌধ গড়ে তুলেছিলেন, তা যখন ধূলিসাৎ হয়ে গেলো তখন কোম্পানীকে লিখিত

পত্রে ক্রুদ্ধ হয়ে শায়েস্তা খাঁকে 'বুদ্ধিভ্রষ্ট অথর্ব নওয়াব' বলে বর্ণনা করলেন। কিন্তু নওয়াব যে ইংরেজ বণিকদের পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণভাবে সজাগ ছিলেন, তা হেজেস অপেক্ষা আর কেউ বেশি করে উপলব্ধি করতে পারেননি। হুগলীতে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে শায়েস্তা খাঁর কাছে যে সংবাদ আসতে লাগলো, তিনি বেশ আগ্রহভরে সেগুলো শুনতে থাকেন। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে খবর এলো যে, কোম্পানী হেজেসকে পদচ্যুত করে জন বিয়ার্ডকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছে। দ্বিতীয়তঃ, উপসাগরাঞ্চলীয় কুঠিগুলোকে আবার ফোর্ট সেণ্ট জর্জের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়েছে এবং গিফোর্ড করমণ্ডল উপকূল ও বঙ্গোপসাগরাঞ্চলের কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু গিফোর্ড অচিরেই বাংলাদেশ ত্যাগ করলেন। জন বিয়ার্ড তাঁর পদের গুরুদায়িত্ব ও দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে পড়েন এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন।

ঠিক এই সময় থেকেই বাংলায় ইংরেজদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। পরিবর্তনই একটা ক্ষুদ্র বাণিজ্য কোম্পানীকে একটা বিরাট রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ইংরেজ কুঠির কর্তাগণ ক্রমশঃই উপলব্ধি করতে থাকেন যে, যে মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তি ও কর্তৃত্বের ওপর তাঁরা এতোটা ভরসা করেছিলেন, তা এখন নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। দিল্লীর বাদশাহ্‌র কাছ থেকে তাঁরা ফরমান সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু ঢাকার সুবেদারের কাছে এসে এই সব ফরমান পুনঃ পুনঃ অকেজো হয়ে গেছে। সুবেদারও আবার তাঁর কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণ বন্ধ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। উপসাগরীয় অঞ্চলস্থ ইংরেজদের মধ্যে ধীরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এরূপ অবস্থায় তাদের কাছে দু'টি মাত্র পথ খোলা ছিলো। বাংলাদেশের ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলা, কারণ মোগলশক্তি তাদের আশ্রয়দানে অক্ষম; অথবা প্রয়োজনবোধে স্থানীয় শাসনকর্তাকে অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি সঞ্চয় করা। নিজেদের অস্তিত্ব

রক্ষার জন্যে ইংরেজদের নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর অপরিহার্যতা সম্পর্কে যাঁরা দৃঢ়মত পোষণ করতেন, গবর্নর হেজেস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। এবং তিনি উপসাগরের মোহনাস্থ সাগর দ্বীপে একটি দুর্গ স্থাপন করে লুটেরা বণিক ও মোগলদের মোকাবেলার ব্যবস্থা করার জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারংবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। লুটেরাদের দৌরাত্ম্য থেকে কোম্পানীর বাণিজ্যকে রক্ষা এবং কুঠিগুলোর নিরাপত্তা বিধানের অজুহাতে প্রেসিডেন্ট গিফোর্ড গঙ্গার মোহনায় এরূপ একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করে ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁর কাছে আবেদন জানান। কিন্তু শায়েস্তা খাঁ দুর্গ নির্মাণের প্রস্তাবে সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং অনুমতিদানে বিরত থাকেন। তখন এ-কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো যে, যা কিছু করা দরকার, তা ঢাকাস্থ সুবেদারের বিনানুমতিতেই করতে হবে।

কিন্তু প্রথমের দিকে কোম্পানী খুব ভয়ে ভয়ে চলতো এবং মোগল-শক্তির সাথে বিরোধিতা করার মতো চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কারণ মোগল-শক্তির সেই দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা তখনও তাদের মন থেকে মুছে যায়নি। এতদ্সত্ত্বেও তারাও এ-কথা মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, হয় পাতুতাড়ি গুটানো, নয়তো সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ—এ-দুটো ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই। তাদের চিরাচরিত সাবধানতাসহ তারা কতকগুলো আধা-ব্যবস্থা গ্রহণ করলো এবং মূল সমস্যাটিকে পরিহার করে চট্টগ্রাম আক্রমণের সুপারিশ করতে লাগলো। রাজা দ্বিতীয় জেম্সের নিকট থেকে শায়েস্তা খাঁ ও তাঁর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি আদায় করে ডিরেক্টর-সভা বঙ্গোপসাগরে তাদের বৃহত্তম সামরিক শক্তি প্রেরণ করলো। দ্বিতীয় জেম্স তখন সিংহাসন রক্ষার ব্যাপারে এতো ব্যস্ত ছিলেন যে, এতো দূরদেশে কোম্পানীর দুঃসাহসিক কার্যে আগ্রহবোধ করতে পারেননি। কোম্পানী প্রতিটি জাহাজে ১২টি থেকে ৮০টি কামানসহ দশটি যুদ্ধ-জাহাজ এবং ছয়শত সৈন্যের একটি বাহিনীকে প্রেরণ করলো। ভাইস-এ্যাডমিরাল নিকলসনকে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করা হলো। আরো চারশত

সৈন্য দিয়ে এই বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে মাদ্রাজস্থ কোম্পানীর গবর্নরকে নির্দেশ দেওয়া হলো। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিলো চট্টগ্রাম দখল করে সেটিকে উপসাগরের পূর্বাঞ্চলে কোম্পানীর অস্ত্রাগারে পরিণত করা—পশ্চিম উপকূলে ফোর্ট সেন্ট জর্জের ক্ষেত্রে যেমন করা হয়েছিলো। ঢাকা থেকে আরো দূরবর্তী স্থানে একটি অধিক শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে সেখান থেকে ক্রমশঃ হুগলী পর্যন্ত অভিযান সম্প্রসারিত কবার উদ্যম গ্রহণ করা হয়। চট্টগ্রামে তাদের শক্তি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওযার সাথে সাথেই তারা ঢাকায় রওয়ানা হবে এবং শায়েস্তা খাঁকে তাদের খুশিমত শর্ত মনজুর করতে বাধ্য করবে—কোম্পানীর সেনাবাহিনীকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া ছিলো।

একটা ভীতু ও ভীরু কোম্পানীর পক্ষে হঠাৎ এরূপ স্পর্ধিত পদক্ষেপ বিস্ময়কর বটে। ঐ সঙ্কট-সময়ে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন ছিলো, কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের তৎসম্পর্কে কোন ধারণাই ছিলো না। দোর্দণ্ড-প্রতাপ মোগলদের শক্তির ভয়ে বহুদিন ধরে চরম ভীত-কম্প্র হয়ে থাকার পরে অকস্মাৎ যখন ডিরেক্টরগণ মোগলদের অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠলো, তখন তারা আর একটা চরম পথে ধাবমান হলো। তারা যেনো বল্গাহীন হয়ে গেলো এবং আলোচনা হতে লাগলো যে, কোম্পানীর সৈন্যগণ ঢাকায় গিয়ে সুবেদারকে কোম্পানীর ব্যবসায়ের সুবিধাজনক শর্ত মনজুর করতে বাধ্য করবে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শ্রেষ্ঠতম সুবেদার শায়েস্তা খাঁর প্রাসাদে বসে এরা তাঁকে কোম্পানীর সুবিধাজনক শর্ত বলে দেবে এবং তা মঞ্জুর করতে বাধ্য করবে। নিজেদের শক্তি সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই অভিযান প্রেরিত হলো। কিন্তু সূচনাতেই এটিকে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হলো। প্রতিকূল বায়ুর জন্যে এর যাত্রা বিলম্বিত হতে লাগলো এবং ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করে ভাইস-এ্যাডমিরাল অবশিষ্ট ক'টি জাহাজ নিয়ে বঙ্গোপসাগরের পথে রওয়ানা হলেন। জাহাজ ক'টির নাম ছিলো 'বিউফোর্ট' 'ন্যাথনিয়েল' এবং রোচেস্টার'। হুগলীতে এসে এগুলো নোঙর

করলো। মাদ্রাজ থেকে প্রেরিত চারশত সৈন্য এবং এদেশী খ্রীস্টানদের নিয়ে গঠিত একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে জব চার্নক এখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ইংরেজগণ এসব 'নেটিভ' খ্রীস্টানদের 'ভেরি সরি ফেলোজ' বলে অভিহিত করতো। বস্তুতঃ সংখ্যায় যতো নগণ্যই হোক না কেন, বাংলায় বৃটিশ সৈন্যদের আগমন শায়েস্তা খাঁকে সচকিত এবং ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার পদাতিক ও তিনশত অশ্বারোহী সেনার এক বিরাট বাহিনীকে হুগলীর শাহী দুর্গে প্রেরণ করলেন। ইংরেজদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করাই তাঁর লক্ষ্য ছিলো। তাঁদের শক্তি এভাবে বৃদ্ধি হওয়ায় মোগল কর্মচারিগণ উদ্ধত মনোভাব গ্রহণ করলেন। ইংরেজদের ব্যবসায় বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং স্থানীয় বাজারে ইংরেজ-সেনাদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। ইংরেজ-সেনাদের কার্যতঃ অবরোধাবস্থায় দিন কাটাতে হলো। পরিস্থিতি এমন বিস্ফোরণমুখী হয়ে উঠলো যে, একটা সামান্য ঘটনাই প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। ২৮শে অক্টোবরে সে-ঘটনা ঘটে গেলো। তিন জন ইংরেজ সৈন্য জিনিসপত্র কেনার জন্যে বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু বিক্রেতাগণ তাদের কাছে কোনো জিনিস বেচতে অস্বীকার করলো। সৈন্যগণ এতে প্রতিবাদ জানায়। স্থানীয় শাসনকর্তার লোকজন এসে তাদের প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করে এবং অবশেষে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সংবাদটি ইংরেজ-কুঠিতে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়লো। জব চার্নক এমন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হলো। শত্রুপক্ষের কামান-শ্রেণী দখল করা হলো। স্থানীয় শাসনকর্তা পলায়ন করলেন। ইংরেজ সৈন্যগণ 'সমস্ত রাত ও পরদিন পর্যন্ত গুলীবর্ষণ ও আক্রমণ চালিয়ে গেলো' এবং মোগল শাসকের একটি জাহাজ দখল করলো। তারা উপকূলভাগে ঘন ঘন আক্রমণ চালালো এবং যা-কিছু পেলো লুণ্ঠন করলো ও অবশিষ্ট সব কিছু জালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো। কিন্তু

জব চার্নক আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে এরূপ বিপজ্জনক স্থানে অবস্থান করা সঙ্গত মনে করলেন না। তিনি হুগলী নদীর মোহনাস্থ হিজলী দ্বীপে ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

শায়েস্তা খাঁ এই সংবাদ পাওয়ামাত্রই ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। দূরবর্তী কুঠিগুলোর এজেন্টদের আটক করা হলো এবং হুগলী-ঘাঁটির শক্তিবৃদ্ধির জন্যে একটা বিরাট পদাতিক সেনাদল প্রেরিত হলো। ঢাকাস্থ কোম্পানীর এজেণ্ট ওয়াট্‌সের অবস্থাও করুণ হয়ে উঠলো; তাঁর বিরুদ্ধে যে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তা শায়েস্তা খাঁর উদারতা ও মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। অবশ্য এ-ব্যাপারে ওয়াট্‌সের হিন্দু বন্ধু বড়মলের কিছুটা হাত ছিলো; বড়মল ছিলেন শায়েস্তা খাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি তাঁর প্রভুকে বুঝালেন যে, হুগলী-কুঠির কুকীর্তির জন্যে ঢাকার কুঠিকে দায়ী করা চলে না এবং ওয়াট্‌স শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে লিপ্ত হননি। ঢাকার এজেন্ট এভাবে রেহাই পেলেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ওয়াট্‌স বড়মলসহ হুগলী অভিমুখে যাত্রা করলেন। শায়েস্তা খাঁ বড়মলকে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে প্রেরণ করেন। চার্নক হুগলী থেকে সুতানুটিতে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে বড়মলের মাধ্যমে শায়েস্তা খাঁর কাছে তাঁর দাবী-দাওয়া পেশ করলেন। একটি দুর্গ নির্মাণের সেই পুরাতন দাবী তো রইলোই—তৎসঙ্গে কুঠিগুলোর ক্ষতিপূরণ, টাকশাল স্থাপন এবং বাণিজ্যিক স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করা হলো। এসব দাবী পেশ করা হলে শায়েস্তা খাঁ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী মিষ্টি কথায় জানিয়ে দিলেন যে:না সবই মনজুর করা হবে। শান্তির শর্তাবলী আলোচনার জন্যে তিনি বড়মলসহ আরো দুই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। বর্তমান কলকাতার উত্তরাংশে সুতানুটিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। ইংরেজদের দাবী সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রণীত ও সম্পাদিত হলো; শায়েস্তা খাঁর চুক্তিপত্রটি তাঁর কাছে প্রেরিত হলো এবং তার সাথে জব চার্নক অনুরোধ জানালেন যে, সম্রাট স্বয়ং যেন এটি অনুমোদন করেন।

কিন্তু ত্রিশ বছর ধরে ভারতীয় জীবনধারার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও ভারতীয় কূটনীতির কুটিল গতিধারা সম্পর্কে জব চার্নকের শিক্ষার আরো বহু কিছু বাকি ছিলো। কাগজে-কলমে লিখিত দাবীসমূহ শায়েস্তা খাঁর কাছে পেশ করা হলে তিনি নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। নগণ্য কোম্পানী প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তার কাছে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবী পেশ করতে পারে, একথা মনে করতেই বৃদ্ধ স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার রোষাগ্নি পূর্ণমাত্রায় জ্বলে উঠলো। আসলে তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে এতোদিন ধরে কাল-ক্ষেপ করে যাচ্ছিলেন মাত্র। তিনি সুবে বাংলা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম জারী করলেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের গ্রেফতার ও কুঠি-গুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে চতুর্দিকে নির্দেশ দেওয়া হলো। হুগলীর ইংরেজদের সমুদ্রে বিতাড়িত করার হুকুম দেওয়া হলো। ঢাকার প্রতি-ক্রিয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্রই চার্নক হিজলী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করার পূর্বে যতখানি সম্ভব লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেলেন। হুগলীস্থ শাহী অফিস-আদালত পুড়িয়ে দিলেন এবং থানাস্থ দুর্গগুলো অধিকার করলেন। কিন্তু ধ্বংসলীলা বেশীদিন চালানো সম্ভব হলো না। বিফলমনোরথ হয়ে হিজলীতে তিনি পশ্চাদপসরণ করলেন।

কোম্পানীর আমলাদের পশ্চাদপসরণে শায়েস্তা খাঁ মনে মনে বোধ করি খুশীই হয়েছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশের সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জায়গা তারা বেছে নিয়েছিলো। বছরের সবচেয়ে কষ্টদায়ক দিনগুলো তাদের সেখানে কাটিয়ে দিতে হলো। শায়েস্তা খাঁ জানতে পেলেন যে, ইংরেজ-সেনাদের বেশীর ভাগই ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ করেছে। যারা বেঁচে আছে, তাদের অত্যন্ত হালকা কাজ করারও সামর্থ্য নেই। তিনি হয়তো এদের বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে তাঁর পক্ষে অযোগ্য কাজ বলে মনে করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিলেন। স্থানীয় মোগল সেনানায়ক তাদের উত্যক্ত করে তুলেছিলেন এবং বার বার তাড়া করে তাদের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলেছিলেন বটে; কিন্তু

শায়েস্তা খাঁ তাদের মোটেই আমলে আনেননি। অবশ্য বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল শত্রুতাচরণ করে গেছেন। তা যদি সত্য হতো তবে তাদের বাংলাদেশ থেকে চিরতরে উৎখাত করে দিতে সামান্যতম বেগও তাঁকে পেতে হতো না। তাদের এরূপ সঙ্গীনাবস্থার কয়েক মাস পরেই তিনি তাদের উলুবেড়িয়া পর্যন্ত আসতে এবং নির্বিঘ্নে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাতে দিয়েছিলেন। শায়েস্তা খাঁর এরূপ উদার ব্যবহারের দ্বিবিধ কারণ থাকতে পারে। বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ রুষ্ট হয়ে সুরাট থেকে সরে গিয়ে প্রকাশ্যে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জলযুদ্ধে তাদের দক্ষতার দরুন তারা মোগলদের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রায় পঙ্গু করে ফেলে এবং হজ্বযাত্রীদের মক্কা গমনে বাধার সৃষ্টি করে। আওরঙ্গজেব তখন হায়দরাবাদ জয়ের ব্যাপারে খুব ব্যস্ত ছিলেন। অন্যত্র যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করার জন্য ইংরেজদের সাথে শান্তি স্থাপনে উৎসুক হয়ে পড়েছিলেন। বোম্বাইয়ের দিকে তারা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো, সেগুলো প্রত্যর্পণ করা হলো। বাংলাদেশেও ঐ সব সুবিধা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে সম্রাট শায়েস্তা খাঁর কাছে এক নির্দেশ পাঠালেন। সম্রাটের হুকুমনামা ঠিক সময়-মতোই এসেছিলো। যার ফলে চার্নক এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণ বাঁচলো। তথাপি ঢাকা থেকে ২রা জুলাই শায়েস্তা খাঁ তাঁকে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে সুবিধাদি দানের ব্যাপারে এমন অনিচ্ছার ভাব ফুটে উঠেছিলো যে, চার্নক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ১৬ই আগস্ট তারিখে তিনি তার এক পত্রে ইংরেজদের হুগলী প্রত্যাবর্তন করে ব্যবসায় করার অনুমতি দেন; কিন্তু ক্ষতিপূরণ, কর রহিতকরণ এবং টাকশাল স্থাপনের দাবী অগ্রাহ্য করেন। জব চার্নক অতঃপর সুতানুটিতে ফিরে আসেন। বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এটি হবে সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি।

ইংরেজদের ছোটখাটো ব্যাপারগুলোকে শায়েস্তা খাঁ যে অবজ্ঞার চোখে দেখেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি আশি বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন। মন তাঁর শান্তি ও বহু-আকাঙ্ক্ষিত অবসর যাপনের

জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো। তিনি একটি শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ কাল যাবৎ বাংলাদেশ শাসন করেন। ইংরেজদের লিখিত ইতিহাসে 'স্বেচ্ছাচারী' ও 'বুদ্ধিভ্রষ্ট বৃদ্ধ নওয়াব' চিত্রিত হলেও প্রাজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও ন্যায়ানুগতার জন্যে বাংলার শাসনকর্তাদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইংরেজদের অনধিকার প্রবেশকারীর দল বলে মনে করতেন। তিনি সারা জীবন শুধু শ্রদ্ধা ও কুর্নিশ লাভেই অভ্যস্ত ছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে ইংরেজদের বাগাড়ম্বর ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবী-দাওয়া বরদাশ্‌ত করা মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু তিনি যে ইংরেজদের প্রতি বিশেষ কোনো বিদ্বেষ বা বৈরীভাব পোষণ করতেন, এরূপ মনে করা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। তারা তাঁর হাতের একান্ত নাগালের মধ্যে ছিলো। তিনি কার্যতঃ তাদের বিরুদ্ধে বৈরিতা করলে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে তিনি যে তাদের উৎসাদিত করে ফেলতে পারতেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভাইস-এ্যাডমিরাল নিকলসনের নৌবহরের উপস্থিতির ফলে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিলো সন্দেহ নেই; কিন্তু তথাপিও শায়েস্তা খাঁর সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা করলে তারা মুষ্টিমেয় কয়েকটি সৈন্যমাত্র। যে সুবেদার সাত শ' রণতরীর একটি নৌবহর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে পেরেছিলেন এবং এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সৈন্য মগদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে আর কিছু না হোক কেবল সংখ্যার জোরেই ইংরেজদের অনায়াসেই পিষে ফেলতে পারতেন। আওরঙ্গজেব তখন অন্যত্র যুদ্ধের ব্যাপারে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, হুগলীর একটি অখ্যাত গ্রামের সামান্য হাঙ্গামার কথা তাঁর কর্ণগোচর করা হলে ঐ স্থানটি কোথায়, তা জানার জন্যে মানচিত্র তলব করা ছাড়া আর কিছুই করার তাঁর অবসর ছিলো না। বাংলাদেশের সকল ক্ষমতাই সুবেদারের হাতে ন্যস্ত ছিলো। তাঁর আমলে কোম্পানীর ঢাকাস্থ অসহায় আমলাদের কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি। এটি তাঁর মহত্ব ও সহৃদয়তারই পরিচয়

বহন করে। তাঁর সুবেদারি লাভের পূর্বে কোম্পানীর যে অবস্থা ছিলো তার অনেক উন্নতি হয়েছিলো তাঁর অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে।

মোগল সাম্রাজ্যের সুবেদাররূপে শায়েস্তা খাঁ সমসাময়িক কালের সবার ওপরে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই সদাসশঙ্ক, বিক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্তপ্রায় প্রদেশে বহু-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি এনে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে মুসলমানদের আগমনের পর থেকে কখনো এই প্রদেশ এতো দীর্ঘদিনের শান্তিভোগ করতে পারেনি। তখনকার দিনে এই শান্তি যে কতো বড় আশীর্বাদের বস্তু ছিলো এবং যিনি এই শান্তির আশীর্বাদ বয়ে আনতেন, তিনি যে কত বড় কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন, আজকের দিনে তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর আমলে ঢাকা সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শিখরে উত্তীর্ণ হয়েছিলো। মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শে অপূর্ব কুশলতার সাথে গড়ে উঠেছিলো অসংখ্য হর্ম্য। সেগুলো ঢাকা নগরীকে মনোরম আভরণে সজ্জিত করেছিলো। তিনি মর্মর প্রস্তর দিয়ে তাঁর প্রিয়তমা কন্যার যে-কবর ও সমাধি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, সেটি পূর্ব বাংলার মুসলিম স্মৃতি-সৌধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। আর কোনো সুবেদার বা শাসনকর্তার স্মৃতি ঢাকার সাথে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে নেই। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা শায়েস্তা খাঁরই নগরী। হুগলীর মোহনায় যে নিন্দিত ও ক্ষুদ্র কোম্পানীর কার্যকলাপকে শায়েস্তা খাঁ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করে গেছেন, তাদেরই বংশধরেরা তাঁর নগরীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করেছে—এটি যদি তিনি আজ কোনোক্রমে দেখতে পেতেন তবে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো তা জানার কৌতূহল অনেকের মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগতে পারে।

প্রচুর বয়সে ও অপরিসীম মর্যাদা নিয়ে শায়েস্তা খাঁ সুবেদারি পদ ত্যাগ করলেন এবং যে নগরীতে বসে এতো দীর্ঘদিন ধরে সুবে বাংলা শাসন করেছিলেন, সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তাঁর বিদায়-পর্বটিও ছিলো অত্যন্ত গৌরবব্যঞ্জক। তাঁর বিদায়-মিছিলে সমস্ত শহর ভেঙে পড়েছিলো।

পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রাপ্য সকল রাষ্ট্রীয় সম্মান তাঁকে প্রদর্শন করা হলো। পশ্চিম ফটক বরাবর তিনি অগ্রসর হলেন। ফটকের কাছে এসে থেমে গেলো সেই বিপুল জনতার মিছিল। এখান থেকেই বৃদ্ধ সুবেদার তাঁর নগরীর কাছ থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর আমলে ঢাকায় অভুতপূর্ব সমৃদ্ধির বান ডেকেছিলো। তখন চালের দাম নেমেছিলো টাকায় আট মণে। বিদায়ক্ষণে তাঁর শেষ নির্দেশ ছিলো যে, তিনি যে পশ্চিম তোরণ দিয়ে এখন নিষ্ক্রান্ত হলেন, তা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি ফলকে লেখা হলো যে, পুনরায় চাউলের দর ঐ স্তরে না নামা পর্যন্ত কোনো শাসনকর্তা যেনো এই ফটকটি না খোলেন। উৎকীর্ণ ফলকটি পশ্চিম তোরণে স্থাপন করা হলো। তাঁর এই নির্দেশ কেউ অমান্য করেনি। চল্লিশ বছর পর্যন্ত এটি বন্ধ ছিলো। পরে সরফরাজ খানের সুশাসনের ফলে বাংলায় আবার সমৃদ্ধির দিন ফিরে এসেছিলো। চাউলের মূল্য ঐ স্তরে আবার নেমে আসায় তাঁর আমলে ফটকটি পুনরায় খুলে দেওয়া হয়।

ঢাকা থেকে বিদায় গ্রহণের পাঁচ বছর পর ৮৬ বৎসর বয়সে পরিপূর্ণ গৌরব ও সম্মান নিয়ে শায়েস্তা খাঁ আগ্রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এরূপ দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের গৌরব ভোগ করার পর পূর্ণ শান্তির মধ্যে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করার সৌভাগ্য মোগল শাহী পরিবারের খুব কম রাজপুরুষের ভাগ্যে ঘটেছে।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলার রাজধানীরূপে ঢাকার শেষ দিনগুলো

শায়েস্তা খাঁর বিদায়ের ফলে তখনকার মতো ইংরেজদের বিশেষ কোনো সুবিধা হলো না। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকাকালে সাময়িকভাবে কোম্পানীর দিকে দৃষ্টি ফিরালেন এবং মোগল নৌবহরের ক্ষতি-সাধন এবং নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দুর্গ স্থাপনের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর আজীবন দুশমন মারাঠাদের সাথে তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। প্রচণ্ড রাগের বশে তিনি রাজ্য থেকে ইংরেজদের নির্মূল করে ফেলার হুকুম জারী করলেন। তাঁর হুকুম যখন ঢাকায় এসে পৌঁছলো, তখন শায়েস্তা খাঁ কার্যভার থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং বাহাদুর খান অস্থায়ীভাবে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। সম্রাটের নির্দেশ পাওয়ামাত্র তিনি তা তামিল করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। কোম্পানীর ঢাকাস্থ এজেন্ট এবং সন্ধি-শর্ত আলোচনায় প্রেরিত আয়ার ও ব্রাডিল নামক দু'জন কাউন্সিল-সদস্যকে সাথে সাথেই কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে ইংরেজদের চিরতরে বিতাড়িত করার নির্দেশ হুগলীতে পাঠানো হলো।

কিন্তু বড়ো দেরীতে এই নির্দেশ পৌঁছেছিলো। ইংরেজ কোম্পানী অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্বেচ্ছায় বাংলা থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কয়েক মাস আগে ক্যাপ্টেন হিথ নামে একজন অস্থিরমতি, উগ্রস্বভাব এবং আস্ফালনসর্বস্ব ব্যক্তিকে কোম্পানী উপসাগরাঞ্চলে উদ্ভূত গোলযোগ ও অশান্তির নিরসন এবং স্থানীয় সরকারের সাথে কোম্পানীর সম্পর্কের উন্নতি সাধনকল্পে প্রেরণ করে। এই ব্যক্তির ক্ষমতা ও যোগ্যতার ওপর কোম্পানীর যে কেনো এতো বড়ো আস্থা জন্মেছিলো, তার কোনো

যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর আগমনের ফলে কোম্পানীর দুর্দশা বরং বেড়েই গেলো। চারদিকে নানা প্রকার বিপদপাত ও গোলযোগের দরুন জব চার্নক ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারী যখন বিপর্যস্ত এবং নিদারুণ অশান্তিতে তাঁদের উন্মাদপ্রায় অবস্থা, ঠিক সেই সময় একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মতো তাঁদের কাছে ক্যাপ্টেন হিথের আকস্মিক আবির্ভাব। তাঁর আগমনের সাথে সাথেই অবিকল একটা প্রহসন নাটকের অভিনয় শুরু হলো। দশ-এগারোটি জাহাজের অধ্যক্ষতা নিয়ে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি হুগলীতে অবতরণ করলেন। আগমনের সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, কোম্পানীর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি যে নির্দেশ দেবেন, তা সমগ্র বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগরে কোম্পানীর সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রযোজ্য হবে। জব চার্নক ও তাঁর সঙ্গীরা এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে হতভম্ব ও সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। সবকিছু চুকিয়ে দিয়ে ১০ই নবেম্বরের মধ্যে পাতুতাড়ি গুটানোর জন্যে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হলো। এতে তাঁদের মন আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। বাহাদুর খান আরাকানরাজের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন শুনতে পেয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন হিথ সুবেদারের কাছে এক হঠকারিতাপূর্ণ এবং মারাত্মক প্রস্তাব করে বসলেন। প্রস্তাবে জানানো হলো যে, কোম্পানীকে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ পূর্ণরূপে ভোগ করতে দেওয়া হলে এবং দুর্গ নির্মাণ করতে দেওয়া হলে তাঁর অভিযানে কোম্পানী তাঁকে সাহায্য করবে। আর তা দেওয়া না হলে তারা বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে এবং 'বেড়াহীন কুঠিগুলো' নিয়ে এখানে আর বাণিজ্য করবে না। কিন্তু পত্রের জওয়াবের অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য তার ছিলো না। অনেক আস্ফালন ও তর্জন-গর্জনের পর এই অস্থিরমতি ক্যাপ্টেন নির্ধারিত তারিখের দু'দিন আগেই রওয়ানা হলেন। ভেবে দেখলেন না কোম্পানীর ঢাকাস্থ কর্মচারীদের ভাগ্যে কি ঘটতে পারে। এর পর প্রায় চার মাস ধরে বাংলাদেশস্থ কোম্পানীর সব কর্মচারী ও অন্য সব কিছু

জাহাজে নিয়ে তিনি 'এ-বন্দর সে-বন্দর করলেন' এবং অবশেষে ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ জব চার্নক এবং তাঁর কাউন্সিলকে বোম্বাই বন্দরে নামিয়ে দিলেন।

একমাত্র ঢাকাস্থ এজেণ্ট সকল ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হন এবং কারা-প্রাচীরের অন্তরালে থেকে বাংলায় কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন। আর ক্যাপ্টেন হিথ মাদ্রাজে গিয়ে আস্ফালন ও বড়াই করতে থাকেন। এই অন্তঃসারশূন্য গর্ব ও নিস্ফল আস্ফালনই তাঁর জীবনের ব্যর্থতার জন্যে দায়ী। অপর পক্ষে জব চার্নক অশেষ ধৈর্য নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। পনের মাস ধরে তিনি দীর্ঘ কষ্টদায়ক দিনগুলো অতিবাহিত করেন। পাশ্চাত্যের রাজনীতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ও গতিধারা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং অনুমান করেছিলেন যে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। তাই তিনি সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণছিলেন।

আওরঙ্গজেবের রোষবহ্নি যেমন অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছিলো, তেমনি অকস্মাৎ তা নিবে গেলো। সে সময় তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিলো মারঠাদের দমন করা। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ইংরেজদের শত্রু না করে যদি তাদের মিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়, তবে এ-ব্যাপারে তাঁর সুবিধা হবে। ইংরেজগণ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর তারা মালাবার উপকূল ভাগ থেকে মোগল নৌবহরকে প্রায় বিতাড়িত করেছিলো। ভারতের সাথে আরব রাজ্যের ব্যবসায় ক্ষেত্রে এবং হজ্বযাত্রীদের গমনের পথেও তারা দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেছিলো। তা ছাড়াও ইংরেজদের কাছ থেকে যে বাণিজ্য-শুল্ক আদায় হতো, এই বিরোধের ফলে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং এতে করে তাঁর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিলো। আওরঙ্গজেব অগৌণেই তাঁর কঠোর মনোভাব পরিত্যাগ করলেন এবং ইংরেজদের প্রতি অধিকতর উদার নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুরে তাঁর শিবিরে শান্তির শর্তাবলী রচিত হলো। ইংরেজদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন স্যার জন চাইল্ড।

এই শান্তি-চুক্তির ফলে সদ্য নিযুক্ত বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খানের কাছে সম্রাট একটি ফরমান প্রেরণ করলেন। ফরমানটির তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দ। ফরমানে বলা হলো :

'একথা আপনার অবহিত হওয়া কর্তব্য যে, ইংরেজগণ তাদের অবৈধ কার্যকলাপের জন্যে যে অনুতপ্ত হয়েছে, এটি তাদের সৌভাগ্যের বিষয়। তাদের পূর্বগৌরব ম্লান হয়ে পড়ায় এখন তারা উকিলের মাধ্যমে তাদের জীবন রক্ষার এবং অপরাধ মার্জনার জন্যে আবেদন জানিয়েছে। ত'দের প্রতি আমার অতিরিক্ত অনুগ্রহবশতঃ আমি তাদের মাফ করলাম। সুতরাং আমার ফরমান প্রাপ্তিমাত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে করে তাদের প্রতি আর কোনো অসুবিধা না করা হয়। তারা আগের মতই স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় করে যাবে। আমার এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হবে বলে আশা করি।'

ইব্রাহীম খান সাথে সাথেই আওরঙ্গজেবের নির্দেশকে কার্যকরী করার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় এবং অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সময়ে যখন চারদিকে বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো, তখন তিনি গ্রন্থরাজির মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতেন এবং ফরাসী পাণ্ডুলিপির মর্মোদ্ধারে নিবিষ্ট হয়ে থাকতেন। সামরিক যশের প্রতি তাঁর তিলমাত্র আগ্রহ ছিলো না। ইংরেজদের প্রতি তিনি কোনো বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না। ইব্রাহীম খান শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে খুব আগ্রহশীল ছিলেন। সম্রাটের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তিনি কোম্পানীর ঢাকাস্থ এজেন্টকে মুক্তি দিলেন এবং কোম্পানীর কুঠিসমূহ ও অন্যান্য সম্পত্তি তাদের প্রত্যর্পণ করলেন। মাদ্রাজে জব চার্নককে তিনি পত্র দিলেন। চার্নক প্রথমে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট পুনরায় সুতানুটিতে ফিরে এলেন। বাংলায় ইংরেজদের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় দিন। মাত্র ত্রিশ জন সৈনিক নিয়ে ইংরেজ কুঠিসমূহের প্রধান অধ্যক্ষ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ

করলেন। তিনি সর্বপ্রথম সুতানাটি পুনর্গঠনে হাত দিলেন। এখান থেকেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে কলকাতা মহানগরী। প্রত্যাবর্তনের পর চার্নক মাত্র আড়াই বছর জীবিত ছিলেন। তিনি জানতেন না যে, তাঁর এই ক্ষুদ্র উদ্যমটি পরবর্তীকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরীরূপে পরিণতি লাভ করবে। সেন্ট জন গীর্জা-প্রাঙ্গণের এক বিরাট সমাধি-সৌধের অভ্যন্তরে কোম্পানীর এই জাঁদরেল কর্মচারী সমাহিত হয়ে আছেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিনি পরম আনুগত্যের সাথে কোম্পানীর সেবা করে গেছেন। তিনি সেখানে আজ চিরনিদ্রায় অভিভূত। কিন্তু আজ যাঁরা তাঁর তৈরী পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তারা তাঁকে ভোলে নাই।

শাসনদক্ষ ও শক্তিশালী শায়েস্তা খাঁর বিদায় গ্রহণের স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশে আবার গোলযোগ ও অশান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে শোভা শিং নামে একজন হিন্দু জমিদার বর্ধমান-রাজের ওপর কুপিত হয়ে উড়িষ্যার আফগানদের সাহায্যে তাঁকে আক্রমণ করেন। একমাত্র এক পুত্র ব্যতীত রাজা স্বয়ং এবং গোটা রাজপরিবার এতে নিহত হন। বর্ধমান-রাজের এই পুত্রটির নাম ছিলো জগৎ রায়। তিনি ঢাকায় পলায়ন করেন এবং সুবেদারের সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্তু ইব্রাহিম খান তাঁর গ্রন্থরাজি নিয়ে মশগুল ছিলেন। জগৎ রায়ের আবেদনে তিনি তেমন সাড়া দিলেন না। যশোরস্থ সামরিক শাসনকর্তাকে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার হুকুম দিয়েই তিনি কর্তব্য সমাধা করলেন। কোম্পানী এতদিন ধরে যে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলো, ইব্রাহিম খানের নিষ্ক্রিয়তাই তা তাদের হাতে এনে দিলো। বিদ্রোহীরা দ্রুত অগ্রসর হয়ে হুগলী অধিকার করে নিলো। স্থানীয় মোগল শাসনকর্তা কোম্পানীকে সাহায্য করতে অগ্রসর না হওয়ায় এবং ঢাকাস্থ সুবেদারের কাছ থেকেও কোনো সাহায্যের সম্ভাবনা না থাকায় কোম্পানী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। এমন অবস্থায়ও ইব্রাহীম খান সজাগ হয়ে উঠলেন না। কোম্পানীর আবেদনের জওয়াবে তিনি কোম্পানীকে নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার

জন্যে একটা অস্পষ্ট ও ভাসা ভাসা নির্দেশ দান করলেন। সুতানুটির ইংরেজগণ, চন্দননগরের ফরাসিগণ এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজগণ নিজেদের মত করে এই নির্দেশের ব্যাখ্যা করলো এবং স্ব স্ব কুঠিগুলোকে অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলো। মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংরেজদের এই প্রথম সামরিক প্রস্তুতি। তখন তারা বুঝতে পারেনি যে, তারা কি বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করছিলো। এ সত্য স্বীকৃত হয়ে গেলো যে, মোগল শক্তি তাদের রক্ষা করতে অক্ষম এবং ভবিষ্যতে তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ-প্রাচীর গড়ে উঠলো। বাংলায় ইংরেজদের ইতিহাসের এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

কথিত আছে, আওরঙ্গজেব সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বপ্রথমে এই বিদ্রোহের সংবাদ জানতে পান। ইব্রাহীম খান এমন উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন যে, এতো বড় একটা গোলযোগের সংবাদও সম্রাটের গোচরে আনা প্রয়োজন মনে করেননি। কর্তব্যের প্রতি সুবেদারের এবংবিধ অবহেলার জন্যে সম্রাট এতো রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর পৌত্র আজীম-উশ্‌শানকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। ইব্রাহীম খানের সংক্ষিপ্ত সুবেদারীর এইভাবে যবনিকাপাত হলো। তাঁর উত্তরাধিকারী বাংলায় না পৌঁছা পর্যন্ত ইব্রাহীম খানের পুত্র জবরদস্ত খানের ওপর শাসনভার ন্যস্ত হলো। জবরদস্ত খান ছিলেন পিতার ঠিক বিপরীত। তিনি উৎসাহী সৈনিক এবং উদ্যমশীল শাসনকর্তা ছিলেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। নয়া সুবেদার বাংলায় পদার্পণ না করা পর্যন্ত তিনি এই অভিযান চালিয়ে যান।

১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে আজীম-উশ্‌-শান বাংলায় পদার্পণ করেন। তাঁর সুবেদারীর প্রথম তিন বছর বিদ্রোহীদের দমনে অতিবাহিত হয় এবং ঐ সময় তাঁর সদর দফতর বর্ধমানে স্থাপিত হয়। সমগ্র রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার পর ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি শাহী নৌবহরে বিজয়ী বেশে ঢাকায়

অবতরণ করেন। সুবেদার পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি ইংরেজদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রচুর অবকাশ লাভ করলেন। এই সময় নতুন ও পুরাতন কোম্পানীর মধ্যকার বিরোধ চরম সীমায় পৌঁছে। অর্থের জন্যে আজীম-উশ্-শান যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষ থেকে উদার হস্তে উৎকোচ গ্রহণ করতে লাগলেন। ১৪০০০্ টাকার জন্যে নতুন কোম্পানীকে ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দিতে তাঁর অনিচ্ছা ছিলো না। আবার ১৬০০০্ টাকার জন্যে ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এক হুকুম-নামায় তিনি কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর—এই তিন গ্রামের ইজারা স্বত্ব ভূমির মালিকদের কাছ থেকে কিনে নেওয়ার অনুমতি ইংরেজদের দান করেন। কোম্পানী পরিশেষে এখানেই সদর দফতর স্থাপন করেছিলো। ফোর্ট উইলিয়ামের ঐতিহাসিক প্রাচীর ইংরেজদের কুঠিগুলো ঘিরে দ্রুত-গতিতে গড়ে উঠলো। বলা আবশ্যক, ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজার নামানুসারে কোম্পানীর এই দুর্গের নাম হয়েছিলো ফোর্ট উইলিয়াম। দুই বৎসর পর কোম্পানী দু'টোর বিরোধ নিষ্পত্তি ও একীভবনের ফলে ইংরেজগণ তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুক্তভাবে লড়াই করতে সমর্থ হয়।

যে-সব ঘটনার ফলে ঢাকা বাংলার রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকার গৌরব থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছিলো, ইতিমধ্যেই সেগুলো একটির পর একটি অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। অর্থ আহরণই ছিলো আজীম-উশ্-শানের জীবনের মূল লক্ষ্য। ইংরেজ কুঠিগুলো প্রতি বছর ব্যবসায় করে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতো, তা তিনি ঈর্ষার চোখে লক্ষ্য করতেন। অকস্মাৎ তাঁর মনে এই ধারণার উদয় হলো যে, বাংলায় আমদানীকৃত সকল বিদেশী পণ্যের তিনি একচেটিয়া সওদাগরি করতে পারেন। অতঃপর তিনি নিজের একটা কোম্পানী গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন এবং প্রতিটি বন্দরে আমদানীকৃত মাল জোর করে কিনে পরে মুনাফায় সেগুলো বিক্রি করার জন্যে এজেন্ট পাঠালেন। এই আত্মঘাতী ব্যবসায়ের নাম দেওয়া হলো 'সওদায়ে খাস'—বিশেষ ব্যবসায় ও 'সওদায়ে আম'—সাধারণ

ব্যবসায়। কিন্তু মনে হয়, সে-যুগেও সংবাদপত্র ছিলো। বিভিন্ন প্রদেশের কার্যকলাপ সম্পর্কে এই সব সংবাদপত্রে আলোকপাত করা হতো। আওরঙ্গজেব সংবাদপত্রের মাধ্যমেই এই নতুন ধরনের ব্যবসায়ের কথা জানতে পান। এই ব্যবসায়ের উদ্ভাবক তাঁর পৌত্র স্বয়ং হলেও তিনি উপহাস করে লিখলেন, 'এটি বিশেষ ব্যবসায় নয়, বিশেষ বিশেষ পাগলামী মাত্র।' তিনি কঠোর ভাষায় এটি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং বিরক্তির নিদর্শনস্বরূপ শাহ্‌জাদার রক্ষীবাহিনী থেকে পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য হ্রাস করলেন। অর্থাগমের এই উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আজীম-উশ্‌-শান অন্য দিকে নজর ফেরালেন। ঐ সময় ঢাকায় বহু ধনাঢ্য হিন্দু বাস করতেন। কর ও অন্যান্য অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁরা প্রভূত বিত্ত অর্জন করেছিলেন। সুবেদার স্বয়ং এই সব বিত্তবান হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে তাঁদের খুশী ও অনুগৃহীত করতেন। কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য ছিলো অর্থপ্রাপ্তি। তাঁদের উৎসবাদিতে নাকি তিনি হলুদে ও গোলাপী রঙের বস্ত্র পরিধান করে মণ্ডপে প্রবেশ করতেন। এ-সংবাদও আওরঙ্গজেবের কানে পেঁাছে-ছিলো এবং তিনি পৌত্রকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে স্বহস্তে একটি পত্র লিখে পাঠালেন। বৃদ্ধ সম্রাট তাঁর ভর্ৎসনা-বাণীতে বললেন, 'ছেচল্লিশ বছর বয়সের দাড়ি নিয়ে হলুদে রঙের পাগড়ি আর গোলাপী রঙের জামা পরলে মোটেই তা মানানসই হয় না।'

পৌত্রের এই সব নির্বুদ্ধিতার দরুন আওরঙ্গজেব বাংলার দেওয়ানি বা রাজস্ব শাসনের ভার মুর্শিদ কুলি খাঁ নামক তাঁর এক প্রিয়পাত্রের হাতে অর্পণ করলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর আবির্ভাব মোগলদের ইতিহাসে আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হাজী শফী নামক জনৈক ইরানবাসী তাঁকে ক্রয় করে ইস্পাহানে নিয়ে যান। সেখানে ইসলামী মতে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইরানী বণিকের মৃত্যুর পর কুলী খাঁ মুক্তিলাভ করেন এবং ভাগ্যান্বেষণে দাক্ষিণাত্য আগমন করেন। সেখানে বেরারের দেওয়ানের অধীনে তিনি

একটি চাকরী লাভ করলেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি হিসাবপত্র, অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। এই সব বিষয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতার জন্যে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হতে থাকে এবং তিনি অচিরেই আওরঙ্গজেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে হায়দরাবাদের দেওয়ানের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। পৌত্র আজীম-উশ্-শানের রাজস্ব শাসনে অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। বাংলার শাসন ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব এক বিশেষ নীতি অনুসরণ করে গেছেন। এই নীতি অনুযায়ী তিনি সামরিক ও রাজস্ব বিভাগকে দু'টি পৃথক শাখায় বিভক্ত করেন। নাজীম অথবা সুবেদার সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন। বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব ছিলো তাঁর ওপর। দেওয়ান বা রাজস্ব-প্রধানের পদ নাজীমের পদের মতো ততো প্রভুত্বব্যঞ্জক না হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। তাঁকে রাজস্ব আদায় এবং প্রদেশের আর্থিক ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছিলো। জাঁদরেল নাজীম বা সুবেদারগণের আমলে দেওয়ানগণ সম্পূর্ণরূপে তাঁদের অধীনস্থ হয়ে পড়তেন। নাজীম সরকারী কাজে অর্থের জন্য দেওয়ানকে লিখিত আদেশ পাঠাতেন। আর দেওয়ান সে আদেশ পালন করতে বাধ্য হতেন। দেওয়ান এতোকাল পর্যন্ত একজন কর আদায়কারী এবং নাজীমের খাজাঞ্চীরূপে কাজ করে এসেছেন। কিন্তু সম্রাটের অনুগ্রহ ও বিশ্বাসভাজন মুর্শিদ কুলী খাঁ কার্যভার গ্রহণ করার সাথে সাথেই দেওয়ানের পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বেড়ে গেলো। মুর্শিদ কুলী খাঁ দেখতে পেলেন যে, শায়েস্তা খাঁর সুবেদারি আমলে শান্তি অব্যাহত থাকায় পূর্ব বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিলো এবং এর কৃষির প্রভূত উন্নতি হয়েছিলো। ইব্রাহীম খানের অথর্ব শাসন আমলে রাজস্ব আদায়ে যথেষ্ট গাফিলতি করা হয়েছিলো এবং প্রচুর অপব্যয়ও হয়েছিলো। আর অর্থলোভী আজীম-উশ্-শান সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেন। নতুন দেওয়ান ছিলেন অন্য প্রকৃতির মানুষ। বিপুল

উদ্যম নিয়ে তিনি রাজস্ব সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটন ও সুব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে হাত দিলেন। অতীতের সামরিক কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ অথবা সামরিক বিভাগে বর্তমান চাকরির বেতনের পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি জায়গীরদারদের প্রদান করা হয়েছিলো। এই সব জায়গীরদারি রাজস্ব বিভাগের অধিকারের বাইরে চলে যায়। এর ফল এমন দাঁড়ালো যে, যেখানে বাংলার রাজস্ব এক কোটি টাকা হওয়ার কথা, সেখানে তা এত কমে গেলো যে, তা দিয়ে সুবেদার ও প্রশাসন বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলান দুরূহ হয়ে পড়লো। মুর্শিদ কুলী খাঁ সম্রাটের দ্বারা এই সব জায়গীরদারি বাতিল ও বিলোপ করালেন। শুধু নিজামত ও দেওয়ানীর বৃত্তি বাবত প্রদত্ত জায়গীরদারি অবশিষ্ট রইলো। এইভাবে সমগ্র বাংলার জমিদারগণ রাজস্ব বিভাগের আওতায় এসে গেলেন। তাঁদের খাজনা বাড়ানো হলো এবং ফলে রাজস্ব প্রচুর বৃদ্ধি পেলো। স্বল্পকালের মধ্যেই মুর্শিদ কুলী খাঁ দিল্লীতে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার রাজস্ব প্রেরণ করতে সমর্থ হলেন। তিনশ' অশ্বারোহী ও পাঁচশ' পদাতিক সৈন্যের একটি রক্ষীদল দিয়ে অধিকাংশ রাজস্বই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় পাঠানো হলো। বাদশাহ্ ও উজীরে-আজমকে পাহাড়ী ঘোড়া, হরিণ, শিকারী পাখী, গণ্ডারের চামড়ার ঢাল, সিলেটি পাটি, ঢাকাই মসলিন, কাশিমবাজারী রেশমী বস্ত্র, কাজ-করা ও হাতির দাঁত বসানো স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র উপঢৌকন দেওয়া হলো। যে দেওয়ান এতো স্বল্পকালের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাতে পারেন, তিনি যে স্বাভাবিকভাবেই সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু সুবেদার আজীম-উশ্-শান এতে করে বড়ই মুশকিলে পড়ে গেলেন। এর আগে একটা চিট্ লিখে দিলেই টাকা এসে হাজির হতো। তাঁর আদেশ পাওয়ামাত্রই দেওয়ান তা তামিল করতেন। ফলে আজীম-উশ্-শানের ধনসঞ্চয় ও অপরিসীম ব্যয়বাহুল্যে বাধা পড়ে গেলো। এমনকি, তাঁর জন্যে যে পাঁচ অশ্বারোহীর একটি দেহরক্ষী বাহিনীর ব্যবস্থা ছিলো, নদীবক্ষে

ঢাকার মতো স্থানে এরূপ অশ্বারোহী রক্ষীদল রাখা নিরর্থক—এই অজুহাতে তা লোপ করা হলো। আমীর-ওমরাহ্‌দের দুর্নীতির পথও বন্ধ করে দেওয়া হলো। ফলে সুবেদারের দরবারে অচিরেই মুর্শিদ কুলী খাঁ অত্যন্ত অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর প্রতি সম্রাটের অবিচল আস্থা ও অনুগ্রহই তাঁকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলো। কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণের সাহস করলো না। রোষে ও ক্ষোভে আজীম-উশ্‌-শান ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন এবং অবশেষে বলপ্রয়োগ ও চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

১৭০২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বভাগে ঢাকার রাজপথে এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হলো। এর চূড়ান্ত পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, ঢাকা বাংলার রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকতে পারলো না। একটি অশ্বারোহী দলের নায়ক আবদুল ওয়াহিদ নামক এক ব্যক্তি সুবেদারের খুব খয়েরখাঁ ছিলেন। সুবেদার তাঁর বিরক্তিভাজন দেওয়ানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এক ফন্দি এঁটেছিলেন। আবদুল ওয়াহিদের কাছে সে-কথা প্রকাশ মাত্রই তিনি সে অভিসন্ধি মতো কাজ করতে সম্মত হলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। প্রকাশ্যে তিনি কখনো সুবেদারের বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর দরবারে হাজির হতেন এবং তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। আজীম-উশ্‌-শানের দরবারভবন ছিলো পোস্তায়। নদীর তীর সংলগ্ন এই ইমারতটি বহু পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সুবেদার যখন দরবার বসাতেন, তখন মুর্শিদ কুলী খাঁ সরকারী পালকিতে চড়ে সেখানে যেতেন—চারধারে থাকতো দেহরক্ষীরা। দরবারে আগমনের সময় বাজারের জনবহুল রাস্তায় আবদুল ওয়াহিদ দেওয়ানকে পাকড়াও ও নাজেহাল করার অভিসন্ধি করলেন। সুবেদার-প্রাসাদের অনতিদূরে একটি সংকীর্ণ গলির মুখে তাঁর সৈন্যগণ ওঁৎ পেতে রইলো। দেওয়ানের পালকি নিকটবর্তী হলে তারা সেটি ঘেরাও করার চেষ্টা করলো এবং হৈ চৈ শুরু করে দিলো। তাদের অনেক বেতন বকেয়া পড়েছে বলে তারা চীৎকার করতে এবং বকেয়া মাইনা দাবী করতে লাগলো। কিন্তু মুর্শিদ কুলী খাঁ আগে থেকেই সতর্ক

ছিলেন। তিনি দেহরক্ষীদের রীতিমতো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেই রাস্তায় পা বাড়িয়েছিলেন। দেহরক্ষীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে তিনি নিরাপদে প্রাসাদে পৌঁছে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, সুবেদারের সাথে আর কোনো শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব নয়। আবদুল ওয়াহিদের চক্রান্তের সাথে আজীম-উশ্-শান লিপ্ত আছেন বলে তিনি প্রকাশ্যে অভিযোগ করলেন এবং এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন। কথিত আছে যে, তাঁর তরবারির ওপর হস্ত স্থাপন করে মুর্শিদ কুলী খাঁ আজীম-উশ্-শানকে বলেন, 'আপনি যদি আমার জীবন নেওয়ার জন্যে এতোই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন, তবে আসুন—এখানেই শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাক।' কিন্তু আজীম-উশ্-শান যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি সুবেদারি পদের সম্ভ্রমের ও মর্যাদার অজুহাত তুলে দেওয়ানের সাথে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করলেন। যা হোক, মুর্শিদ কুলী খাঁ আম দরবারে গিয়ে আবদুল ওয়াহিদকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর বাকী বকেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁর দাবী কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁকে এবং তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গেই বরখাস্ত করলেন।

তাঁর সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় দুর্বলচেতা আজীম-উশ্-শান খুব ভীত হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি জানতেন যে, সম্পর্কের দাবীর জোরে সম্রাটের রোষবহ্নি থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নেই। মুর্শিদ কুলি খাঁ স্বীয় প্রাসাদে ফিরে এসে সেদিনের ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই শহরে তাঁর জীবন আর মোটেই নিরাপদ নয়। ঐ দিনই তাঁর সকল ভক্ত-অনুচর ও সমগ্র দেওয়ানী দফতর সাথে নিয়ে তিনি ঢাকা ত্যাগ করলেন। তিনি সুবেদারের প্রতি আনুষ্ঠানিক সম্মানও প্রদর্শন করলেন না। আজীম-উশ্-শান নদীতীরস্থ তাঁর প্রাসাদ থেকে দেখতে লাগলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ঢাকা ত্যাগের দৃশ্য—দেওয়ানের বজরার পেছনে এক বিরাট নৌবহর এগিয়ে চলেছে। পাছে প্রকাশ্য সংঘর্ষের উদ্ভব হয়, এই

ভয়ে আজীম-উশ্-শান দেওয়ানের ঢাকা পরিত্যাগে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন না। মুর্শিদ কুলি খাঁ পূর্বেই সুবেদারের অশ্বারোহী দেহরক্ষীদল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে বিনা বাধায় ঢাকা ত্যাগ করা সম্ভব হয়।

ধলেশ্বরী নদী ধরে নৌবহর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে প্রদেশের গোটা রাজস্ব দফতর বহন করে। ফলে অস্তাচলগামী হলো ঢাকার সৌভাগ্য-সূর্য। মুর্শিদ কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপন করলেন। যে-সব মর্মান্তিক ঘটনার ভেতর দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের যবনিকাপাত হয়, সেগুলো এই মুর্শিদাবাদ ও রাজমহলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। মুর্শিদ কুলি খাঁ সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে ফরিয়াদ প্রেরণ করেছিলেন, অচিরেই ঢাকায় তার জওয়াব এসে গেলো। সম্রাটের সাথে রক্তের সম্পর্কও আজীম-উশ্-শানকে বাঁচাতে পারলো না। আওরঙ্গজেবের প্রদীপ্ত রোষবহ্নি পূর্ণতেজে তাঁর ওপর আপতিত হলো। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা ছেড়ে বিহারে যেতে নির্দেশ দেওয়া হলো। তিনি তাঁর পুত্র ফররুখশিয়রকে উপশাসক মনোনীত করে শাসনভার তাঁর হাতে অর্পণ করে যান বটে, কিন্তু এই মনোনয়ন সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেনি বলে মনে হয়। আজীম-উশ্-শানের বিদায়ের সাথে সাথেই নাটকের যবনিকাপাত হলো। অবমাননাকর অবস্থার মধ্য দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেও তখনও তিনি বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি। তাঁর পদযোগ্য শান-শওকত সহ তিনি বিদায় হলেন। তাঁর প্রাসাদের সন্নিকটে পোস্তায় অবতরণ মঞ্চ থেকে তোপধ্বনি ও ঢক্কানিনাদের মধ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় প্রমোদতরী বহরের নির্দিষ্ট বজরায় আরোহণ করলেন। সাথে নিলেন তাঁর সঞ্চিত আট কোটি টাকা। কয়েক বছর পূর্বে শাহ্ শুজা কর্তৃক নির্মিত এই বিরাট প্রমোদবহর নদীতে কয়েক মাইল জুড়ে অবস্থান করতো। তাঁর সাথে সকল সরকারী দফতর, অসংখ্য আমীর-ওমরাহ্, আমলা-ফয়লাও বিদায় হয়ে গেলেন এখান থেকে। ধীরে ধীরে এই মিছিল দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলো। কোলাহলমুখর, কর্মচঞ্চল এই নগরী অকস্মাৎ নির্বাক—শান্ত হয়ে গেলো। যেন জনশূন্য হয়ে গেলো

এই মহানগরী। সকল আকর্ষণ সে হারিয়ে ফেলতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। সবার দৃষ্টি আর এই নগরীর প্রতি নিবদ্ধ হয় না। সারা প্রদেশের জন্যে কোনো হুকুমনামাও আর জারি হয় না এখান থেকে। এই মহাপুরী অবশেষে একটা নগণ্য স্থানীয় শহরে পর্যবসিত হলো। ত'র একশত বছ রর গৌর-বোজ্জ্বল ইতিহাসের যবনিকা নেমে এলো। পরবর্তী যে রাজপ্রতিনিধি এর রাস্তাঘাট পরিক্রম করেছিলেন, তিনি অন্য এক জাতির মানুষ। সে-জাতির লোকেরা তখনও বীরত্ব সহকারে সকল বাধা-বিপত্তির সাথে লড়াই করে যাচেছ এবং মোগলদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করছে বঙ্গোপ-সাগরের মোহনায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের আশায়। তখনও তারা বুঝতে পারেনি যে, ভবিষ্যতে তারাই সাম্রাজ্যের অধিপতি হবে। ভাগ্য-চক্রের আবর্তন এমনিই বিস্ময়কর।

অষ্টম অধ্যায়

মোগল-শক্তির পতন

মহাভুজ আওরঙ্গজেব মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আহ্‌মদনগরে তাঁর অন্তিম ঘনিয়ে এলো। কুড়ি বছর আগে এখান থেকেই তিনি বিপুল সমর-সম্ভার-সহ দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্যে অভিযান প্রেরণ করেন। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকার পর তিনি ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়েন। বৃদ্ধ সম্রাট বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। সে এক করুণ দৃশ্য। মৃত্যুর পদধ্বনি ক্রমেই এগিয়ে আসছে অথচ শত্রু এখনো অবিজিত রয়ে গেলো। একানব্বুই বছর বয়সে তিনি জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন—দেখলেন অসম্পন্ন রয়ে গেছে জীবনের সব কাজ, অপূর্ণই রয়ে গেলো জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। হিন্দুস্তানের শেষ শ্রেষ্ঠ ও মহাশক্তিশালী সম্রাট উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধেরও অবসান হয়েছে। তাঁর হৃদয়-মন এক নিদারুণ অনুশোচনায় ভরে উঠলো। একাই তিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করলেন। সেই মহাবিজয়ীর আগমন-প্রতীক্ষায় ক্ষণে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো বহুদিনের স্মৃতি আর অভিযুক্ত করতে লাগলো তাঁকে সিংহাসন অধিকারের জন্যে হৃদয়হীনতার সাথে যাঁদের তিনি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। মনে হয়, তাঁর মৃত্যু-শয্যার চারপাশে তাঁদের মুখ বিভীষিকা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো ও তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিলো। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি যে কঠোর হস্তে এবং ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সাম্রাজ্য শাসন করে গেলেন, এ-সব অপরাধের কাছে তা অকিঞ্চিৎকর বলে তাঁর মনে হলো। তাঁর পুত্রগণ যাতে তাঁর মতো ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করে সিংহাসন দখলের চেষ্টা করতে না পারে, তজ্জন্য তিনি পুত্রদের বহু দূরবর্তী

অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। একাই রইলেন। একাই তিনি মৃত্যুর সম্মুখীন হবেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তিনি অকুতোভয় এবং সম্রাট। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় পুত্রদের উদ্দেশে যে-সব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলো অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী। আবেদনময় একটি পত্রে তিনি লিখেন, 'আমি যখন এ জগতে এসেছিলাম, তখন বহুজন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু যাবার বেলায় আমাকে একাই যেতে হচ্ছে এ জগত থেকে। আমি কে? কি আমার মূল্য? কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই বা আমি এই মরজগতে এসেছিলাম? এসব প্রশ্নের কোনো জওয়াবই আমি খুঁজে পাইনি। আমি আল্লাহ্‌র এবাদৎ বন্দেগীর কথা ভুলে গিয়ে যে সব মুহূর্তের অপচয় করেছি, সেগুলোর জন্যে আমি রোদন করছি। আমি দেশ ও প্রজাপুঞ্জের কোনো মঙ্গল করতে পারিনি। আমার জীবনের দীর্ঘ-বছরগুলো আমি নিষ্ফলভাবে কাটিয়েছি। আমার চিত্তে আল্লাহ্ সমাসীন থাকা সত্ত্বেও আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন চোখ তাঁর মহিমাময় মহাজ্যোতি দেখতে পায়নি। সেনাবাহিনী বিভ্রান্ত, নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন। আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। হৃদয় আমার অস্থির ও উতলা হয়ে উঠেছে। আমি যখন এই জগতে আসি তখন কিছুই সাথে আনিনি। অথচ এখান থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছি পাপের বোঝা সাথে নিয়ে। আল্লাহ্ রহ্‌মান, রহীম। তাঁর অপার করুণায় আমার বিশ্বাস ও ভরসা আছে। অথচ কৃতকর্মের জন্যে আমি ভীত হয়ে পড়েছি। তা সত্ত্বেও বলি, যা আসার আসুক, যা হবার হোক। মহাসাগরে আমার ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছি। বিদায়! বিদায়!! বিদায়!!!'

তিনি প্রায়শঃই জুমার দিনে ইন্তেকাল করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন। তাঁর এই ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হয়েছিলো। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ শুক্রবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিম বাসনা অনুযায়ী অনাড়ম্বরভাবে কিন্তু বিপুল সম্ভ্রম ও মর্যাদার সাথে তাঁর দাফনকার্য পরিচালিত হয়েছিলো—'এই মাটির জীবটিকে নিকটম স্থানে নিয়ে গিয়ে মাটির নীচে কবর দিও। কোনো রকম অনাবশ্যক শবাধারের ব্যবস্থা করবে না।'

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সাথে সাথে মোগল সাম্রাজ্যের পতন নেমে এলো। দ্রুতগতিতে সে পতন এমন এক পর্যায়ে নেমে এলো যে, সেখান থেকে তার উত্থানের আর কোনো পথ রইলো না। মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছিলো বাংলা। বাংলা দেশে এর কর্তৃত্ব ইতিমধ্যেই শিথিল হয়ে পড়েছিলো। ষাট বছরের মধ্যেই এই প্রদেশ মোগল সম্রাটদের হস্তচ্যুত হয়ে গেলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর উদয় ক্ষণটি বাংলায় ব্যবসায়রত ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে অশুভ সূচনা করলেও এই শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই এর ভাগ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছিলো। শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোম্পানীকে অর্থহীন প্রতিশ্রুতির পেছনে ঘুরতে এবং নিষ্ফল আলোচনায় কাল হরণ করতে হয়েছিলো। এর ওপর ছিলো সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তাঁর সুবে-দারের রোষানল। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতে ইংরেজদের চরম সঙ্কট কাল। তারা একটা সামান্য বাণিজ্য কোম্পানীমাত্র—একথা মনে করে প্রথমের দিকে তারা যে ভীরুতা ও শঙ্কা প্রদর্শন করেছিলো, এই শতাব্দীর মধ্যেই ক্রমে ক্রমে তারা তা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলো এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের জন্যে এক নতুন নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলো। শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজদের যে ক্ষুদ্র কোম্পানীটি হুগলী নদীর তীরে, ঢাকায়, পাটনায় ও কাসিমবাজারে নানা বিপদ-আপদের মধ্যে কোনোরূপ টিকে ছিলো, শতাব্দী উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রভুত্ব বিস্তার করলো। আর যে মোগল নওয়াবগণ তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্যে পুনঃ পুনঃ হুমকি দিতেন, কার্যতঃ তাঁরা ইংরেজ কোম্পনীর হাতের পুতুলে পর্যবসিত হলেন।

পূর্ব বাংলায় বৃটিশ শাসন ক্রমে ক্রমে শান্তি ফিরে আসার আগে ষাট বছরকাল ধরে এখানে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলছিলো। দিল্লীতে সিংহাসনারোহণের জন্যে ফররুখশিয়র ঢাকা ত্যাগ করার সাথে এর উচ্চ-মর্যাদা চূড়ান্তভাবে ধসে পড়লো। ঢাকার শাসনভার একজন নায়েবে নাজীম

বা উপশাসকের হাতে ন্যস্ত হলো। সুবেদার থাকতেন মুর্শিদাবাদে অথবা রাজমহলে। তাঁর অধীনে নায়েবে নাজীম শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। নায়েবে নাজীমদের অধীনে ঢাকার আর প্রথম শ্রেণীর নগরীর মর্যাদা রইলো না। এতদ্‌সত্ত্বেও ঢাকার শাসনভার লাভ মোগল দরবারে একটি কাম্য বস্তু বলে পরিগণিত হতে থাকে। উত্তরে গারো পাহাড় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম থেকে পশ্চিমে উড়িষ্যা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত এই প্রদেশটির আয়তন ছিলো পনের হাজার বর্গমাইলেরও অধিক। এই প্রদেশের নায়েবে নাজীম পদ নিজামতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ও সর্বাপেক্ষা লোভনীয় পদ বলে বিবেচিত হতো; কারণ এটিই ছিলো সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। মুর্শিদ কুলী খাঁ তখন বাংলার সুবেদার। এমন একটি পদ পরিবারের বাইরে অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে চলে যাবে, মুর্শিদ কুলী খাঁ তা চাইতে পারেন না। সুতরাং তাঁর কন্যার জামাতা মীর্জা লুৎফুল্লাহ্ এই পদ প্রাপ্ত হলেন। তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে সমস্ত ক্ষমতা মীর হাবীব নামক একজন ভাগ্যান্বেষী ইরানীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মীর হাবীব পারস্যের সিরাজ নগর থেকে ভাগ্যান্বেষণে এদেশে আগমন করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি লেখাপড়া জানতেন না। অথচ অপরিসীম বুদ্ধি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ কালে তিনি একটি নতুন রাজ্য জয় করে এর কলেবর বৃদ্ধি করেছিলেন। ইতিপূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে ছিলো। এইবার এটি সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বাংলার অঙ্গীভূত হলো। অরণ্য সমাকীর্ণ এই অঞ্চলটি ছিলো হস্তীদের রাজ্য। বখতিয়ার খিলজী, মীর জুমলা এবং আরও বহু মুসলমান সেনাপতি এই রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে বহু দূর পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বহু ধনরত্ন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন; কিন্তু স্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো চেষ্টা করেননি। যা হোক, ত্রিপুরা রাজপরিবারের মধ্যে বিরোধ ও গোলযোগ ঢাকায় মোগল নায়েবে নাজীমের হাতে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিলো।

রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃব্যের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। তিনি রাজ্য থেকে পলায়ন করে আগা সাদিক নামে একজন মুসলমান জমিদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আগা সাদিকের সাথে মীর হাবীবের বন্ধুত্ব ছিলো। আগা সাদিক তাঁর অতিথির কাহিনী উজির হাবীবের কর্ণগোচর করলে মন্ত্রী এ সুযোগ লুফে নিলেন। মীর্জা লুৎফুল্লাহ্‌র কাছ থেকে এক পরওয়ানা বের করে নিয়ে তিনি সসৈন্যে মেঘনা পার হয়ে সোজা ত্রিপুরার রাজধানীর পথে ধাবিত হলেন। রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র পথপ্রদর্শকরূপে সাথে চললেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে রাজা হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হলো। অনেক শর্ত মেনে নিয়ে কার্যতঃ ঢাকাস্থ মোগল শক্তির অধীনতাপাশে আবদ্ধ হলেন তিনি। ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলমান ফৌজ রেখে দেওয়া হলো। এই রাজ্যের নাম ত্রিপুরা স্থলে রোশনাবাদ রাখা হলো। মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বান্ত অঞ্চল —যেখানে সূর্য তার আহ্নিক আবর্তনের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম উদিত হয়ে গোটা সাম্রাজ্যকে আলোকে উদ্‌ভাসিত করবে—এইভাবে রোশনাবাদ বা আলোকের দেশ নামপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

শুজা উদ্দীন খাঁ তখন মুর্শিদাবাদে নাজীম পদে অধিষ্ঠিত। মুর্শিদ কুলী খাঁর দুহিতা জয়তুন্নেসাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর প্রতিনিধির ত্রিপুরা বিজয়ের পর তিনি তাঁকে উড়িষ্যায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কারণ সেখানে একজন শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। শুজা উদ্দীন খাঁ তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁকে পূর্ব বাংলার নায়েবে নাজীম নিযুক্ত করলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর তেজস্বিনী কন্যা জয়তুন্নেসার প্রবল রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো। তিনি একমাত্র পুত্র সরফরাজকে দূরে পাঠাতে অস্বীকার করলেন। সরফরাজ মুর্শিদাবাদে রয়ে গেলেন এবং যশোবন্ত রায় ও সৈয়দ গালিব আলী খান নামক দু'জন প্রতিনিধিকে ঢাকায় পাঠানো হলো। যশোবন্ত রায় দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। তিনি সৈয়দ গালিব আলী খানের সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী

শাসনকার্য নির্বাহ করবেন বলে আদিষ্ট হলেন। যশোবন্ত রায় মুর্শিদ কুলী খাঁর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। শাসনকার্য ও রাজস্ব বিষয়ে তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মীর হাবীব যে-সব একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যশোবন্ত রায় সেগুলোর বিলোপ সাধন করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। যশোবন্ত রায় ও সৈয়দ গালিব আলী খানের যুগ্ম শাসনে ঢাকায় অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিলো। এই সময় আবার চাউলের দর টাকায় আট মণে নেমে আসে। ষাট বছর আগে শায়েস্তা খাঁ ঢাকা নগরীর যে পশ্চিম তোরণটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, অনেক ধুমধাম ও আনন্দ-উৎসব করে তা আবার খুলে দেওয়া হলো।

কিন্তু অতি অল্পকালের জন্যেই এই সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিলো। সরফ-রাজ মুর্শিদাবাদে বাস করতেন। এক মহিলার দ্বারা তিনি অত্যধিক পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্রী এই মহিলার নাম নফিসা বেগম। ইনি মাতা জয়তুন্নেসার মতোই একগুঁয়ে ও প্রতিপত্তিশালিনী ছিলেন। তিনি মীর গালিব আলী খানকে ঢাকা থেকে প্রত্যাহার করে তাঁর স্থানে তাঁর জামাতা মুরাদ আলীকে নিয়োগ করার জন্যে সরফরাজকে সম্মত করালেন। মুরাদ আলী তাঁর সাথে রাজবল্লভ নামক এক ব্যক্তিকে ঢাকায় আনলেন। এই ব্যক্তি তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। রাজবল্লভের সহযোগিতায় মুরাদ আলী এমন অত্যাচার ও অবিচার শুরু করে দিলেন যে, অচিরেই ঢাকা থেকে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিদায় নিলো। সমৃদ্ধিশালী এই নগরী দ্রুত দারিদ্র্য আর দুর্দশার কবলে পতিত হলো। দেওয়ান যশোবন্ত রায় ও সৈয়দ গালিব আলীর অক্লান্ত চেষ্টায় ঢাকায় যে শান্তি ফিরে এসেছিলো, মুরাদ আলী ও রাজবল্লভের নির্যাতনপূর্ণ শাসনের ফলে তা ধ্বংস হয়ে গেলো। ক্ষমতাহীন দেওয়ান যশোবন্ত রায় এই ধ্বংস প্রতিরোধ করতে না পেরে তাঁর পদে ইস্তফা দিলেন। সকল ক্ষমতা মুরাদ আলী ও তাঁর মোসাহেবের কুক্ষি-গত হয়ে পড়লো।

এই সময়ে ইরানের নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন এবং দিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় শক্তির তখন মুমূর্ষু অবস্থা। সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তে অবস্থিত এই প্রদেশটির ওপর দিল্লীর কোনো কর্তৃত্ব ছিলো না বললেই চলে। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ এই প্রদেশের নাজীম পদ দখল করেন। তাঁর এই পদ দিল্লীর বাদশাহ্ কর্তৃক কখনো অনুমোদন লাভ করেনি বলেই মনে হয়। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বাংলাদেশ অচিরেই ক্ষমতা দখলের লড়াই ক্ষেত্রে পরিণত হলো। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়মাল্য শক্তিমানেরই কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকে। নারী প্রভাবে আচ্ছন্ন সরফরাজের মতো ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলো না। বেশীদিন রাজ্য শাসন করা তাঁর ভাগ্যে হয়ে উঠলো না। পর বছরই তিনি মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে যুদ্ধে নিহত হলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিহারের শাসনকর্তা আলীবর্দী খাঁ সুবেদারী হস্তগত করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সামত জঙ্গ নোওয়াযিশ মোহাম্মদকে ঢাকার নায়েবে নাজীম করে পাঠালেন। যে যুগে জবরদখলকৃত সিংহাসনকে নিষ্কন্টক রাখার জন্যে কোনো নৃপতি ভ্রাতৃহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে সেটি তেমন কোনো পাপ বা বড়ো অপরাধ বলে গণ্য হতো না, সেই যুগে আলীবর্দী খাঁ অনুকম্পা ও ক্ষমাশীলতার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। আলীবর্দী খাঁ তাঁর জামাতা নবনিযুক্ত নায়েবে নাজীমের তত্ত্বাবধানে তাঁর ভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী সরফরাজ খাঁর বিধবা পত্নী ও দুই পুত্রকে প্রেরণ করেন এবং ঢাকায় অবরোধাবস্থায় তাঁদের সম্মানিতভাবে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করে দেন। তখনকার দিনের বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজনাময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে এঁরা জিনজিরা প্রাসাদে বহুদিন ধরে শান্তির সাথে বসবাস করেন। বুড়িগঙ্গার পশ্চিম তীরে এই সুরম্য প্রাসাদটি ইব্রাহীম খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিলো। এই প্রাসাদেই সরফরাজ খাঁর উদ্ধত-স্বভাব ভগ্নী নফিসা বেগমকে অবসর জীবন যাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। তিনি ভ্রাতার পরিবারের প্রতি এতো অনুরক্ত ছিলেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্র আগা বাবাকে তাঁর

উত্তরাধিকারীরূপে দত্তক গ্রহণে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলে তিনি 'নোওয়াযিশ মোহাম্মদের হেরেমের তত্ত্বাবধানকারিণী নিযুক্ত হতেও রাজী হন।' আগা বাবা পিতা সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভাইয়ের সন্তানের প্রতি কতখানি মমতা থাকলে নফিসা বেগমের মতো একজন দাম্ভিক ও উদ্ধত-স্বভাব নারী তাঁর পক্ষে অমর্যাদাকর এরূপ একটি পদ গ্রহণ করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গর্ব ও সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ ছিলো। তিনি এমনভাবে চলাফেরা করতেন, যাতে করে নোওয়াযিশ মোহাম্মদ তাঁকে দেখতে না পান। প্রয়োজনীয় বিষয়ে যখন তাঁদের মধ্যে কোনো আলোচনা হতো, তখন দু'জনের মাঝখানে থাকতো একটা পর্দা। যে শিশুটির জন্যে তিনি তাঁর সমগ্র সত্তাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, সে আর এক ব্যক্তির অপরিসীম স্নেহ-মমতা লাভ করেছিলো। এই ব্যক্তির নাম রহিম উল্লাহ্ খান। তিনি পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন এবং 'সমগ্র সেনাবাহিনীর মধ্যে ধনুর্বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলো না।' আগা বাবার জন্যে তিনি মীর কাসিম খানের আমলে কারাবরণ করেছিলেন।

সরফরাজ খাঁর মতো নোওয়াযিশ মোহাম্মদও অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদেই কাটাতেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে শাসন করলেও তাঁর আমলের ঢাকার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে ঢাকায় আর একটি নাটকীয় ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই শহরের ইতিহাসের সাথে যে-সব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপ জড়িত হয়ে আছে, তার সাথে আর একটির যোজনা হয়। বাংলার বৃদ্ধ নওয়াব আলীবর্দী খান মারাঠাদের (বর্গীদের) সাথে দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ের পর শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং জীবনের শেষ দিনগুলো মুর্শিদাবাদের সুরম্য প্রাসাদে অতিবাহিত করছিলেন। বিপথগামী দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে তিনি গোটা প্রদেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা না করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের সুবেদাররূপে তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। কিন্তু আলীবর্দীর জামাতা নোওয়াযিশ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দৌলার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিলেন।

নোওয়াযিশ মোহাম্মদ আলীবর্দীর কন্যা ঘসেটি বেগমকে বিবাহ করেছিলেন। ষড়যন্ত্রের নিঃশ্বাসে যেনো বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। চক্রান্তের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আর আলীবর্দী অশীতিবর্ষ বয়সে পদার্পণ করেন। ক্রমেই তিনি অশক্ত হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে এক সুযোগ এসে গেলো। সিরাজউদ্দৌলা সে-সুযোগটি কাজে লাগাতে দেরী করলেন না। নোওয়াযিশ হোসেন কুলী খাঁকে মুর্শিদাবাদে তাঁর মন্ত্রী ও কুলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন উদ্দীনকে ঢাকায তাঁর সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন। আগা সাদিক নামে বাখেরগঞ্জের এক জমিদার-পুত্রের সাথে হোসেন উদ্দীনের এক প্রবল সংঘর্ষ বাধে। হোসেন কুলী খাঁর কোনো এক সিদ্ধান্তে আগা সাদিক খুব রাগান্বিত হয়ে পড়েন এবং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খোদ নোওয়াযিশ মোহাম্মদের কাছে আপীল করার জন্যে মুর্শিদাবাদে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি ব্যর্থকাম হলেন। শুধু তাই-ই নয়—প্রবল প্রতাপ উজীর হোসেন কুলী তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। আগা সাদিক এরূপ ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং সিরাজউদ্দৌলার শরণাপন্ন হলেন। সিরাজউদ্দৌলা হোসেন উদ্দীন খাঁর স্থলে তাঁকে নায়েব নিযুক্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সাহায্যে তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করে ঢাকায় চলে আসেন এবং পিতা মোহাম্মদ বাকেরসহ হোসেন উদ্দীন খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করেন। একদল সশস্ত্র লোক নিয়ে গভীর রাতে তাঁরা নদীর দিক দিয়ে গোপনে প্রাসাদে ঢুকে পড়েন এবং ঘুমন্ত অবস্থায় হোসেন উদ্দীন খাঁকে হত্যা করেন। কিন্তু আগা সাদিক ঢাকার অধিবাসীদের চিনতেন না। হোসেন উদ্দীন খাঁ ন্যায় ও নিরপেক্ষ নীতির দ্বারা তাদের শাসন করেছিলেন। ইতিমধ্যে সিরাজউদ্দৌলার বাড়াবাড়ি ও অত্যাচারের স্পষ্ট গুজবও ঢাকায় পৌঁছে গিয়েছিলো। সকালে তারা হোসেন উদ্দীন খাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনামাত্রই সবাই মিলে প্রাসাদ ঘেরাও করলো। আগা সাদিক ও তাঁর পিতা ঢাকার শাসন কর্তৃত্ব দখল করার অভিসন্ধি করেছিলেন। সমবেত জনতা আগা সাদিকের কাছে তাঁর নায়েবে নাজীম পদে নিযুক্তির সনদ দাবী করলে

তিনি হোসেন উদ্দীনের রক্তরঞ্জিত ঝুলন্ত একটি তরবারির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করলেন। এক উত্তাল জনতরঙ্গ প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়লো। তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলো এবং হাতের নাগালে মোহাম্মদ বাকেরকে পেয়ে তাঁকে হত্যা করলো। আগা সাদিক কোনো রকমে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচালেন। শক্তি প্রয়োগে ঢাকার ক্ষমতা দখলের এটিই শেষ প্রচেষ্টা এবং সে প্রচেষ্টা এভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সকল কুকীর্তির মধ্যে হোসেন উদ্দীন খাঁ ও তাঁর পিতৃব্যের অমানুষিক হত্যাই সিরাজউদ্দৌলার বিবেককে সবচেয়ে পীড়িত করে তুলেছিলো। এই ঘটনার কিঞ্চিদধিক এক বছর পর পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়নকালে এক ফকিরের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ধৃত হন। বন্দী অবস্থায় তিনি মুর্শিদাবাদে নীত হন এবং তাঁর সিপাহ্সালারের পুত্র মীরনের আদেশে স্বীয় প্রাসাদেই নিহত হন। কথিত আছে, যে প্রকোষ্ঠে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো, সেখানে ঘাতক প্রবেশ করামাত্রই তিনি এই বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন, 'হোসেন কুলী খাঁর হত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমাকে মরতেই হবে।' ঘাতক তার তরবারি দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করে সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করলো। কুড়ি বছর বয়সের এই হতভাগ্য যুবক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি নাকি চীৎকার করে বলেছিলেন, 'হোসেন কুলীর দাদ নেওয়া হয়ে গেলো।'

রাজবল্লভের হাতে এতোদিন নৌ-বিভাগ্যের দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিলো। নোওয়াযিশ মোহাম্মদ তাঁকে শাসনকার্যে নিয়োগ করলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি চক্রান্তকারীদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াফত করলেন এবং রাজনগরের বিপুল জমিদারী আত্মসাৎ করলেন। রাজবল্লভ সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্র ছিলেন না। সামান্য কাল মাত্র তিনি শাসন কর্তৃত্ব ভোগ করেছিলেন। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই অন্ততঃ দু'কোটি টাকা জমিয়েছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মুরুব্বীর মৃত্যু হলো এবং এর তিন মাস পর বৃদ্ধ সুবেদার আলীবর্দী খাঁ প্রাণত্যাগ করলে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব সিরাজদ্দৌলার হাতে

এলো। প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুগ্রহভাজন রাজবল্লভের প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। ঢাকার উপশাসক থাকাকালে রাজবল্লভ যে অর্থ সঞ্চয় করেন, সিরাজউদ্দৌলা তার একটা মোটা অংশ দাবী করলে রাজবল্লভ ভীত হয়ে পড়েন এবং অসদুপায়ে সঞ্চিত বিপুল অর্থ পুত্রের হাতে দিয়ে রাত্রিকালে তাকে গোপনে শহরের বাইরে পার করে দেন। প্রচার করে দেওয়া হলো যে, পুত্র জগন্নাথ দেবের মন্দিরে তীর্থ করতে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ইংরেজদের আশ্রয় নিতে যায়। রাজবল্লভ যে তার অর্থের নিরাপত্তার জন্যে ইংরেজদের মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাতেই প্রতীয়মান হবে যে ইংরেজগণ ইতিমধ্যেই বাংলার রাজনীতিতে কিরূপ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করেছিলো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার অভিযান প্রেরণের অন্যতম কারণ এই যে, রাজবল্লভের পুত্র এবং তার সাথে প্রেরিত ধন ইংরেজগণ তাঁর হাতে সমর্পণ করতে অসম্মত হয়েছিলো। যা হোক, সিরাজ-উদ্দৌলার এই অভিযানের পরিণতি অন্ধকূপ হত্যা এবং চূড়ান্ত পরিণাম তাঁর পতন এবং বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালটি ঢাকাস্থ ক্ষুদ্র ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে অত্যন্ত উত্তেজনাময় কাল। স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তাদের একান্ত করুণার ওপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছিলো। নওয়াব জেসারত খাঁ ইচ্ছা করলে শুধুমাত্র সংখ্যা-শক্তির বলেই মুষ্টিমেয় কয়টি লোককে পর্যুদস্ত এবং উৎখাত করে দিতে পারতেন। কলকাতা নিরাপদ ছিলো না। পরবর্তী ঘটনাবলীতেই প্রমাণিত হয় যে, কলকাতা থেকে এগারো দিনের পথ এই ঢাকায় অবস্থানরত কোম্পানী-এজেন্ট কত বড় ঝুঁকি মাথায় নিয়েছিলেন। তিনি যেসব বিপদের মধ্যে এখানে বাস করছিলেন, সেগুলোর মোকাবেলার জন্যে প্রচুর সাহস ও কুশলতার প্রয়োজন ছিলো। শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবেলার কথা তুললে সেখানে ইংরেজগণ ছিলো একান্ত অসহায়। ইয়োরোপীয়গণ যে মর্যাদা অর্জন করেছিলো, তাই-ই ছিলো তাদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। তারা এমন মর্যাদার আসনে নিজেদের

প্রতিষ্ঠিত করেছিলো যে, সিরাজউদ্দৌলাও স্বয়ং তাঁর বিজয়সাফল্যকালে তাদের বিরুদ্ধে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকেন। সেরূপ চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অন্ততঃ সাময়িক কালের জন্যে তিনি বাংলাদেশ থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তিকে নির্মূল করে ফেলতে পারতেন। ঢাকায় ইংরেজদের যে প্রভূত পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো, তার তুলনায় কোম্পানীর কর্মচারী-সংখ্যা ছিলো অস্বাভাবিক রকম কম। রিচার্ড বেচের ছিলেন কুঠির অধ্যক্ষ। তাঁর অধীনে ছিলেন উইলিয়াম সামনার। ঐ সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন লিউক স্ক্র্যাফ্‌টন, টমাস হীওম্যান, স্যামুয়েল ওয়ালার, জন কার্টিয়ার ও জন জনস্টান। সৈন্যদের ভার ছিলো লেফ্‌টন্যান্ট কাডমোরের ওপর আর কোম্পানীর চিকিৎসক ছিলেন ন্যাথনিয়েল উইলসন। ঐ সময় অন্ততঃ তিন জন ইংরেজ মহিলার ঢাকায় অবস্থানের কথা জানা যায়। এঁরা হচ্ছেন মিসেস বেচের, মিসেস ওয়ারউইক ও মিস হার্ডিং। কুঠিটি ছিলো 'একটা সাধারণ গৃহের চেয়ে সামান্যমাত্র উন্নত। ইটের পাতলা দেওয়ালটির অর্ধাংশ নয় ফুটের বেশী উঁচু ছিলো না।' এ ধরনের কুঠিকে মোটেই সুরক্ষিত বলে মনে করা যেতে পারে না। লেফ্‌টন্যান্ট কাডমোরের অধীনস্থ সৈন্যদলে ছিলো মাত্র চারজন সার্জেন্ট, তিন জন কর্পোর‍্যাল, উনিশ জন ইয়োরোপীয় এবং চৌত্রিশ জন কৃষ্ণকায় খ্রীস্টান ও ষাট জন বাকসারী সৈন্য।' শেষোক্ত সৈন্যগণ বোধ হয় পর্তুগীজদের শঙ্কর বংশধর।

এরূপ অবস্থায় প্রতিরোধের প্রশ্নই অবান্তর। ৯ই জুন কলকাতা কাউন্সিলের এক নির্দেশে ঢাকাস্থ এজেন্টকে কোম্পানীর মালপত্র গুছিয়ে নিতে এবং বিপদ আরও ঘনীভূত হয়ে পড়লে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলা হলো। কলকাতার অদৃষ্টে কি ঘটলো তা জানার জন্যে ইংরেজগণ বহু দূরের এই ঢাকা কুঠিতে অধীর প্রতীক্ষায় দিন যাপন করতে লাগলো। কারণ, কলকাতার ওপরই তাদের এবং বাংলার সমস্ত ইংরেজ-কুঠির অস্তিত্ব নির্ভর করছিলো। অবশেষে ২৭শে জুন নওয়াব

জেসারত খাঁর এক ঘোষণায় তারা জানতে পেলো যে, কলকাতার পতন হয়েছে এবং ড্রেক পলায়ন করেছেন। তাদের সবচেয়ে বড় আশঙ্কাটি কার্যে পরিণত হলো। সাথে সাথে সিরাজউদ্দৌলার নিকট থেকে ঢাকাস্থ ইংরেজ-কুঠি দখল এবং কোম্পানীর আমলাদের কারাগারে নিক্ষেপ করার নির্দেশ এলো।

ঢাকা-কাউন্সিল এই দুঃসংবাদে এমন হতভম্ব হয়ে গেলো যে, প্রথমে এটি তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি—ভেবেছিলো, তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এটি একটি কৌশলমাত্র। কাউন্সিলের তৃতীয় স্থানীয় সদস্য স্ক্র্যাফটন ঢাকাস্থ ফরাসী কুঠিয়াল এম. কোর্টিনের কাছে প্রেরিত এক পত্রে এ সংবাদের সত্যাসত্য জানতে চান। চন্দননগরে ইতিমধ্যেই পত্রাদি এসে গিয়েছিলো। এম. কোর্টিন এই সব পত্র ইংরেজদের অবগতির জন্য তাদের কুঠিতে পাঠিয়ে দিলেন। সংবাদের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ রইলো না। কলকাতার পতন হওয়ায় সেখান থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আর পথ রইলো না। কাজেই আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। ঐ সময় সিরাজউদ্দৌলার সাথে ফরাসীদের সম্পর্ক ভালো ছিলো। ঢাকাস্থ ইংরেজ-কাউন্সিল এম. কোর্টিনের কাছে এই মর্মে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত করলো, যেনো ইংরেজ কুঠির আমলাদের প্রতি যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার প্রদর্শনের জন্যে তিনি স্থানীয় শাসক জেসারত খানের নিকট সুপারিশ করেন। ইংরেজদের সেই বিপদের দিনে ফরাসিগণ প্রকৃত বন্ধুরই পরিচয় দান করেছিলো। ফরাসীদের প্রতি ইংরেজ-কাউন্সিল তার কৃতজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছে: 'এই বেদনাময় মুহূর্তে তারা সর্বক্ষেত্রেই আমাদের প্রতি যে-আচরণ করেছে, আমাদের জাতি তজ্জন্য তাদের কাছে ঋণী।' এম. কোর্টিন যে কেবল ইংরেজদের প্রতি কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকার জন্যে নওয়াবকে প্রলুব্ধ করেছিলেন, তাই নয়—বরং তাদের সবাইকে ফরাসী-কুঠিতে আশ্রয় গ্রহণের অনুমতিও তিনি আদায় করেছিলেন। তিনি স্বয়ং তাদের জামীন হলেন। কোম্পানীর সকল সম্পত্তি আটক করা হলো। এই সম্পত্তির মূল্য ছিলো চৌদ্দ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর

আমলাদের পরিচ্ছদ ছাড়া কোনো মূল্যবান বস্তু ফরাসীদের কুঠিতে নিয়ে যেতে দেওয়া হলো না। নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের জন্যে ত'দের ফরাসীদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিলো। ফরাসিগণ অবশ্য তাদের প্রতি উদারতম ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলো। ফরাসিগণ তখন কি ভাবতে পেরেছিলো, যে নিঃসম্বল ইংরেজ কোম্পানীটির প্রতি বিরাট সাহসিকতার সাথে তারা বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করছে, বছর ঘুরে না আসতেই সেই কোম্পানীই তাদের কুঠি দখল করে নেবে এবং ঢাকা থেকে তাদেব (ফরাসীদের) বিতাড়িত করবে ?

দু'মাসেরও অধিক কাল ধরে ফরাসিগণ ইংরেজদের প্রতি যথেষ্ট আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছিলো এবং তাদেরই চেষ্টায় ইংরেজদের কোম্পানীর জাহাজগুলোতে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে আনা সম্ভব হয়েছিলো। কাসিমবাজারস্থ ফরাসী-কুঠির অধ্যক্ষ মঁ লা'র মধ্যস্থতায় এই অনুমতি দানে সিরাজউদ্দৌলাকে সম্মত করা গিয়েছিলো। ইংরেজগণ কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলো, মঁ লা'র স্মৃতিকথায় এই সব ঘটনাবহুল সঙ্কটময় দিনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। নওয়াবের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করার ব্যাপারে তাঁকে যে-সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়েছিলো, তা লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সিরাজউদ্দৌলা দু'তিনটি পরমাসুন্দরী ইংরেজ মহিলার সংবাদ জানতে পেরে তাদের তাঁর হারেমবাসিনী করার জন্যে লুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন।' কিন্তু ঢাকার ইংরেজগণ প্রাণে বাঁচলেও তাদের সম্পত্তি বাঁচলো না —সবাই বাজেয়াফত করে নেওয়া হলো। তখনও তারা মঁ কোর্টিনের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল এবং তঁারই চেষ্টায় তারা কলকাতায় তাদের স্বজাতিদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ২০শে আগস্ট ফরাসীদের একটি ক্ষুদ্র পোতে কোম্পানীর আমলাগণ কলকাতায় পৌঁছে।

বেচের ও তাঁর সাথীরা কলকাতা-শিবিরে ফলতা-কুঠির অবশিষ্ট সদস্যদের নিশ্চয় খুব মুহ্যমান অবস্থায় দেখতে পান। কিন্তু তাদের দুঃখের রজনী প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো। মাদ্রাজ থেকে কর্নেল ক্লাইভ ও এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের আগমনের সাথে সাথেই তাদের চোখে আবার আশার আলো

জ্বলে উঠলো। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ামের পতনের ছয় মাস পরে সেখানে আবার ইংরেজদের পতাকা উড্ডীন হলো এবং ইংরেজ কোম্পানী সন্দেহ-দ্বিধা সত্ত্বেও এই প্রদেশে তার ভিত্তি মজবুত করে তুললো। সাথে সাথেই ঢাকা-কুঠি পুনর্দখলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। ২৮শে জানুয়ারী ক্লাইভ মাদ্রাজে সিলেক্ট কমিটিকে লিখলেন, 'ঢাকা অভিযানের প্রস্তুতি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। ক্যাপ্টেন স্পেকের নায়কত্বে চারশত নৌসেনা এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে।' ৮ই মার্চ অভিযানকারীদল ঢাকায় উপস্থিত হলো এবং ইংরেজ-কুঠি অধিকার করলো। সামনার ও ওয়ালার ফিরে এলেন ; কিন্তু কোম্পানীর ব্যবসায় পুনরায় শুরু করতে তাঁদের বেগ পেতে হলো। ২৩শে মার্চ তাঁরা কলকাতায় পত্র লিখে জানালেন যে, জেসারত খাঁ কুঠির কামান ফিরিয়ে দিতে এবং নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার নূতন পরওয়ানা না পাওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যবসায় চালাতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। কাউন্সিল নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে এতো ব্যস্ত ছিলো এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো যে, সঙ্গে সঙ্গেই কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলো না। নূতন পরওয়ানা পাওয়া গেলেও ঢাকাস্থ এজেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, প্রয়োজন হলে তাঁর কুঠির নিরাপত্তার ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হবে। কাউন্সিল শুধু লক্ষ্মী-পুরে একটি সশস্ত্র জাহাজ প্রেরণ করলো যাতে করে ঢাকা ছেড়ে আসতে বাধ্য হওয়ার মতো পরিস্থিতির আবার উদ্ভব হলে তারা এই জাহাজে করে চলে যেতে পারে। সামনার ও ওয়ালার বেগতিক বুঝে কোম্পানীর সমস্ত মূল্যবান পণ্য নদীর ভাটিতে প্রেরণ করলেন এবং ঐ জাহাজে এগুলো মজুদ করলেন। তাঁরা পরবর্তী সংবাদের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন এবং সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে যাতে করে নিরাপদে পলায়ন করা যায়, তজ্জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলেন। বাইরে তাঁরা খুব সাহস দেখাতে লাগলেন ও পূর্ণোদ্যমে ব্যবসায় চালাতে শুরু করলেন। কোনো দুঃসংবাদ আর এলো না। আস্তে আস্তে তাঁদের মধ্যে আস্থা ফিরে এলো। অবশেষে ২৩শে জুন পলাশী-যুদ্ধে ক্লাইভের

জয়লাভের সংবাদ আসার সাথে সাথেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন যে, চিরকালের জন্যে তাঁদের বিপদ কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে ফরাসী-কুঠির দুর্দিন নেমে এলো। বছরের প্রথম ভাগেই ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের সংবাদ জানা গেলো। ঐ বছরের ১৩ই মার্চ চন্দন-নগরের ফরাসী শাসনকর্তাকে আত্মসমর্পণ করার জন্যে ক্লাইভ তাঁর বিখ্যাত 'সমন' প্রেরণ করলেন। দশ দিন পর ফরাসী দুর্গ ইংরেজদের হস্তগত হলো। ঢাকাস্থ ইংরেজ এজেন্টদের এখানকার ফরাসী-সম্পত্তি দখল করার নির্দেশ দেওয়া হলো। যে-ফরাসীদের কুঠিতে এই কিছুদিন আগে ইংরেজগণ আশ্রয় লাভ করেছিলো এবং মঁ কোর্টিনের হাতে এতো সদয় ব্যবহার পেয়েছিলো, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পেয়ে ঢাকাস্থ ইংরেজ এজেন্টগণ বড়ই বিব্রত বোধ করতে থাকেন। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তাঁরা ক্লাইভের নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের কথা ফরাসীদের জ্ঞাপন করা ছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিয়েছিলো না বলে মনে হয় এবং ২২শে জুনের পূর্বে মঁ কোর্টিন এবং তাঁর অনুচররা ঢাকা ত্যাগ করেননি। ইংরেজ-এজেন্ট-গণ ফরাসীদের ঔদার্যের কথা বিস্মৃত হননি; তাঁদের দুর্দিনে এজেন্টগণ যথোপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন করেছিলো। ইংরেজ কোর্টিনকে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চাইলো। তবে শর্ত দেওয়া হলো যে, ফরাসী কুঠি এবং কোম্পানীর সকল সম্পত্তি ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁকে পণ্ডিচেরী চলে যেতে হবে। অবশ্য কোর্টিন এই প্রস্তাবটিকে অবমাননাকর বলে মনে করেছিলেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন। তবে মনে হয়, তাঁর ওপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি। এবং তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করতে দেওয়া হয়েছিলো।

প্রাচ্যের এই রাজধানীতে রাজনৈতিক নাটকের যে সব দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ফরাসীদের বিদায়-পর্বটিও কম আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের কুঠি ছিলো নদীর তীরে। ১৭৫৭ সালের ২২শে জুন সেখান থেকে তারা পঁয়ত্রিশটি নৌকার এক নৌবহরে করে যাত্রা

করলো। এই দলে ছিলেন কোর্টিন, চেভেলিয়ার, গ্রেয়ার, গুরলেড, একজন অগাস্টিন যাজক, কুঠির পুরোহিত, চিকিৎসক, আটজন ইয়োরোপীয় সৈনিক, সতের জন গোলন্দাজ, চার-পাঁচ জন ভৃত্য এবং কুড়ি থেকে ত্রিশ জন পিয়াদা। কাসিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ মঁশিয়ে লা'র সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে তাঁরা যাত্রা করলেন। কিন্তু ঢাকা ত্যাগের কয়েকদিন পরই তারা পলাশী-যুদ্ধের সংবাদ অবগত হলেন। পরবর্তী আট মাস তঁারা উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যাযাবরদের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তঁারা এই আশায় দীর্ঘদিন যাপন করলেন যে, পণ্ডিচেরী থেকে সাহায্য আসবে। কিন্তু বহু-প্রতিক্ষীত সে সাহায্য আর এলো না। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। কিন্তু অবশেষে হতোদ্যম হয়ে মুর্শিদাবাদস্থ ইংরেজদের করুণার ওপর নিজেদের ছেড়ে দিলো। দু'বছর আগে ইংরেজগণ তাঁর হাতে যেরূপ সম্মানজনক ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার লাভ করেছিলো, কোর্টিন ইংরেজদের হাতে মুর্শিদাবাদেও সেরূপ ব্যবহার পেয়েছিলেন। তঁাকে যুদ্ধবন্দীরূপে আটকও করা হয়েছিলো। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই ক্লাইভ তঁাকে পণ্ডিচেরীতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। ঐ পত্রে কোর্টিনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ক্লাইভ লিখেন, 'আমি এই মুহূর্তে আমাদের সেনানায়ককে দু'টো কামান আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আপনি ইংরেজদের প্রতি বরাবর যেরূপ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়ে এসেছেন, তজ্জন্য এই সুযোগে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

বৃটিশ শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে নাটকের শেষ শোকাবহ অঙ্কটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর জিনজিরা-প্রাসাদে হীনাবস্থায় নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পরিবার-পরিজনবর্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আলবর্দী খাঁর অনুগ্রহে সরফরাজ খাঁর বেগম ও সন্তানগণ পূর্বেই এখানে স্থান লাভ করেছিলেন এবং অনেকদিন যাবৎ তাঁরা এখানে বাস করে আসছিলেন। যা হোক নওয়াব সিরাজদ্দৌলার পরিবারের সাথে আলীবর্দী

খাঁর দুই কন্যা ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকেও আনা হয়েছিলো। ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগম উভয়েই পিতার রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ-গ্রহণ করেছিলেন। নোওয়াযিশ্ মোহাম্মদের সাথে ঘসেটি বেগমের বিবাহ হয়েছিলো। নোওয়াযিশ মোহাম্মদ ষোল বছর যাবৎ ঢাকার নায়েবে নাজীম ছিলেন। ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদে নওয়াব-প্রাসাদে প্রচুর বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রচুর ধন-দৌলত নিয়ে মুর্শিদাবাদের কাছে অপূর্ব সুন্দর মতিঝিল প্রাসাদে তাঁর প্রেমিক নুজুর আলীসহ প্রচুর শান-শওকত ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে বেশীদিন কাটলো না। মতিঝিল প্রাসাদে গমনের ছয়মাস যেতে না যেতেই পিতা আলীবর্দী খাঁ প্রাণত্যাগ করলেন এবং ভগিনী-পুত্র সিরাজউদ্দৌলা সুবেদার পদে অভিষিক্ত হলেন। সিরাজউদ্দৌলার সুবেদারী লাভের পথে পিতার জীবদ্দশায় ঘসেটি বেগম প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণের পর সিরাজউদ্দৌলা ঘসেটি বেগমের কাছে তাঁর স্বামীর পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ দাবী করলেন। কিন্তু ঘসেটি বেগম ছিলেন তেজস্বিনী রমণী। তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে তাঁর মতিঝিল প্রাসাদ রক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর সকল অনুচর, পরিচারক ও কর্মচারী তাঁকে পরি-ত্যাগ করে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে গেলেন। তাঁর প্রেমাস্পদ মীর নুজুর আলী পনের লক্ষ টাকার হীরা-জহরত নিয়ে বানারসে পলায়ন করলেন। অবশেষে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হলো। সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদল মতি-ঝিলে প্রবেশ করে অপরিমিত ধন-সম্পদ নিয়ে গেলো এবং ঘসেটি বেগমকে প্রাসাদ থেকে বহিষ্কার করলো। পরিচারিকাদের সাথে একই নৌকায় করে তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো—প্রাপ্য কোনো মর্যাদাই তাঁকে প্রদর্শন করা হলো না। সেখানে 'অবমাননাকর ও লজ্জাকর অবহেলার' মধ্যে তিনি জিনজিরা-প্রাসাদে সরফরাজ খাঁর পরিবারের সাথে মিলিত হলেন।

ঘসেটি বেগম জিনজিরা-প্রাসাদে নির্বাসিতা হওয়ার কয়েক মাস পরেই তাঁর অনুজা আমিনা বেগমও সেখানে তাঁর সাথে মিলিত হলেন—বহুদিন

ধরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার পর অদৃষ্টের পরিহাসে দুর্দিনের সহযাত্রিণী হলেন তাঁরা। আমিনা বেগম তাঁর জীবনে যে-সব ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন ও ভাগ্যবিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই বিক্ষিপ্ত যুগেও সেগুলো ছিলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও বিস্ময়কর। চূড়ান্ত বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতা সুবেদারতনয়া আমিনা বেগমের পরিণয় হয়েছিলো তাঁর চাচাতো ভাই সৈয়্যদ আহমদের সাথে। বিহারের শাসনকর্তা সৈয়্যদ আহমদের সাথে পাটনায় জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিনগুলো অতিবাহিত করেন। একটা সশস্ত্র বিদ্রোহ তিনি চোখে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন পাটনার বহির্দ্বারে মোস্তাফা খানের বিকৃত ঝুলন্ত শব—যেন তাঁর স্বামীর প্রবল পরাক্রমেরই প্রমাণ বহন করছিলো বিদ্রোহী নেতার মৃতদেহটি। এর পর তাঁর পরিবারের শত্রুরা পরাভূত হলে তিনি পুত্রদের বিবাহোৎসবে যোগদানের জন্যে যাত্রা করলেন। মুর্শিদাবাদে পিতার প্রাসাদে তাঁর মনোমত জাঁকজমক ও জৌলুসের সাথে বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হলো। এই উৎসবে যে বিপুল বিলাস ও সমারোহের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, তার তুলনা হয় না। যে আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, তা 'স্বর্গ-মর্ত্যকে আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলো।' উৎসবের নয়নাভিরাম দৃশ্যরাজি ও বহু বিচিত্র মিছিলের কথা সারা বাংলাদেশ জুড়ে বহু দিন ধরে কীর্তিত হয়ে এসেছিলো। সাম্রাজ্য-সমূহের পতনের পূর্বে এমনি এক ধরনের অপরিমিত বিলাস ও ব্যয়বাহুল্য রাজন্যবর্গকে পেয়ে বসে। পরবর্তী জীবনে আমিনা বেগম যখন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তখন হয়তো ক্ষণে ক্ষণে এই স্মৃতি তাঁর মনে ভেসে উঠতো এবং তাঁকে পীড়িত করে তুলতো। রাজদরবারের ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি সিংহাসন দখলের জন্যে স্বামীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁদের ষড়যন্ত্রকে কার্যে পরিণত করার জন্যে তাঁরা যে-সব আফগান প্রধানকে ডেকে এনেছিলেন, তারাই একদিন সৈয়্যদ আহমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে পাশবিকভাবে হত্যা করলো। আমিনা বেগমকে যুদ্ধবন্দিনীরূপে

শিবিরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে শ্বশুরকে বেধে তাঁর সামনে আনা হলো। শুরু হলো ভয়াবহ নির্যাতন। লুক্কায়িত ধন-সম্পদের সন্ধান জানার জন্যে একাদিক্রমে সতের দিন পর্যন্ত এই ভয়াবহ নির্যাতন অব্যাহত রইলো। নির্যাতনের সময়ে শ্বশুরের মর্মভেদী আর্তনাদ শুনার জন্যে আমিনা বেগমকে বাধ্য করা হয়েছিলো। তারপর প্রায় এক বছর ধরে শত্রু-শিবিরে তিনি বন্দিনীরূপে দুঃখময় ও উদ্বেগ-আকুল দিন যাপন করেন। পিতার সেনা-বাহিনীর আগমনের আশায় তিনি দিন গুণতে থাকেন। অবশেষে উদ্ধারলাভ করেন এবং আলীবর্দীর সাথে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর সকল আশা নিবদ্ধ হলো পুত্র সিরাজউদ্দৌলার ওপর। পিতার মৃত্যুর পর সিরাজ-উদ্দৌলা যাতে সিংহাসন লাভের পথ করতে পারেন, তজ্জন্য সাত বছর ধরে তিনি অভিসন্ধি আঁটতে থাকেন। তাঁর জয় হলো। সিরাজউদ্দৌলা সুবেদার হলেন। আবার এলো ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের দিন—কিন্তু অতি অল্প দিনের জন্যে। কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ যবনিকা নেমে এলো। প্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি। অকস্মাৎ একটা কোলাহল সচকিত করে তুললো তাঁকে। দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো রাস্তার দিকে। মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়ে নিতান্ত অশ্রদ্ধার সাথে পুত্রের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। বিয়োগবিধূরা জননী রীতি ও সংস্কারের প্রাচীর লংঘন করে পাগলিনী-বেশে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। জনতার ভিড় ছিন্ন করে তিনি পুত্রের মৃতদেহের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। কিন্তু বর্বর সৈন্যদল রোরুদ্যমানা জননীকে পুত্রের শব থেকে নির্মম হাতে বিচ্ছিন্ন করে টেনে-হেঁচড়ে দূরে নিয়ে গেলো। মৃত সন্তানের লাশটি দাফনের জন্যে তিনি করুণ আকুতি জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু শোকার্ত জননীর সেই শেষ মিনতিটুকুও দানবদের মনে কোনো আবেদন—কোনো কারুণ্যের সৃষ্টি করতে পারেনি। ব্যথা-বিহ্বলা জননীকে অচিরেই পাঠিয়ে দেওয়া হলো ঢাকায়। সেইখানে সেই জিন-জিরার জিন্দানখানায় আশ্রয় নিতে হলো তাঁকে। কোথায় গেলো সেই বিপুল ঐশ্বর্য আর বিলাস।

এইভাবে জিনজিরা-প্রাসাদ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁরা একে একে এসে জুটলেন। অদ্ভুত আশ্চর্য সহযাত্রী দল। মহানগরী ঢাকা থেকে বুড়ি-গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত জিনজিরা-প্রাসাদের দিকে লোকে যখন তাকাতো, বিস্ময় আর করুণায় দু'চোখ তাদের সজল হয়ে উঠতো। সরফরাজ খাঁর পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো প্রাসাদের সর্বোত্তম প্রকোষ্ঠগুলো। বন্দী জীবন যাপন করলেও প্রচুর বিলাসের মধ্যে তাঁরা বাস করছিলেন। তাঁদের অহঙ্কারী দুশমন আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম এই প্রাসাদে আনীত হলে সরফরাজ খাঁর পরিবার-পরিজনবর্গ নিশ্চয় প্রতি-হিংসা-মিশ্রিত আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। এর পর যখন কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগম চরম লাঞ্ছনার মধ্যে বিধবা পুত্রবধূর হাত ধরে এখানে এসে উপস্থিত হলেন, তখনও বুঝি তাঁদের মনে একই অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিলো। বালিকা পুত্রবধূটি বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন তাঁর সন্তানটিকে। কথিত আছে যে, তাঁদের আগমন-সংবাদে নদীতীরে একটি জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিলো। জিনজিরা-প্রাসাদে তাঁদের নিকটতম আত্মীয়া ঘসেটি বেগমও তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন না।

কিন্তু এখানেও খুব বেশীদিন তাঁদের আশ্রয় মিললো না। অতঃপর আর একটি মর্মান্তিক ঘটনার অনুষ্ঠান হলো। সিরাজ নিহত হলে ইংরেজগণ মীর জাফরকে হাত ধরে মসনদে বসিয়ে দিলো। তিনি আলীবর্দীর ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন। যা হোক, মীর জাফর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বলে শাসন পরিচালনার ভার পুত্র মীরনের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই তার নৃশংসতা ও কুকীর্তি সিরাজকেও হার মানায়। এই দানবটি ইতিপূর্বেই নগণ্য অপরাধের জন্যে দু'জন উচ্চ কর্মচারীকে হত্যা করে এবং হেরেমের দু' জন নারীর শিরচ্ছেদ করে। পাটনা রক্ষার জন্যে যাত্রাকালে তার বিরক্তিভাজন তিনশত লোকের নাম সে একটি নোট বুকে লিখে নিয়ে স্থির করলো যে, সেখান থেকে ফিরে এসে এদের সবাইকে হত্যা করবে। যাত্রার পূর্বেই সে ঢাকার শাসনকর্তা জেসারত খাঁকে এক পত্রে সিরাজউদ্দৌলার মাতা,

খালা, বিধবা পত্নী ও কন্যাকে কতল করার হুকুম দিলো। এই নিষ্ঠুর আদেশটির পেছনে কোনো যুক্তি ছিলো না, কোনো লক্ষ্য ছিলো না। কারণ, সমস্ত ধন-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে এই মহিলাগণকে জিনজিরার কারা-প্রাসাদে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো, এঁদের দ্বারা মীরনের বিপদের কোনো আশঙ্কাই ছিলো না। নওয়াব জেসারত খাঁ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তিনি এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন। তাঁর এই অস্বীকৃতির সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মীরন এতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, সে ঐ নোটবুকে জেসারত খাঁর নামও টুকে রাখে। পাটনা থেকে ফিরে আসার পর নোটবুকে উল্লিখিত তিনশত ব্যক্তির সাথে তাঁকেও হত্যা করা হবে। কিন্তু তার আগে মীরনের সংকল্প পূর্ণ হতেই হবে। সিরাজউদ্দৌলার বংশের কাউকে বেঁচে থাকতে দেওয়া হবে না। মীরন তার একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে এ-কাজে নিযুক্ত করলো। তাকে বলে দেওয়া হলো যে, মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়ার ছল করে সিরাজ-পরিবারকে একটি নৌকায় তুলে নিয়ে পথে সেটিকে ডুবিয়ে দিতে হবে। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের কোনো এক গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় সিরাজ-পরিবার জিনজিরা-প্রাসাদ থেকে অবতরণ করে বুড়িগঙ্গা নদীতে এক নৌকায় আরোহণ করলেন—তাঁরা বুঝতে পারেননি, ভাগ্য তাঁদের কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। ঢাকা নগরী দৃষ্টির আড়ালে যেতে না যেতেই বুড়িগঙ্গা-ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে এসে মীরন-নিযুক্ত ভৃত্যটি নৌকার তলায় প্রবিষ্ট খিলগুলো টেনে তুললো। বলা বাহুল্য, নৌকার তলা ফুটো করে আগে থেকেই কতকগুলো খিল দিয়ে সযত্নে ফুটাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। তারপর যা অনিবার্য ও অবধারিত, তা'ই ঘটলো এই পরিবারটির অদৃষ্টে। দুর্বিনীতা, দাম্ভিকা ঘসেটি বেগম মৃত্যুর মুখে এসে অকস্মাৎ ভেঙে পড়লেন। এক লহমায় তাঁর সকল অহঙ্কার ও গর্ব উবে গেলো। তাঁর চোখে মৃত্যুর বিভীষিকা; দু'চোখে অশ্রুধারা। আমিনা বেগম কিন্তু চীৎকার করে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানালেন, 'হে আল্লাহ্‌, রহ্‌মানুররহিম, আমরা গোনাহ্‌গার, অপরাধী; কিন্তু মীরনের

বিরুদ্ধে তো আমরা কোনো অপরাধ করিনি। বরং সে যা কিছু পেয়েছে, তার জন্যে আমাদের কাছে সে ঋণী।' নদীর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে তাঁদের আর্ত চীৎকার বাজতে থাকে, প্রতিধ্বনিত হতে থাকে নৈশ আকাশে—বহু দূর দিগন্তব্যাপী। কিন্তু কেউ এলো না তাঁদের সাহায্যে। আস্তে আস্তে তাঁদের নিয়ে তলিয়ে গেলো সেই মৃত্যু-তরীটি। এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো আলীবর্দী খাঁর একদা উদ্ধত-শির পরিবারটি। কিন্তু নিয়তির প্রতিহিংসার হাত থেকে ঘাতকটিও নিস্তার পেলো না। তাকেও সে গ্রাস করে নিলো অচিরেই। সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে সেই যে সে পাটনা যাত্রা করলো, সেখান থেকে তাকে আর ফিরে আসতে হয়নি। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুলাই। পাটনার উপকণ্ঠে সৈন্যদের ছাউনির মধ্যে এক তাঁবুতে শুয়ে সে বিশ্রাম করছিলো। অকস্মাৎ বজ্রপাত হলো তার। সিরাজের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করার মাত্র কয়েকদিন পরেই মীরনের ওপর বজ্রপাত হয়েছিলো।

নবম অধ্যায়

বৃটিশ শাসনে ঢাকা

এতো উত্থান-পতন ও ভাগ্যবিবর্তনের পর এই নগরীর জীবনে এক নবদিনের প্রত্যূষ আসন্ন হয়ে এলো। আগের দিনের উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও হত্যা—যা এর ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে—বিদায় নিলো। পুরাতন দিনের প্রাচ্যদেশীয় স্বভাবসুলভ সংযম, দুর্বার আবেগ ও উত্তেজনাপ্রবণতার স্থলে জাগ্রত হলো আইন-শৃঙ্খলার প্রতি এক অদ্ভুত প্রবণতা।

আগের শাসন-ব্যবস্থার অবসানের সাথে সাথে এর রহস্যময়তাও অনেকাংশে ও অনিবার্যভাবেই তিরোহিত হলো। পরবর্তী শাসকদের ক্ষমতার দাপট দেখানো লক্ষ্য ছিলো না। এদের মধ্যে ছিলো সততা ও পক্ষপাতহীনতা। সুবিচার, অন্যায় কর্মের শাস্তি বিধান এবং রাজস্ব সংগ্রহে তারা আত্মনিয়োগ করে। এরা বাস্তববাদী মানুষ। তাদের কারখানা, অফিস-আদালত ও জেলখানা গড়ে উঠলো। একদল বণিক-কোম্পানীর দ্বারা নির্মিত কুৎসিৎ-দর্শন এই সব ইমারতে স্থপতিকুশলতার কোনো নিদর্শন ছিলো না। ইংরেজগণ ছিলো নিতান্ত কাঠ-খোট্টা ও আবেগ লেশশূন্য। তাদের রক্তে পিউরিটানবাদের অতি-সংযমের ধারা মিশে ছিলো। প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের দীপ্তিচ্ছটা ও জাঁকজমক তাদের মনে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। ইংরেজ-শক্তির প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নওয়াবী দরবারের সকল জৌলুস অন্তর্হিত হলো। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জেসারত খাঁ নামেমাত্র নায়েবে নাজীম পদে বহাল থাকেন। সুইলুটন সাহেব বলে পরিচিত লেফ্টন্যান্ট সুইলুটন ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় আগমন করেন এবং ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব শাসনভার গ্রহণ করেন।

অতঃপর সকল ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে কোম্পানীর হাতে চলে গেলো। ইব্রাহীম খাঁর আমল থেকেই শাসনকর্তাগণ লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাসাদে বাস করতেন। জেসারত খাঁকে এই প্রাসাদ ছেড়ে দিতে হলো। নিমতলী কুঠিতে তাঁর বাসগৃহ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে তাঁকে বড়-কাটারায় বাস করতে হয়েছিলো। জেসারত খাঁ এবং তাঁর বংশধরগণ এই নিমতলী কুঠিতে শতাব্দীর প্রায় তিন ভাগ কাল বসবাস করেন এবং সকল মর্যাদা ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃত্রিম দরবার বসিয়ে তার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে থাকেন। বিগত শাসনামলের এটি শেষ ও বড় করুণ নিশানা—অতীত গৌরবের প্রতি একটা মূর্তিমান ব্যঙ্গ যেন। সোনার বদলে জরি। পূর্ব দিকের ফটকের সম্মুখভাগে একটি গৃহে কোম্পানীর সিপাহী বাহিনী থাকতো। মোগলদের শক্তি যে এখন অতীতের বস্তু, সেকথাই এদের অবস্থিতি স্মরণ করিয়ে দিতো সর্বক্ষণ। নায়েবে নাজীমদের এই শেষ প্রাসাদটির এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে পশ্চিম ফটকের কিয়দংশ এবং বারদারী এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এর কাছাকাছি হোসেনী দালানে ঢাকার শেষ চার জন নায়েবে নাজীম সমাহিত হয়ে আছেন। এঁরা হচ্ছেন জেসারত খাঁর দুই পৌত্র নসরৎ জং ও শামসুদ্দৌলা এবং কামরুদ্দৌলা ও গাজী উদ্দীন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে গাজী উদ্দীন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে কোম্পানী পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে না।

ঢাকার শাসন-ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার পর কোম্পানীকে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যে দুর্নীতি ও ক্ষয় মোগল সাম্রাজ্যকে গ্রাস করেছিলো, সরকারের প্রতিটি দফতরেই তার প্রভাব পড়েছিলো। দেওয়ানী অফিসের ভার ছিলো মোহাম্মদ রেজা খাঁর ওপর। হিসাব পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে, পূর্ব বাংলার রাজস্ব ১৭২২ খ্রীস্টাব্দের অপেক্ষা বিশ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। নাওয়ারা বা নৌবহরের জন্যে পূর্বের যে এক লাখ টাকা বরাদ্দ ছিলো, তা থেকে এখন মাত্র অর্ধলক্ষ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব। নায়েবে নাজীমদের অপ্রতিহত ক্ষমতা দেখে কোম্পানীর বিচার ও আইনানুগ

কর্মচারীরা দুঃখ বোধ করেন। ডাক বিভাগকে 'নিয়ম শৃঙ্খলাহীন একটা গোলক ধাঁধা' বলে তাঁরা অভিহিত করেছিলেন। সেখানে যে গাফিলতি ও অর্থ আত্মসাৎ করা হতো, তা বর্ণনার অতীত। ঢাকা জেলখানায় ১১০ জন কয়েদী ছিলো। এদের মধ্যে ৯৫ জনকে পায়ে লোহার শিকল পরে রাস্তায় কাজ করতে হতো বলে এক বিবরণে উল্লেখ করা হয়। 'এদের অপরাধ কখনো প্রমাণিত হয়নি এবং এদের অনেকেই বিনা বিচারেই নয় বছর যাবত কারাদণ্ড ভোগ করেছে।' স্থানীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে নদীতে দস্যুদের উপদ্রব চূড়ান্তরূপে বৃদ্ধি পায়। এরূপ অবাধ দস্যুতা ও রাহাজানির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। দস্যুরা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে হামলার পর হামলা চালিয়ে হতভাগ্য গ্রামবাসীদের সবকিছু লুটপাট করে নিতো এবং তাদের নির্মমভাবে হত্যা করতো। এইভাবে সমগ্র গ্রামাঞ্চল তারা বিরাণ করে দিলো। তারা এতোই দুর্দান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, ক্যাপ্টেন হল্যাণ্ড নামক জনৈক পদস্থ সরকারী কর্মচারী ঢাকা থেকে কলকাতা রওয়ানা হলে দুর্বৃত্ত দস্যুরা তাঁকে হত্যা করে। সর্বপ্রকার অপরাধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো এবং কোনো মানুষেরই জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ ছিলো না।

ঐ সময় ইংরেজ শাসকদের সব সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো। তাদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ ও ব্যাখ্যার অভাবে তাদের বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো।

তারা ধীরে ধীরে অতি সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। যে বিরাট কাজ তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তার মোকাবেলার জন্যে তারা একটার পর একটা পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করতে লাগলো এবং এইভাবে সর্বশেষে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থার সন্ধান তারা পেলো। ধাপে ধাপে তারা অগ্রসর হতে থাকে, আস্তে আস্তে হাতে আসে জটপাকানো সুতার দলা। তারা সেগুলোর গিঁট খুলে গুছিয়ে তোলে। বিপ্লবাত্মক কোনো ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করলো না। শান্তভাবে তারা মোগল শাসকদের

স্বলাভিষিক্ত হলো এবং শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দিলো। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে কেলসাল রাজস্ব বিভাগের সুপারভাইজার নিযুক্ত হলে পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ হলো। অস্বাভাবিক ব্যয়বাহুল্য ও দুর্নীতির জন্য সর্বত্র রাজস্ব হ্রাস পেয়েছিলো। নূতন সুপারভাইজারের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যয়সঙ্কোচ করা। বিখ্যাত নাওয়ারা বা নৌবহর, যা এতকাল পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে নোঙর ফেলে ঢাকা রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতো এবং এই নগরীর গৌরব ও গর্বস্বরূপ ছিলো, ইংরেজ আমলে তার আর প্রয়োজন রইলো না। নৌবহরটি ভেঙে দেওয়া হলো এবং জাহজগুলো বিক্রয় করা হলো। নৌবহরটির ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিলো, কোম্পানী তা দখল করে নিলো। নায়েবে নাজীমের দরবারের দুর্নীতি রোধ করার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। নায়েবে নাজীম মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলে তা কার্যকরী করার আগে কোম্পানীর প্রতিনিধির অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। দেওয়ানী মামলায়ও যাতে করে সুবিচার প্রদর্শিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্যে একজন অফিসারকে আদালতে হাজির থাকতে হতো। কেলসাল মাত্র চারজন ইংরেজ সহকারী নিয়ে কাজ শুরু করেন। কিন্তু প্রাচ্যদেশীয় লোকের চাতুরী ও চক্রান্ত সম্পর্কে এদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। মাত্র চার জন ইউরোপীয় সহকারী নিয়ে স্তূপীকৃত দুর্নীতির জঞ্জাল ও বিশৃঙ্খলার মোকাবেলা করে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া কেলসালের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা যতটুকুই করতে সমর্থ হয়েছিলো, সেটুকুই তাদের বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিদেশের একটা বিরাট প্রদেশে এসে অসহ্য গরম, অস্বস্তি, অসুবিধা এবং ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাদের কাজ করতে হয়েছিলো; নৈরাজ্যিক অবস্থা থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার এবং সৎ ও সুশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিলো। তাদের এই সংগ্রামের দ্বারা বহু-নির্জিত, শ্রান্ত ও অবসন্ন জাতির মহোপকার সাধিত হয়েছিলো। এরা ছিলো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজ। ইংরেজ জাতির মধ্যে এরা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলো না। এদের নাম পর্যন্ত

স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। অথচ একটা বিরাট সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে এদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলো। সদ্য বিজিত জাতিটির মহান ঐতিহ্য তখনও স্মৃতির বস্তুতে পর্যবসিত হয়নি। তারা যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলো, একমাত্র তা দিয়েই এই মুষ্টিমেয় ইংরেজগণ বিজিত জাতির বিপুল জনবলের মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছিলো। তাদের সৈন্যবল ছিলো অবিশ্বাস্য রকম নগণ্য। বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট এই মহানগরীতে তাদের হাতে ছিলো মুষ্টিমেয় কয়টি সৈনিক। ভাগ্যের পরিহাস, এদেশ থেকে ইংরেজদের নির্মূল করে ফেলার জন্যে কয়েক বছর আগে এই নগরী থেকেই হুকুমনামা জারি হয়েছিলো। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে গ্রুবার কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয়ে এখানে এসে দুই কোম্পানী সৈন্য দেখতে পান। চট্টগ্রামস্থ সেনাবাহিনী থেকে এইসব আধা-শিক্ষাপ্রাপ্ত সিপাহীকে আনা হয়েছিলো। সমুন্নত শির এই মহানগরীকে অধিকার করার জন্যে কতো বিরাট সেনাবাহিনীই না এখানে লড়াই করেছে। অথচ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ইংরেজ কোম্পানার একটা ক্ষুদ্র সেনাদলের ওপর একটি আঘাতও না হেনে এরা শান্তভাবে তাদের মেনে নিলো। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আর কাকে বলে। শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ব প্রদেশের অধিকার লাভ বাংলায় ইংরেজ ইতিহাসের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে কালেক্টর যে তাঁর সৈন্যবল বৃদ্ধির দাবী জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা কোনো সুগঠিত হামলা মোকাবেলার কারণে নয়। তাঁর হাতে যে সৈন্যবল ছিলো, তা সাধারণ পুলিশী ব্যবস্থা বা শান্তিরক্ষার পক্ষেও অনুপযোগী। সারা দেশ জুড়ে ডাকাতি ও রাহাজানি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শেষের দিকে মোগল-শক্তি এমনই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে, গোটা দস্যু সম্প্রদায় একত্র হয়ে গ্রামাঞ্চলে ও নদীতে ঘুরে বেড়াতো আর ডাকাতি ও লুটপাট চালাতো। এই জেলার একটি অংশেই দশ হাজার দস্যু সন্ন্যাসী আখড়া বেঁধেছিলো। হতভাগ্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে এরা বশ্যতা-কর আদায় করতো এবং তাদের বাড়ী-ঘর

ছেড়ে পালাতে বাধ্য করতো। তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো, কিন্তু সন্ন্যাসীদের সংখ্যাবল এতো বেশী ছিলো যে, ইংরেজ সেনারা তাদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হলো। পর বছর প্রতি দলে একশতটি করে মোট ছয় দল সৈন্য সংগ্রহ করে কোম্পানী-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হলো। একজন ইংরেজ ক্যাপ্টেন এর নায়ক এবং দেশী সৈন্যকে এড্‌জুট্যাণ্ট নিয়োগ করা হয়। এই ভাবে যে-সেনাদলটি গঠিত হলো, তখনকার দিনে তাদের বহু ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছিলো। তারা কাচারী ও ট্রেজারী পাহারা দিতো, অবৈধভাবে লবণ পাচার রোধে শুল্ক অফিসারের কাজ করতো, বিপজ্জনক নদী ও স্থলপথে তাদের প্রহরাধীনে সরকারী অর্থ আনয়ন বা প্রেরণ করা হতো, তারা আদালতের ডিক্রি জারি করতো এবং প্রদেশের দূর এবং অজ্ঞাত স্থানগুলোতে গিয়ে করদানে অসম্মত অথবা আদালতের নির্দেশ অমান্যকারী জমিদারদের ধরে আনতো। দশ বছর পর এই বাহিনী ভেঙে দিয়ে তদস্থলে প্রাদেশিক সেনাবাহিনী গঠন করা হয়।

অতঃপর স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হলো। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে রেজা খাঁর স্থলে কোম্পানী স্বয়ং দেওয়ান পদের কার্যভার গ্রহণ করে। একটি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হলো। কালেক্টর একজন স্থানীয় দেওয়ানের সাহায্যে সভাপতিরূপে এই আদালতে দেওয়ানী মামলার বিচার করতেন। কিন্তু দু'বছর পরে খ্যাতনামা বারওয়েলের নেতৃত্বে প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হয়। কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে গঠিত এই স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ভেঙে দেওয়া হলো এবং মিঃ ডে'কে ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর নিয়োগ করা হলো। অপর দিকে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হলো এবং মিঃ ডানকানসন প্রথম বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

বৃটিশ কর্তৃত্বের প্রাথমিক যুগে ঢাকার ইতিহাসে দু'জন খ্যাতনামা ইংরেজের নাম কিছুকালের জন্যে প্রাধান্য অর্জন করে। এঁদের একজন হলেন হ্যারের স্কুলের হেড মাস্টার ডাঃ থ্যাকারের ষোড়শ সন্তান এবং বিখ্যাত

ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতামহ উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারে। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে সতের বছর বয়সে কোম্পানীর কেরানী পদে তিনি ভারতে আসেন। চাকরির প্রথম পাঁচ বছর তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। অপর জনের নাম কার্টিয়ার। থ্যাকারে কিছুদিন কার্টিয়ারের সেক্রেটারীরূপেও কাজ করেন। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে কার্টিয়ার বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। এই সময় থ্যাকারের দুই ভগ্নি জেন ও হেনরিয়েটা ভ্রাতার সাথে এসে মিলিত হন। এই দুই মহিলা এবং তাঁদের ভ্রাতা অচিরেই ঢাকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়লেন। কার্টিয়ারের চাকরির প্রথম দিকের অধিকাংশ সময় এই ঢাকাতেই অতিবাহিত হয়েছিলো। কোম্পানীর চাকরি করেও ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালিয়ে সিভিলিয়ানদের পক্ষে অর্থোপার্জনের যে বিরাট সুবিধা ছিলো, তা তিনি মনে রেখেছিলেন। ভারত ত্যাগের পূর্বে তিনি তাঁর স্নেহভাজন থ্যাকারের জন্যে যতখানি সম্ভব করে গেলেন। তিনি তাঁকে একজন কুঠিয়াল ও ঢাকা কাউন্সিলের চতুর্থ স্থানীয় পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে থ্যাকারে তাঁর ভগ্নীদের ঢাকায় আনয়ন করলেন। তখনও বাংলায় কোম্পানীর আমলাদের প্রভূত অর্থ উপার্জনের সুযোগ ছিলো। যদিও পরের বছর ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করার সাথে সাথে বহু পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে, তথাপি পরবর্তী কয়েক বছর থ্যাকারে ধন-সম্পদ আহরণের অপরিসীম সুযোগ লাভ করেন। তিনি সে-সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রভূত পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপার্জন করেন। তিনি এক বছর মাত্র ঢাকায় অবস্থান করেন। কারণ, ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে সিলেটের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে তাঁকে সেখানে যেতে হয়। এই বন্য অঞ্চলের কার্যতঃ তিনি সর্বেসর্বা ছিলেন এবং তাঁর কাছে নিত্যনূতন সুযোগের দরজা খুলে যায়। মাত্র দু'বছর তিনি সেখানে কালেক্টর পদে নিযুক্ত থাকলেও তিনি ঐ অঞ্চলের সাথে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়েছিলেন যে, ঐ জেলা 'সিলেট থ্যাকারে' নামে পরিচিত হয়ে পড়ে।

মাত্র তেইশ বছর বয়সের একজন যুবকের কাছে এরূপ জীবন আকর্ষণীয় হওয়ারই কথা। নামে মাত্র ঢাকা কাউন্সিলের অধীনে হলেও তিনি একটা বিরাট জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তখনও সেখানে বৃটিশ-শক্তির প্রভাব পূর্ণরূপে অনুভূত হয়নি এবং আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার মতো শক্তিশালী শাসনও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কাজে অবাধ স্বাধীনতা এবং অপরিসীম সুযোগ এই যুবক কালেক্টরের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে। তাঁর কাজের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করলে চমৎকৃত হতে হয়। কালেক্টররূপে তাঁর প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিলো রাজস্ব আদায় এবং কড়ি-মুদ্রায় সে রাজস্ব ঢাকাস্থ ট্রেজারীতে পৌঁছুলে তাঁর এলাকা সম্পর্কে কাউন্সিলের আর কিছু বলার থাকতো না। তখনকার দিনে এখনকার মতো এতো লম্বা রিপোর্ট লিখতে হতো না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ঘন ঘন তাগিদপত্রও পেশ করতে হতো না। কোম্পানীর রাজস্ব-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে থ্যাকারে তাঁর জেলা যেভাবে খুশি শাসন করতে পারতেন। জেলার যুবক কালেক্টরকে যেসব কাজে হাত দিতে হলো, সেগুলোর মধ্যে ছিলো : মামলা-মোকদ্দমার সরাসরি বিচার, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ, বন্য হস্তি শিকার, ট্রেজারী রক্ষা, দুর্ভিক্ষে রিলিফের ব্যবস্থা, শান্তি রক্ষা, শিক্ষা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ।

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে থ্যাকারে কাউন্সিলের তৃতীয় স্থানীয় পদে নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু মাত্র দু'বছর সিলেটে চাকরি করে তাঁর এতো লাভ হয়েছিলো যে, তখন তিনি অবসর গ্রহণের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে থ্যাকারে তখনকার দিনের কলকাতার সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এ্যামেলিয়া রিচমণ্ডকে বিবাহ করেন এবং এর অল্পদিন পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নয় বছরের চাকরিকালের অর্ধাংশ ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং লাভজনক। এই অর্ধাংশ সিলেট ও ঢাকায় অতিবাহিত হয় এবং এই সময় তিনি বিপুল ধন-সম্পদ আহরণ করেন। অবশ্য সমসাময়িক কালে তাঁর ইংরেজ সহকর্মীদের মধ্যে এরূপ

আরও বহু 'নবাব'ই ছিলেন। ছাব্বিশ বছরের যুবক উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারে এবং আঠারো বছর বয়স্কা থ্যাকারে বধূ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে অর্জিত বিপুল অর্থে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো পরম আরামে ও আনন্দে কাটিয়ে দেন।

ইত্যবসরে থ্যাকারে ভগ্নীদ্বয় ঢাকা-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কনিষ্ঠা ভগ্নী হেনরিয়েটা পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলেন। এখানে আসামাত্রই তিনি অনেকের মনে দাগ কাটেন। ঐ সময় ঢাকায় ইউরোপীয় মহিলার সংখ্যা ছিলো নগণ্য। পূর্ব বাংলায় কোম্পানীর প্রধান এবং ঢাকাস্থ কাউন্সিলের কর্মকর্তা জেমস হ্যারিস অচিরেই হেনরি-য়েটাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলেন। হেনরিযেটার ভাই হ্যারিসের অধীনে কাজ করতেন। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন। তিনি এখানে এসেই চাকরিতে আত্মনিয়োগ করেন। এতে তাঁর এমন লাভ হয়েছিলো যে, ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে বিবাহের সময়েই তিনি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের প্রচুর সুযোগ-সুবিধার জন্যে এখানে চাকরিলাভ সব সময়ই সৌভাগ্যের বিষয় বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এমনকি, জলদস্যু পিটের আমলেও এখানে পদলাভ লোভনীয় ব্যাপার বলে মনে করা হতো। ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে পিট তাঁর জনৈক বন্ধুকে লিখিত পত্রে জানান, 'আমি আশা করি, তুমি ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে। কোম্পানীর সবগুলো চাকরির মধ্যে ঢাকার পদই সবচেয়ে সুবিধাজনক।' ইতিমধ্যে ষাট বছর অতিবাহিত হলেও ঢাকার সে-সুনাম তখনও অব্যাহত ছিলো। জেমস হ্যারিস সকল সুযোগ ও সম্ভবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে-ছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করে ইংলণ্ডে বসতি স্থাপন করেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মতো নবাবী চালে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জেন থ্যাকারে অপেক্ষাকৃত অধিক কাল ঢাকায় অতিবাহিত করেন এবং তাঁর বিখ্যাত স্বামীর মাধ্যমে এর সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে

জড়িত হয়ে পড়েন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে খ্যাতনামা বিজ্ঞান ও ভূগোলবিদ মেজর জেমস রেনেলের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। এই রাজধানীর গুণবান ব্যক্তি:দের মধ্যে তিনি সম্মানিত আসন অধিকার করে আছেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ'নী। সঙ্কীর্ণ দলাদলি অথবা উচ্চাভিলাষ থেকে মুক্ত থেকে শান্তির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই তাঁর জীবনের কাম্য হওয়ার কথা। কিন্তু অবস্থা:র চাপে পড়ে তিনি এ-দেশে বৃটিশ আধিপত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াব সময় চাঞ্চল্যকর ঘটনাপ্রবাহে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথমের দিকে বৈজ্ঞা:নিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকার পর তিনি ভারতে আগমন করেন এবং এখানে আসার সাথে সাথেই বাংলায় কোম্পানীর সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত হন। ১৭৬৪ খ্রীস্টা:ব্দে এই পদপ্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে এই প্রদেশের প্রথম জরিপ কার্যে হাত দেওয়া হয়। অজ্ঞাত ও দুর্ভেদ্য অঞ্চলসমূহে প্রবেশ করে তিনি এই প্রদেশ সম্পর্কে বহু তথ্য আহরণ করেন এবং তদ্বারা সদ্য রাজ্য-প্রাপ্ত কোম্পানীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। বাংলার ভূগোল সম্পর্কে প্রথমের দিকে কোম্পানীর এজেন্টদের অজ্ঞতার অন্ত ছিলো না —জেমস রেনেল মানচিত্র এবং জরি-পের সাহায্যে প্রদেশের সুস্পষ্ট সীমা নির্দেশ করেন এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ফলে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যাপারে কোম্পানীর অনেক সুবিধা হয়।

তাঁর এই শ্রম ও সাধনার কাহিনী পাঠ করলে বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগের পূর্ব বাংলা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। মুসলমান শক্তির চূড়ান্ত পতনের সময় সমগ্র দেশে অরাজকতা ও অশান্তি বিরাজ করছিলো। রেনেলকে ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যেতে হয়েছে। রাস্তাঘাটের কোনো বালাই ছিলো না। সমগ্র দেশটি ছিলো জঙ্গলাকীর্ণ। এইসব জঙ্গলে বাঘ এবং হাতির পাল খুশিমতো ঘুরে বেড়াতো। প্রতিটি মুহূর্তেই ভয়াবহ বিপদের মধ্য দিয়ে তাঁকে কাজ করে যেতে হয়েছে। অধিকাংশ সময় তিনি নদীপথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু

সে-পথেও কম বিপদ ছিলো না। নদীর প্রবল অন্তঃপ্রবাহ বিপদের সৃষ্টি করতো এবং ঝড়ঝঞ্ঝায় প্রতি বছর বহু প্রাণহানি ঘটতো। কিন্তু ডাকাতের দল-গুলোই সবচেয়ে ভয়ের কারণ ছিলো। বড়ো বড়ো নদীতে এরা উপদ্রব করতো এবং তাদের জন্যে জীবন-সম্পদ কিছুই নিরাপদ ছিলো না। জেমস রেনেল স্বয়ং এদের দ্বারা বার বার আক্রান্ত হয়েছেন এবং বহু দুর্ভোগ ভুগেছেন। কিন্তু তবুও আরব্ধ কার্য থেকে বিরত হননি। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে একবার আটশত দস্যুর একটি দল তাঁকে আক্রমণ করেছিলো। তাঁর এদেশী রক্ষীদলের সাহায্যে তিনি প্রথম হামলা প্রতিহত করতে সমর্থ হন। কিন্তু দস্যুদল ওঁৎ পেতে ছিলো। পরের দিন তারা তাঁকে এবং তাঁর লোকজনদের প্রায় সাবাড় করে ফেলেছিলো। তিনি এমন গুরুতরভাবে জখম হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধটি কেটে ফাঁক হয়ে গিয়েছিলো এবং বাম বাহুটি কেটে গিয়েছিলো। বুকের কয়েকটি পাঁজর ভেঙে গিয়ে-ছিলো এবং হাতের একটি আঙুল উড়ে গিয়েছিলো। তিনি যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে নিকটতম চিকিৎসালয়ের দূরত্ব ছিলো তিনশত মাইলেরও অধিক। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর লোকজন নৌকাযোগে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসে। এখানে পৌঁছানোর তিন মাস পর পর্যন্ত তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে থাকে। আরোগ্য লাভের পর তিনি বাংলার সার্ভেয়ার-জেনারেল এবং ইঞ্জিনীয়ারদের ক্যাপ্টেনরূপে পদোন্নতি লাভ করেন এবং আবার সেই কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাঁচ বছর পর আবার একবার তাঁকে দস্যুদলনে বহির্গত হতে হয়। এই সব দস্যু জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলো এবং তাঁর জরিপ কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিলো। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ঢাকা থেকে তিনশত কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করে পনের দিনের মধ্যেই তিনি দস্যুদের নিপাত করেন এবং তাদের উপদ্রব থেকে গ্রামবাসীদের মুক্ত করেন। কিন্তু এদেশের আব-হাওয়ার মধ্যে এই সব দুরূহ কার্যে নিযুক্ত থাকার জন্যে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তাঁর বর্ণনা মতে এখানকার আবহাওয়া 'ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যের

পক্ষে এতো ক্ষতিকর যে, তাদের সত্তর জনের মধ্যে একজন কোনো রকমে দেশে ফিরতে সমর্থ হতো।' তিনি অবসর গ্রহণের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে এ-দেশ ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য ও সম্মান অর্জনের পর সাতাশি বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন এবং ইংলণ্ড যাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবিতে সমাহিত করেছে, তাঁদের পাশে তাঁকেও সমাহিত করা হয়।

কিন্তু সংস্কার কার্যে এইসব লোকের এত উদ্যম সত্ত্বেও শতাব্দী-সঞ্চিত গ্লানি দূর করা সম্ভব হলো না। জেলার দূর-দূরান্তে যে-সব জমিদার বাস করতো, তাদের স্বৈরাচার পূর্ববৎ অব্যাহত রইলো। স্ব স্ব জমিদারির মধ্যে এরা ছিলো একচ্ছত্র অধিপতির মতো এবং তাদের প্রতাপে প্রজাকুল সব সময় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতো। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার দস্যুদলের কাছ থেকে বখরা নিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাকাতদল ছিলো তাদের বেতনভুক। তখনও দাসত্বপ্রথা বিদ্যমান ছিলো। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার সত্তর বছর পরেও ঢাকায় দেড়শ' টাকায় গোলাম ও একশ' টাকায় বাঁদী বিক্রয় হতো। অবাধ্য রায়তদের লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে তাদের ওপর জঘন্য অত্যাচার চালান হতো এবং পাই পয়সা পর্যন্ত প্রাপ্য শোধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিস্তার ছিলো না। একটা ক্ষুদ্র কোম্পানীর পক্ষে তার সীমাবদ্ধ শক্তি দ্বারা সাথে সাথেই দূর-দূরান্ত জেলাসমূহে আইন-সুবিচার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিলো না। ঐসব জেলায় তখনও কোনো শ্বেতকায় ব্যক্তি গমন করেনি। একটা বিরাট যুগসন্ধিকাল তখন। সর্বস্তরেই প্রাচীনের সাথে নবীনের সংঘাত। নূতন শাসন-ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে আগেকার অরাজকতা, অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা অন্তর্হিত হতে থাকে। বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যের জীর্ণ ধ্বজা বহন করে এবং অতীতের একটা প্রতীকরূপে নায়েবে নাজীমদের নকল দরবার তখনও টিকে ছিলো নব্য

শাসন আমলের প্রতীকরূপী ফৌজদারী ও দেওয়ানী কাচারীগুলোর পাশা-পাশি। এই কাচারীগুলো ভারত ও ভারতবাসীদের কাছে ছিলো নবযুগের প্রতীক।

ইংরেজ-শক্তির অভ্যুত্থানের প্রথম দিকে অনভিজ্ঞ ও সমস্যা-পীড়িত ইংরেজ শাসকদের একটা গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। অবশ্য পরবর্তী কালে এরূপ নৈসর্গিক বিপদের মোকাবেলা তাদের বার বারই করতে হয়। উর্বর, বারিবিধৌত শস্যশ্যামল পূর্ব বাংলা সাম্প্রতিক কালে খুব কমই দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সেকালে ডাকাতি, রাহাজানি, লুণ্ঠন, উৎপীড়ন ও নির্যাতনে দেশ যখন উৎ-সন্নপ্রায় হয়ে গিয়েছিলো, তখন উৎপন্ন শস্যের দ্বারা হতভাগ্য দেশবাসীদের কোনোও রকমে অন্নসংস্থান হতো। এমতাবস্থায় ফসল পড়ে গেলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো। বৃটিশ শাসনের প্রাথমিক যুগে তিনটি মহামন্বন্তর ঘটে। কেলসাল ঢাকার তত্ত্বাবধায়ক (Supervisor) পদে নিযুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁকে ১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দের ভয়াবহ মহাবুভুক্ষার মোকাবেলা করতে হলো। ঐ সময় আকস্মিকভাবে এক সাংঘাতিক প্লাবন আসে এবং তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়; ফলে বহু অঞ্চলের শস্য বিনষ্ট হয়। এর পর শুরু হয় অনাবৃষ্টি। বন্যায় ধুয়ে মুছে ও পচে গিয়ে যাও-বা টিকে ছিলো, প্রচণ্ড রৌদ্র ও অনাবৃষ্টির ফলে তা পুড়ে সাফ হয়ে গেলো। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে দুর্দশা কম হলেও গরীব শ্রেণীর লোকদের দুঃখের শেষ ছিলো না।

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তর আরও ভয়াবহ। এই সালে নদীসমূহে আকস্মিকভাবে জলস্ফীতি দেখা গেলো। পথঘাট, বাড়ীঘর, ডুবে গেলো। বন্যার প্রচণ্ড তোড়ে বাড়ীঘর, গাছপালা, জীবজন্তু কোথায় ভেসে গেলো। বহু মানুষ প্রাণ হারালো। খাদ্যদ্রব্য এমন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে গেলো যে, টাকায় ১৬০ সেরের চাউল ১৬ সেরে বিকোতে লাগলো। কালেক্টর মিঃ ডে লিখে যান, 'জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

দেশের বহু অঞ্চলই জনশূন্য হয়ে পড়েছে। কদাচিৎ কর্ষিত জমি চোখে পড়ে।' অক্টোবর মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করলো। রবিশস্যেরও পতন হলো। ঢাকা ও আশেপাশের গরীব লোকেরা জঠরজ্বালায় মরিয়া হয়ে উঠলো। বাজার ঘেরাও করে তারা খাদ্য চাইতে লাগলো। বাজার রক্ষার জন্যে কালেক্টরকে সিপাই নিয়োগ করতে হয়।

কিন্তু তৃতীয় বারের মন্বন্তরটিই ছিলো সবচেয়ে মারাত্মক এবং ভয়াবহ। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে অস্বাভাবিক বর্ষণ শুরু হলো। জুলাই মাস পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টিপাত চললো। নদীগুলোর প্লাবন পূর্ব রেকর্ড অতিক্রম করলো। ঢাকার রাস্তাঘাট নদীর পানির সর্বোচ্চ স্তর থেকে বেশ উঁচু হলেও সমস্ত রাস্তাঘাট এমনভাবে ডুবে গেলো যে, এ-বাড়ী থেকে সে-বাড়ীতে যেতে হলে নৌকা ছাড়া উপায় ছিলো না। নিম্নভূমি অঞ্চলের লোকেরা বাড়ীঘর ছেড়ে মাচানে বাস করতে লাগলো। আগাম ফসল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ায় লোকেরা পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষ দু'টির কথা স্মরণ করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে যার কাছে যতটুকু ধান-চাউল ছিলো, লুকিয়ে ফেললো। চাউলের দর শতকরা ৩০০/৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পেলো। ঢাকায় চার সের দরে চাউল বিক্রি হতে লাগলো। কিন্তু এতো চড়া দামেও চাউল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এই মহামন্বন্তর শুরু হয় এবং পরের বছরেও চলে। দরিদ্র, নিরন্ন, গৃহহীন, সম্বলহীন লোকেরা দলে দলে ঢাকায় আসতে থাকে। চাঁদা সংগ্রহ করে প্রতিদিন দশ হাজার লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ ছিলো অতি নগণ্য। খেতে না পেয়ে শত শত লোক ঢাকার রাস্তাঘাটে মরে গেলো। বহু উত্থান-পতন ও ভাগ্যবিড়ম্বনার সাথে ঢাকার পরিচয় থাকলেও এই মহামন্বন্তর যে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো, তার কোনো তুলনা হয় না।[৮] দুর্গতদের দুর্দশাকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এই সময় এক

সর্বনাশ। অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং তাতে কমপক্ষে সাত হাজার গৃহ ভস্মীভূত হয়। বুভুক্ষু জনতার চোখের সামনে খাদ্যভাণ্ডারগুলো পুড়ে গেলো। জীবনতুল্য খাদ্যশস্য বাঁচাতে গিয়ে একশত লোক পুড়ে মরলো। দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবের জন্যে কালেক্টর ডে যতোখানি সম্ভব চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখনকার দিনে পরিবহণ ও চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার জন্যে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়। তিনি বিহারের কালেক্টরকে ঢাকায় চাউল পাঠানোর নির্দেশ দেওয়ার জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের পূর্বে প্রথম কিস্তির চাউল এখানে পৌঁছানো সম্ভব হলো না। প্রথম দফায় ৭২৫০ মণ চাউল প্রেরিত হয়েছিলো। কিন্তু লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের কাছে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বন্যা নেমে গেলে হাহাকার আরো বেড়ে গেলো। বাড়ীঘর ভেসে গেছে। হালের বলদ ডুবে মরেছে। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। নূতন করে জীবন শুরু করার কোনো পথই নেই। ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর এই আঘাত সামলে উঠে দাঁড়াতে অনেক সময় লেগেছিলো।

কিন্তু ১৭৮৭-৮৮ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তর একটা সাময়িক বিপর্যয় মাত্র নয়। এর প্রতিক্রিয়া খুব সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো। পূর্ব বাংলার যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিলো, তাতে এই দুর্ভিক্ষ একটা স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেলো। অদৃষ্টের অদ্ভুত পরিহাস বটে যে, একটি বাণিজ্য-কোম্পানী শাসন-ক্ষমতা লাভ করার সাথে সাথেই এখানকার শিল্পে দ্রুত অবনতি নেমে আসবে এবং শিল্প-প্রধান অঞ্চলটি অকস্মাৎ কৃষিকার্য ও কৃষি সম্প্রসারণের দিকে ঝুঁকে পড়বে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঢাকার সমৃদ্ধির প্রধান উৎস ছিলো সূতা উৎপাদন ও বস্ত্র বয়ন। এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিলো ঢাকা নগরী। পত্তনকাল থেকে এই নগরী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের আকৃষ্ট করে। রাস্তার ধারে ও অলিগলিতে এরা ভিড় করে বাস করতো। মোটা মজুরি দিয়ে এদের বয়ন ও অন্যান্য শিল্পকার্যে নিয়োজিত করা হতো। ঢাকার লোকসংখ্যা এতো বেড়ে যায় যে, চূড়ান্ত সমৃদ্ধির সময় ঢাকার সীমা নদী

থেকে চৌদ্দ মাইল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিলো এবং এর লোকসংখ্যা নয় লক্ষে দাঁড়িয়েছিলো। শহরের বাইরে বহু আবাদী জমি পড়ে রইলো অনাবাদী হয়ে। সোনারগাঁওয়ের প্রতিপত্তির যুগে জঙ্গল কেটে যে-সব জমি আবাদ-যোগ্য করে তোলা হয়েছিলো, সেগুলো আবার অরণ্য-অঞ্চলে পরিণত হলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডে যেরূপ গ্রামীণ পেশা পরিত্যাগ করে শহরে জীবন যাপনের প্রবণতা হয়ে উঠেছিলো, দুই শতাব্দী পূর্বে ঢাকাতেও সেরূপ প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। কাপাশিয়া ও সোনারগাঁওয়ের মতো অঞ্চল থেকে অতি সুদক্ষ কারিগরগণ ঢাকায় এসে ভিড় জমাতে আরম্ভ করে। অথচ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মসলিন ও অন্যান্য মিহি বস্ত্র উৎপাদনের জন্যে এই দু'টি স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে এসেছিলো। সেই মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত কৃষিকার্য অলাভজনক বৃত্তি হয়ে পড়লো। তা ছাড়া দস্যু-তস্করদের উপদ্রব ও জমিদারদের অত্যাচারজনিত যুগে কৃষক শস্য লাগালেই যে তার ফল ভোগ করতে পারবে, এমন নিশ্চয়তাও ছিলো না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে পর পর অনুষ্ঠিত কয়েকটি ঘটনা আকস্মিকভাবে পরিস্থিতির মোড় ফিরিয়ে দিলো। ১৭৮৭-৮৮ খ্রীস্টাব্দে মহামন্বন্তরের ফলে বহু অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে। কারণ, অসংখ্য ঘরবাড়ী গ্রাম ও জনপদ এবং বহু কৃষক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তী কয়েক বছর শ্রমিকদের চাহিদা তীব্রভাবে বেড়ে যায়। ভূম্যধিকারীদের হাতে বিপুল পরিমাণে জমি এসে গেলো। কিন্তু সে-সব জমি আবাদ করার কেউ ছিলো না। কাজেই কৃষি-মজুরদের চাষাবাদের কাজে ফিরিয়ে আনার জন্যে জমির মালিকগণ তাদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে বাধ্য হলো। খাদ্যশস্যের ওপর থেকে রফতানী শুল্ক বিলোপ এবং নীল চাষের প্রবর্তন তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করলো। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই সময় প্রবর্তিত হওয়ায় চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব ফিরে এলো —যা কোনো কালেই ছিলো না। অবশ্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল-কুফল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। সরকারই জমি থেকে একটা আয়

তাদের হতে লাগলো। নূতন সরকারের আমলে কৃষকের জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে অধিকতর নিরাপত্তার ভাব ফিরে আসায় তারা ক্রমেই অনুভব করতে লাগলো যে, শ্রম করলে যথাসময়ে তার ফল তারা পাবে। গ্রামাঞ্চলে পুনরুজ্জীবনের সূচনা হলো ও কৃষি সম্প্রসারিত হলো। কয়েক বছরের মধ্যে জলাভূমি ও জঙ্গল উর্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত হলো। এই কৃষি-বিপ্লবের ফলে চাষাবাদের দিকে লোক এমন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলো যে, ঢাকার জনসংখ্যা দশ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজারে নেমে এলো।

কৃষি-বিপ্লবের মূল প্রেরণা নিহিত ছিলো শিল্প ও বাণিজ্যের অধঃপতনের মধ্যে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই দেশের ক্ষেত্রেও এরূপ আকস্মিক অধঃপতন বিস্ময়কর। কয়েকটি ঘটনার ফলে এই নগরীর শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায় বলে মনে হয়। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে মসলিন বস্ত্র উৎপাদন প্রবর্তিত হয়। আর্করাইট প্যাটেণ্ট বা স্বত্বাধিকার সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় এবং উন্নত ধরনের বয়ন যন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ফলে ইংলণ্ডে সূতী-বস্ত্রের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে যে-স্থলে ২০ লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপাদিত হয়েছিলো, সে-স্থলে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ৭৫ লক্ষ টাকার মাল উৎপাদন করা সম্ভব হলো। এক বছরে পাঁচ লক্ষ খণ্ড মসলিন বস্ত্র তৈরি হলো। অবশ্য ঢাকায় যে-মানের মসলিন তৈরী হতো—উৎকর্ষের দিক দিয়ে ইংলেণ্ডের মসলিন তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে না পারলেও সে-গুলোর দ্বারা চলতি বাজারের চাহিদা মিটতো। ঢাকায় উৎপাদিত সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা দামী মসলিন মোগল সম্রাট এবং নওয়াব-নাজীমদের দরবারের জন্যে সংরক্ষিত থাকতো। কিন্তু তাঁদের সে-জাতের মসলিন বস্ত্র খরিদ করার মতো আর অবস্থা ছিলো না। ধনকুবেরগণ ছাড়া আর সবারই ক্রয়ক্ষমতার ঊর্ধ্বে ছিলো সর্বোৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র। বিলাস, ব্যয়বাহুল্য ও শানশওকতের যুগের অবসান ঘটেছিলো। এই পরিবর্তন ঢাকার তন্তুবায় সম্প্রদায়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলো। একদিকে যেমন তাদের উৎপাদিত দামী বস্ত্রের বাজার নষ্ট হয়ে গেলো,

অন্যদিকে তেমনি আবার বিলাতে যন্ত্রে তৈরী সস্তা কাপড়ে বাজার ছেয়ে গেলো এবং তারা ধ্বংসের কবলে পতিত হলো। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতে যন্ত্রে প্রস্তুত সূতা আমদানী হওয়ায় দেশী সূতার বাজারও নষ্ট হয়ে গেলো। ফলে একান্ত অনিবার্যভাবেই ও দ্রুতগতিতে এখানকার বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস নেমে এলো।

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ত্রিশ লক্ষ টাকার মসলিন ইংলণ্ডে রফতানী হয়। কিন্তু সূতীদ্রব্যের ওপর শতকরা ৭৫ টাকা আমদানী শুল্ক ধার্য, যান্ত্রিক কৌশল ও নব নব উদ্ভাবনার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বছরে ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পের যে অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, ঢাকার বস্ত্রশিল্পের পক্ষে তা মৃত্যুর শামিল হলো। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে গ্রেট বৃটেনে সাড়ে আট লক্ষ টাকার এবং ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মসলিন বস্ত্র রফতানী হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে রফতানীর পরিমাণ এতো নেমে যায় যে, ঢাকাস্থ বাণিজ্যিক প্রতিনিধির অফিস তুলে দেওয়া হলো। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ঢাকার আর একটি শিল্পের মৃত্যু ঘটে। তুরস্কের সুলতানের একটি নির্দেশকে এর কারণরূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে চার লক্ষ টাকার ঢাকাই বুটিদার কাসিদা বস্ত্র কলকাতায় বিক্রি হয়েছিলো। ক্রমশঃই এর চাহিদা কমে আসতে থাকে। পরের বছর আড়াই লক্ষ টাকার, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে দেড় লক্ষ এবং ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে মাত্র এক লক্ষ টাকার এই জাতীয় বস্ত্র বিক্রয় হয়। এই বস্ত্রের অধিকাংশই নাকি তুরস্কে রফতানী হতো। সুলতানের সৈন্যদের পাগড়িরূপে এগুলো ব্যবহৃত হতো। কিন্তু সুলতান তাঁর সৈন্যদের পোশাক পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। ফলে ঐ দেশে কাসিদার চাহিদা বন্ধ হয়ে যায় এবং ঢাকায় এই শিল্পের চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে আসে।

কোম্পানী শাসন-ক্ষমতা দখলের পর অপরাপর ক্ষেত্রে ঢাকার প্রভূত উপকার সাধিত হতে থাকে। মোগল আমলে ঢাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজদের পক্ষে অকল্পনীয় ব্যাপার ছিলো। শহরে পয়ঃপ্রণালীর

ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় প্রায় দশ লক্ষ বাসিন্দা অধ্যুষিত ঢাকা নগরী পুঁতিগন্ধময় ময়লা ও মহামারীর কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই ঢাকায় রোগ ও মৃত্যুর হার ছিলো অস্বাভাবিক। আগের দিনে বাজারের একটা বড় অংশ হালকাভাবে তৈরী করা হতো এবং প্রতি বছরই এটি আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। সঞ্চিত নোংরা আবর্জনা বিনষ্ট করাই ছিলো এর লক্ষ্য। আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডও হরহামেশাই ঘটতো। অধিবাসীরা তাদের মূল্যবান দ্রব্য মাটিতে পুঁতে অথবা চাকা-ওয়ালা বাক্সে রেখে দিতো—যাতে করে দুর্ঘটনার সাথে সাথেই এগুলো টেনে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। মোগল আমলে দরিদ্র ও রুগ্ন ব্যক্তিদের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিলো। লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়েছিলো এবং এইসব লঙ্গরখানার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যে পৃথক জমি বরাদ্দ ছিলো। কিন্তু দারিদ্র্য ও ব্যাধির প্রকোপের তুলনায় এ-ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল ছিলো বলে মনে হয়। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে এই খাতে যে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিলো, তাতে দেখা যায়, 'হাসপাতালের কৃষ্ণকায় চিকিৎসকের বেতন ও ঔষধপত্রের মূল্য বাবত গরীব রোগীদের জন্যে ১৫৭৮।।৶০, অন্ধ ও আতুরদের জন্যে ৩৬০০ টাকা' এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ মিলে মোট ৯০০০ টাকা সরকারীভাবে ব্যয় করা হয়েছিলো। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর হাসপাতাল এবং লঙ্গরখানা স্থাপনের যে ফরমান জারি করেছিলেন, তা বাংলাদেশে কার্যকরী হয়নি বলে মনে হয়। ঢাকার কালেক্টর মিট-ফোর্ডের অনুরোধক্রমে কোম্পানী ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি হাসপাতাল স্থাপন করে। মিটফোর্ডের নামানুসারে এই হাসপাতালের নামকরণ হয়েছিলো। মিটফোর্ড পরে প্রাদেশিক আপীল আদালতের বিচারপতি হয়েছিলেন।

কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, সে একটা দুর্দশাগ্রস্ত প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় যে শান্তি নেমে এসেছিলো, পূর্ব বাংলা এর আগে কোনোদিনই তা ভোগ করতে পারেনি। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যুদ্ধাতঙ্কের অবসান হওয়ায় অধিবাসীরা

শান্তিপূর্ণভাবে জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছিলো। কৃষির সম্প্রসারণ, নীল ও পাট চাষের প্রসার ঘটায় পতিত জমিগুলো আবাদী হয়ে উঠলো। নানা ধরনের অপরাধ প্রথমের দিকে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকলেও ডাকাতি ও রাহাজানির সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিলো। অত্যধিক মামলা ও কলহপ্রবণতার দরুন পূর্ববঙ্গবাসীরা বৃহত্তর স্বার্থ এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেনি। হিন্দু, মুসলমান ও বৃটিশ আমলে এই প্রবণতার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। কোনো-না-কোনো জাতি তাদের শাসন করবেই—এরূপ ধারণাকে অধিকাংশ লোকই অবধারিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো। অদৃষ্টবাদের প্রতি তাদের সহজাত ও প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকার ফলে তারা কোনো শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা চিন্তা করতে পারতো না। তারা চিরকাল শাসিত হবে, এটি অদৃষ্টের লিখন। সুতরাং কে বা কোন্ জাতি তাদের শাসন করছে, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাতো না। শাসন-ব্যবস্থা ভালো হলে সেটিকে তারা আশীর্বাদরূপে গ্রহণ করতো। আর শাসক অত্যাচারী হলেও তার শাসনকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা তা নীরবে সহ্য করে যেতো। কৃচিৎ কদাচিৎ তাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে এরূপ একটি অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিলো। ঐ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা নগরীতে গৃহকর ধার্য করা হলে অধিবাসীরা তা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তারা যুক্তভাবে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে এবং বর্তমান জেলখানার নিকটে পুরানো দুর্গে অবস্থিত সরকারী কাছারীতে মিলিতভাবে একটি আবেদন পেশ করে। এরূপ বিক্ষুব্ধ এবং ক্ষিপ্ত জনতার কাছ থেকে কালেক্টর সে আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। সাধারণ লোক ছাড়াও ঢাকার সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত অধিবাসী এই দরখাস্তে দস্তখত করেছিলেন। এরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সহিকৃত এবং বিক্ষুব্ধ জনতার দ্বারা পেশকৃত আবেদনটি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আবেদনে শুধু গৃহকরই নয়, স্ট্যাম্প-শুল্ক রহিতকরণেরও দাবী করা হয়েছিলো। কালেক্টর আবেদনটি গ্রহণ

করতে অস্বীকার করায় কাছারি লুটের আশঙ্কা দেখা দিলো। ফলে সৈন্যদল তলব করা হলো এবং জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। স্বাক্ষরকারিগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদল পরদিবস শান্ত পরিস্থিতির মধ্যে সেটি পেশ করে।

সমসাময়িক একজন লেখকের লেখায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের ঢাকার একটি মনোজ্ঞ চিত্র পাওয়া যায়। কলকাতার প্রখ্যাত বিশপদের অন্যতম রেজিন্যাল্ড হেবার ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে গীর্জা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকা সফর করেন। 'ষোল-দাঁড়বিশিষ্ট' সুদৃশ্য একটি নৌকায় করে ১৫ই জুন তিনি কলকাতা পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর পারিবারিক পুরোহিত স্টো'র সাথে ৩রা জুলাই ঢাকায় উপস্থিত হন। তিনি লিখেন, 'যতোই ঢাকার নিকটবর্তী হই, ততোই এই নগরীর বিরাটত্ব আর এর ধ্বংস-স্তূপের রাজসিক গাম্ভীর্য আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তুললো।' বিশপ হেবার জেলাজজ মাস্টারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আঠারো দিন ঢাকায় অবস্থান করেন এবং তাঁর অবস্থানকালের একটি বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই বিবরণের তথ্যাদি তিনি জেলাজজ মাস্টারের কাছে প্রাপ্ত হন বলে উল্লেখ করেছেন। বিশপ লিখেন, 'ঢাকা অতীত মহিমা ও ঐশ্বর্যের ধ্বংসস্তূপ মাত্র। এখানকার বাণিজ্য আগের ষোলভাগের একভাগে পর্যবসিত হয়েছে। সুরম্য অট্টালিকা, শাহ্ জাহাঙ্গীরের দুর্গ-প্রাসাদ, সুন্দর মসজিদ ও নওয়াবদের সৌধমালা, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও ফরাসীদের কুঠি ও গীর্জা ইত্যাদি সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেখানে এখন জঙ্গলের রাজত্ব। প্রাচীন প্রাসাদের চত্বরে এক বাঘ শিকারে কালেক্টর মাস্টার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এই শিকারে জঙ্গলে ঢাকা এক কূপের মধ্যে তাঁর জনৈক বন্ধুর একটি হাতি পড়ে গিয়েছিলো। এই জেলায় উৎপন্ন তুলার অধিকাংশই কাঁচামাল হিসেবে ইংলণ্ডে রফতানী হয়। সস্তা দামের জন্যে ঢাকাবাসীরা ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রই বেশী পছন্দ করে থাকে।'

কোম্পানীর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে ইংরেজদের সংখ্যাল্পতা বিশপ হেবারকে বিস্মিত করে তুলেছিলো। তাঁর উক্তি অনুযায়ী, 'ঢাকার পার্শ্ববর্তী

অঞ্চলে কতিপয় নীলকর এবং সামরিক ও বেসামরিক চাকুরিতে নিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া এখানে আর কোনো ইংরেজ নেই। ঐ সময় ঢাকায় পদাতিক সৈন্যের দশটি কোম্পানী বা দল রাখা হয়েছিলো। বর্মা সীমান্ত রক্ষার জন্যে সৃষ্ট কামানবাহী একটি নৌবহর তখন ঢাকায় অবস্থান করছিলো। হিন্দু ও মুসলিম লোকসংখ্যা শায়েস্তা খাঁর আমল অপেক্ষা অনেক হ্রাস পেলেও বর্তমান কাল অপেক্ষা অনেক বেশি ছিলো। মাস্টারের হিসাব মোতাবেক তখনকার ঢাকার জনসংখ্যা ছিলো তিন লক্ষ। কিন্তু গত আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, বর্তমান জনসংখ্যা ঐ সংখ্যার তিন ভাগের চেয়েও কম। বিশপ লিখেছেন, 'সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ঢাকার আবহাওয়া সবচেয়ে মৃদু। নদীবাহিত হওয়ার ফলে উত্তাপ হ্রাস পায় এবং আবহাওয়ায় মৃদুতা আসে। এই ঋতুতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে চলাচলের জন্যে একটিমাত্র সোজা পথ খোলা আছে। গ্রীষ্মকালেও যখন ভূমি শুষ্ক থাকে, তখনও একাধিক পথ থাকে না। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এবং জঙ্গলের দরুন পথ দুরতিক্রম্য হয়ে আছে।'

বিশপ হেবার নওয়াব শামসউদ্দৌলা সম্পর্কে একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ রেখে গেছেন। তিনি 'শেক্সপীয়ারের সমালোচক ছিলেন' একথা পাঠ করে বিস্ময় বোধ করা ছাড়া উপায় নেই। তিনি ছিলেন জেসারত খাঁর পৌত্র। মাত্র দু'বছর পূর্বে তিনি তাঁর ভ্রাতা নসরত জঙ্গের পর নওয়াব পদে অভিষিক্ত হন। ইতিপূর্বে তিনি কলকতায় কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে তাঁকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাঁর কোনো অনিষ্ট করার আর ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিলো না। কাজেই ভ্রাতার অন্তঃসারশূন্য সকল খেতাবের উত্তরাধিকার তাঁকে দান করা হলো। ক্ষমতার প্রতীকরূপী রাষ্ট্রীয় পাল্কি তাঁকে দেওয়া হলো না। তাঁকে মাসিক দশ হাজার টাকার বৃত্তি ও 'হিজ হাইনেস' খেতাব প্রদান করা হলো। স্বীয় রক্ষীদলসহ দরবার অনুষ্ঠানের অনুমতিও তাঁকে দেওয়া হলো। শামসউদ্দৌলা একটি করুণ চরিত্র। সর্বপ্রকার ক্ষমতাবঞ্চিত এই ব্যক্তির জীবনে দেওয়ার কিছুই ছিলো না। প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সবকিছুই পুতুল নাচ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ভ্রাতা যে-সব অন্তঃসারশূন্য খেতাবের অধিকারী ছিলেন, সেগুলোর উত্তরাধিকারী হওয়া ছাড়া আর কিছুরই প্রত্যাশা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। যৌবনে তিনি যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। কারণ, এই পথেই শৃঙ্খল মোচন করে পুরুষের মতো বেঁচে থাকার সুযোগ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। পিতামহের অনেক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু জীবনে এই সব গুণকে কাজে লাগানোর কোনো সুযোগই তিনি লাভ করেননি। যৌবনে তিনি 'প্রবল ধীশক্তি ও অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। সুষ্ঠুপথে এগুলো'র বিকাশ সাধিত হলে তিনি একজন বিরাট লোক হতে পারতেন।' কিন্তু প্রেরণার অভাবে সবই বিনষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী জীবনে বিশপ হেবার যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি 'অথর্ব ও অলস। এশীয় রাজবংশোদ্ভূত সন্তানদের স্বভাবসুলভ আলস্য তাঁকে ক্রমাগত পেয়ে বসেছে। তাঁর সামনে এমন কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই, যা তাঁকে কোনো কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারে। তাই শান-শওকত ও বাহ্যাড়ম্বর, নর্তকী বালিকা এবং আফিমের মধ্যে তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন।'

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা প্রাচীন আর নবীনের মিলন-ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। নওয়াবের সাথে বিশপ হেবারের আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিশব যে বিবরণ রেখে গেছেন, তার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে এই প্রাচীন আর নবীন। ৮ই জুলাই বিশপ লিখেন, 'পূর্ব-নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অপরাহ্নে নওয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে কালেক্টর মাস্টারকে সাথে নিলাম। গাড়ি করে শহরের রাস্তা ধরে অনেক দূর অগ্রসর হলাম। তারপর একটি পথ দু'পাশে বৃক্ষরাজি, মাঝে মাঝে পর্ণকুটীর। এই পথ পেরিয়ে ইটের তৈরী পুরানো একটি ফটক। ফটক পার হয়েই একটা সংকীর্ণ বেষ্টিত স্থান। এর মাঝখানে একটা বিরাট বৃক্ষ এবং ঝোপ-ঝাড় আর চারিদিকে ধ্বংসোন্মুখ অট্টালিকারাজি। সেখানে একদল সৈন্য আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে মোতায়েন

রাখা হয়েছিলো। এদের পোশাক ছিলো নিখুঁত। কোম্পানীর স্থানীয় সেনা-বাহিনীর একটি দল এটি। এদের কাজ ছিলো নওয়াবকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করা। সামনে একটি সুদৃশ্য ফটক আর তার সাথে একটা খোলা প্রকোষ্ঠ চোখে পড়লো। এর মধ্যে প্রতি সন্ধ্যায় নহবত বাজতো এবং নওয়াবের সার্ব-ভৌমত্ব প্রকাশ করতো। সার্বভৌমত্বের কোনো কিছুই তাঁর না থাকলেও সরকার এই ব্যবস্থাটি অব্যাহত রেখেছিলেন। এখানে নওয়াবের স্বীয় দেহরক্ষীরা অদ্ভুত পোশাকে অবস্থান করছিলো। এ ছাড়াও রূপোর ছড়ি হাতে ছিলো কয়েকজন লোক। এরা আমাদের ভেতরের দরবারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলো। এটি একটি প্রশস্ত কক্ষ। চারপাশে ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর কয়েকটি অট্টালিকা। ঘরটি পরিচ্ছন্ন এবং চুনকাম করা। ডান দিকে একটি সিঁড়ি বরাবর উঠে গেছে আটকোণী ও খিলানযুক্ত একটি প্রকোষ্ঠে। কক্ষটির চারিদিকে বারান্দা এবং বড় খিলানযুক্ত জানালা। আট-কোণী এই কক্ষে ছিলো একটি বৃহৎ গোলাকার টেবিল। লাল রঙের কাপড়ে টেবিলটি ঢাকা। মেহগিনি কাঠের কয়েকটি চেয়ার, দু'টি সুন্দর বড়ো আয়না, সম্রাট আলেকজাণ্ডার, লর্ড ওয়েলেসলি, হেস্টিংস ও ডিউক অব ওয়েলিংটনের কয়েকটি ফটো এবং চিনারী অঙ্কিত স্বয়ং নওয়াব ও তাঁর ভ্রাতার সুন্দর দু'টি প্রতিকৃতি ঐ কক্ষে সজ্জিত ছিলো। এই ঘরের সাজ ও প্রতিটি আসবাবের মধ্যে ফুটে উঠেছিলো সম্ভ্রম আর আভিজাত্যের চিহ্ন। নওয়াব, তাঁর পুত্র, ইংরেজ সেক্রেটারী ও গ্রীক পুরোহিত দরজা পর্যন্ত এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। নওয়াব আমার হাত ধরে টেবিলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বসে আলাপ-আলোচনা চললো। আমি যেরূপ আশা করেছিলাম, তার চেয়ে অনেক ভালভাবে আলাপ-আলোচনা হলো। তাঁর বুদ্ধি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান এবং সুন্দর ব্যবহারে আমি চমৎকৃত হলাম।' এ যেন অতীত জমানার শেষ ও এক ঝলক আলোক। কুড়ি বছর পরে ঢাকা থেকে মুসলিম কর্তৃত্বের নামমাত্র চিহ্নটুকুও নিঃশেষে মুছে গিয়েছিলো।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ঢাকার জনসাধারণকে নাড়া দিতে

পারেনি। লালবাগে যে সংক্ষিপ্ত নাটকটি অভিনীত হয়, তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকাই তারা পালন করেছিলো। কিন্তু এই কয়টি মাস ঢাকার ইংরেজদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উত্তেজনাকর এবং সঙ্কটপূর্ণ কাল ছিলো। ৭৩ তম ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর মাত্র দু'টি দল তখন এখানে ছিলো। গোলন্দাজ সৈন্যসহ এদের সংখ্যা ২৬০-এর বেশী হবে না। মীরাটে বিদ্রোহের প্রথম সংবাদ পাওয়ামাত্রই সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অফিসারগণ ভীত হয়ে পড়লো। যে ক্ষুদ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায়টি ঢাকায় অবস্থান করছিলো, তাদের জীবন রক্ষাই বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কলকাতায় সংবাদ পাঠানো হলো। ভারতীয় নৌবাহিনীর একশত নৌসেনার একটি দলকে সাথে সাথে ঢাকায় আসার হুকুম দেওয়া হলো। নগণ্য সংখ্যক হলেও ঐ সঙ্কটকালে এর চেয়ে বেশী সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব ছিলো না। ইউরোপীয় অধিবাসীরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান করলো। এদের সংখ্যা ছিলো সর্বমোট ষাট। ঐ সময় ডেভিডসন ঢাকার কমিশনার, এ্যাবরকম্বি জজ এবং কারনাক ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর।

সমস্ত বর্ষাকাল ধরে সিপাহীদের মধ্যে অশান্ত ভাব থাকলো। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্রোহের যে সব অতিরঞ্জিত সংবাদ তাদের কাছে গুপ্তভাবে পৌঁছতো, তা শুনার জন্যে তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। অবশেষে ২১শে নবেম্বর কতিপয় নাবিক ঢাকায় পৌঁছে সংবাদ দিলো যে, চট্টগ্রামের সিপাহীরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সমস্ত বাজারে নানা প্রকার গুজব ছড়িয়ে পড়লো। চট্টগ্রামে ট্রেজারী লুট করে বিদ্রোহীরা তিন লক্ষ টাকা নিয়ে গিয়েছে বলেও জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার প্রধান কর্মচারিগণ সাথে সাথেই এক আলোচনা-সভায় যোগদান করেন এবং পরদিন প্রাতে আকস্মিকভাবে সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে নবেম্বর রবিবার ভোর ৫টায় কুয়াশাচ্ছন্ন আধা-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে ত্রিশজন ইয়োরোপীয় স্বেচ্ছাসেবক এবং একশত নৌসেনা বর্তমানে যেখানে ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঠিক সেইখানে

খোলা যায়গায় লাইন বেঁধে দাঁড়ালো। সেখান থেকে একটা ক্ষুদ্র দল মার্চ করে ট্রেজারীতে গমন করলো। বর্তমানে যেখানে সেন্ট্রাল জেল, সেখানে তখন ট্রেজারী অবস্থিত ছিলো। সেখানে তারা ত্রিশজন সিপাহীকে দেখতে পেলো। তাদের কেউ কেউ প্রহরারত ছিলো, কারো-বা ডিউটি ছিলো না। সহজেই তাদের নিরস্ত্রীকৃত করা গেলো। সিপাহীগণ শান্তভাবে অস্ত্র সমর্পণ করলো। তারা প্রতিবাদ জানালো যে, তাদের বিদ্রোহে যোগদানের কোনো ইচ্ছাই ছিলো না—কাজেই এরূপ লাঞ্ছনা তাদের প্রাপ্য নয়।

ট্রেজারী নিরাপদ করার পর নৌসেনারা সাথে সাথেই লালবাগ কেল্লাভিমুখে ধাবিত হয়। সৈন্যদের মূল অংশটি সেখানে অবস্থান করছিলো। কিন্তু ট্রেজারী প্রহরারত সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণের সংবাদ ইতিমধ্যেই তাদের নিকট পৌঁছে গিয়েছিলো। সিপাহীরা তাদের বাধা দেওয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। দক্ষিণ তোরণের নিকটে ভাঙা প্রাচীরের মধ্য দিয়ে নৌসেনারা কেল্লায় ঢুকে পড়লো। সান্ত্রী তাদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লে একজন নৌসেনা নিহত হয়। সিপাহীরা প্রতিরোধ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ক্রমাগত গুলী ছুঁড়তে লাগলো। পরী বিবির সমাধির সম্মুখে স্থাপিত কামানটির মুখ সৈন্যদের লক্ষ্য করে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। অধিকাংশ সিপাহীই বামদিকে কেল্লা-প্রাকারে স্থান নিয়েছিলো। পরিষ্কার বুঝা গেলো যে, নায়কের অভাবে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং গোলযোগ শুরু হয়েছে। লেফ্‌টন্যান্ট লজের নেতৃত্বে নৌসেনা এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের আক্রমণ করলো এবং সিপাহীদের তাদের আবাস স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে তাড়া খেয়ে তারা বুরুজের কাছে এসে জড় হয়। এখানে তারা প্রবলভাবে বাধা দিতে থাকে। কিন্তু সেনাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে অনেকেই প্রাচীরের অপর পারে পঞ্চাশ ফুট নীচে পড়ে যায়। মেইজ নামক জনৈক নৌ-কর্মচারী আটজন সৈন্য নিয়ে বীরত্ব সহকারে সিপাহীদের আক্রমণ করে কামানগুলো অধিকার করে। তার এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্যে সে ভিক্টোরিয়া ক্রস পদক লাভ করে। সিপাহীরা

সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হলো। তাদের চল্লিশজন নিহত হয় এবং অধিকাংশই পলায়ন করে। নৌসেনা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী ছিলো না। সান্ত্রীর গুলীতে একজন নিহত ও নয়জন গুরুতররূপে আহত হয়েছিলো। আহত সৈন্যদের মধ্যে চারজন পরে মারা যায়। সিভিল সার্জন ডাঃ গ্রীন একজন আহত সেনার সুশ্রূষা করতে গিয়ে গুরুতররূপে জখম হন। এসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেইনব্রিজ প্রাচীর থেকে পড়ে গিয়ে সাংঘাতিকরূপে আহত হলেন। যে বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছিলো, তার তুলনায় এইসব ক্ষয়ক্ষতি নগণ্যমাত্র। ঢাকা বিদ্রোহীদের হাতের মুঠোয় ছিলো। সময় মতো ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছিলো।

ঐ সময় মিঃ ব্রেন্যান্ড ছিলেন সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি যে ডাইরী রেখে গেছেন, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার একটি দিকের চিত্র তাতে ফুটে উঠেছে। যদিও প্রকৃত বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছিলো, এবং এখানে একটা চাপা অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছিলো, তথাপি বাহ্যিক সামাজিক জীবন অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছিলো। এখানকার ইংরেজদের সামাজিক জীবন অধিকতর গতিশীলতা ও বৈচিত্র্য লাভ করে। নূতন সেনাদলের আগমনে ইংরেজদের সামাজিক জীবনে সাড়া পড়ে যায়। ব্রেন্যান্ডের ডাইরী থেকে জানা যায় যে, ১২ই অক্টোবর অশ্বারোহী স্বেচ্ছা-সেবক দল পদাতিক স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্দেশে এক বল নাচ পার্টির আয়োজন করে। ৯ই নবেম্বর পদাতিক দল অফিসারদের উদ্দেশে অনুরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। ব্রেন্যান্ডের গৃহে এই পার্টি অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় এতো বড়ো পার্টি আর কোনো দিন অনুষ্ঠিত হয়নি। সত্তর জন এতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং পঞ্চাশ জনেরও অধিক ভোজে অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। ট্রেজারীর সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণ এবং লালবাগে সংঘর্ষের মাত্র বারোদিন আগে এই পার্টি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই উত্তেজনাকর ঘটনাটি ঢাকার কর্মচারীদের জীবনকে এতো স্বল্প পরিমাণে প্রভাবিত করেছিলো যে,

ব্রেন্যান্ড লিখেন, 'পরদিন সব কিছুই শান্ত হয়ে এলো এবং আমরা এমন স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করলাম, যা দেখে মনে হবে যেনো কোনো ঘটনাই ঘটেনি।' পরবর্তী মাসে ঢাকায় ইংরেজদের সামাজিক জীবনে উৎসবের ঢল নামে। অত্যধিক গরম ও বর্ষণ সত্ত্বেও তাদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। ১২ই জুলাই ব্রেন্যান্ড ডাইরীতে লিখেন, 'সেনানিবাস এখন আনন্দমুখর। গণি মিয়ার গৃহে একটি ও কার্ণেগীর গৃহে একটি ও এর পর ব্যাচেলারদের দ্বারা আর একটি বল নাচের অনুষ্ঠান।' ১৫ই তারিখের ডাইরীতে লিপিবদ্ধ হলো, 'সেনানিবাস আনন্দমুখর। পর পর তিনটি বল নাচ পার্টি।' বর্ষার দিনে ঢাকার মতো জায়গায় এক মাসে ছয়টি বল নাচ। অতীতের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উৎসাহ-উদ্যম কিরূপ ছিলো এবং বিগত পঞ্চাশ বছরে ঢাকার পারিবারিক জীবনে কি বিরাট পরিবর্তন হয়েছে, তা লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়।

এই নগরীতে বিপুল পরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছিলো। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা দিয়েছিলো, বহু দূরান্তে অবস্থিত এই ঘুমন্ত নগরীকেও তা নাড়া দিয়েছিলো। তখন পর্যন্ত এখানে কোনো রেল বা তার যোগাযোগ স্থাপন করা হয়নি এবং মুসলমান আমলে বহু নদনদী-বেষ্টিত এই শহরটি বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো, তখনও এর অবস্থা তেমনি রইলো। কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার বহুদিনের এই বিচ্ছিন্নাবস্থার অবসান হলো এবং পাশ্চাত্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সদর দফতরের সাথে এর যোগাযোগ স্থাপিত হলো। ব্রেন্যান্ডের ডাইরীতে দেখা যায় যে, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ঢাকার সাথে কলকাতার তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়। এই উন্নতি প্রাচ্যের এই মন্থরগতি নগরীর পক্ষে যে কতোবড়ো পদক্ষেপ, আজকের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দিনে তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ঢাকা চারদিক থেকে বহু নদী দ্বারা বেষ্টিত থাকায় রেল যোগাযোগ স্থাপন তখনও বিরাট সমস্যার ব্যাপার ছিলো। পরে কলকাতার সাথে

ঢাকার রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলেও আজও ৬ ঘণ্টার পথ নৌকাযোগে পাড়ি দিতে হয়।

ব্রেন্যান্ডের ডাইরীর সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নবেম্বরে উল্লিখিত এই কয়টি লাইন : 'কলেজের সম্মুখস্থ স্থানটিতে মহারাণীর নিকট ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত ঘোষণাটি গত সোমবার ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় পঠিত হয়। সৈন্যগণ লাইন করে দাঁড়ায় এবং এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নির্মিত একটি মঞ্চে ইউ-রোপীয় বাসিন্দাগণ উপবিষ্ট হয়। দু' তিন হাজাব লোক উপস্থিত ছিলো। সন্ধ্যায় কোনো কোনো গৃহে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয় এবং বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারিগণ ডিনারের ব্যবস্থা করে।'

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জীবনাবসান হলো, পড়ে রইলো তার বিরাট ঐতিহ্য আর বিস্ময়কর স্মৃতিপুঞ্জ। বিপুল শ্রম, সাহস ও অধ্যবসায়ের সাথে যে ভিত্তি সে রচনা করেছিলো, তারই ওপর গড়ে উঠলো একটি সাম্রাজ্য।

দশম অধ্যায়

আজকের ঢাকা

আজকেব ঢাকা দুইটি কালের সন্ধি-পথে দাঁড়িয়ে আছে। এর পেছনে পড়ে রয়েছে তিন শতাব্দীর স্মৃতিতে ঘেরা এক মহান অতীত। ভগ্নপ্রায় মসজিদ আর প্রাসাদগুলোকে ঘিরে রযেছে এই সব স্মৃতির পুঞ্জ। বিংশ শতাব্দীর নব প্রভাতের সাথে সাথেই এর সামনে ফুটে উঠলো এক বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। সুবেদার ইসলাম খাঁ হঠাৎ এটিকে এক বিরাট মর্যাদায় উন্নীত করার পব নগরীটি প্রায় এক শতাব্দী ধরে বাংলার রাজ-ধানীরূপে বিদ্যমান থাকার গৌরব ও মর্যাদা ভোগ করে। যেমন আকস্মিক-ভাবে সে খ্যাতির তুঙ্গশিখরে উত্তীর্ণ হয়েছিলো, তেমনি আকস্মিকভাবেই তার পতন হয়েছিলো। দুই শতাব্দী ধরে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলো। তাব গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য অবহেলিত এবং বিস্মৃত হয়ে পড়লো। পরবর্তী যুগে বৃটিশ শাসনামলে একটি জেলার সদর দফতরে পর্যবসিত হওয়ার মতো হীন অবস্থায় সে নিপতিত হলো। দীর্ঘদিনের ঘুমের পর আজ সে আবার জেগে উঠছে এবং প্রাচ্যের রাজধানী-সমূহের সাথে তার নামও উচ্চারিত হতে চলেছে।

বহু উত্থান-পতন ও ভাগ্যবিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই নগরীটিকে। আজ আবার এক রূপান্তরের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ রূপান্তর যেনো একটি পুরানো জীর্ণ জামায় নয়া কাপড়ের তালি। অসংখ্য মসজিদ, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদসমূহ, শ্যাওলাধরা দেয়াল ও প্রাচীর, বিধ্বস্তপ্রায় গম্বুজ, আঁকাবাঁকা পথ ও অলিগলি, অন্ধকার দরবার, আদালত ও ঘিঞ্জি বস্তি নিয়ে সেই পুরানো ঢাকা আজো বেঁচে আছে দুর্ভেদ্য রহস্যের বর্মে আবৃত হয়ে। অসংখ্য রহস্য গুপ্ত হয়ে আছে তার অন্তরের মধ্যে—পরম নিষ্ঠার

সাথে সে এগুলোকে ঢেকে রেখেছে সন্ধানী চোখের আড়ালে চিরকালের জন্যে। কিন্তু এই ধূসর প্রাচীনের পটভূমিতে লাল ইটের তৈরী আধুনিক ঢাকা শহর গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এখনো ভ্রূণাবস্থায় থাকলেও এর সূচনা থেকে এই শহরটির ভবিষ্যৎ রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এখানে সাময়িকভাবে একটি গবর্ণমেণ্ট হাউস (ছোটলাট-ভবন) স্থাপিত হয়েছে। এই প্রাচীন নগরীতে যে নবজীবনের সুপ্রভাত হয়েছে, এটি তারই প্রতীক। নয়া রাজধানীর উপযোগী একটি বিরাট ও স্থায়ী লাটভবন রেসকোর্স সংলগ্ন হাজী খাজা শাহ্‌বাজের কবর ও মসজিদের কাছে পরে তৈরী করা হবে। হাজী খাজা শাহ্‌বাজ শায়েস্তা খাঁর আমলে ঢাকার শ্রেষ্ঠতম বণিক ছিলেন। সরকারী অফিস-আদালত এবং সামরিক কর্মচারীদের জন্যে যেসব গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে, আধুনিক ও নব্যযুগের সুস্পষ্ট ছাপ বহন করে সেগুলো গড়ে উঠতে শুরু করেছে।

আজো এই শহর মাঝে মাঝে এমন সাজে সজ্জিত হয়ে ওঠে, যা অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বড়ো বড়ো প্রায় সব ক'টি উৎসব এখনো প্রতিপালিত হলেও এগুলোর মধ্যে আজ আর সে জৌলুস ও আড়ম্বর নেই। কিন্তু একটি উৎসব এখনও সেই অতীতের মতোই বিরাট উদ্দীপনার সাথে মহাড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়। এটি হচ্ছে ঢাকার তাঁতীদের বিশেষ পর্ব—জন্মাষ্টমী উৎসব। কৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে শ্রাবণের চান্দ্র মাসের হিসাবে ২৩ তারিখে এটি অনুষ্ঠিত হয়। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে এই শান্ত ঘুমন্ত নগরীর রূপান্তর ঘটে। এই উৎসব উপলক্ষে বহু দূর দূরান্ত থেকে দলে দলে লোক এসে প্রধান রাস্তাগুলোতে সমবেত হয়। রাস্তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জনারণ্যে পরিণত হয়। মিছিলের সময় যতোই নিকটবর্তী হতে থাকে, ততোই মনে হবে শহরটি যেনো মধ্যযুগে ফিরে গেছে। মনে হবে, এইতো শায়েস্তা খাঁর সেই রাজধানী। আধুনিক কালের সবকিছুই সেদিন মুখ লুকায়। চারধারে শুধু উৎসবমুখর জনতার ভিড়। গৃহের

জানালায়, বারান্দায় ও ছাদে দলে দলে লোক উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে। এক পাল হাতি মিছিলে যোগদানের জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্যের প্রখর তেজ, বাতাসও নেই—তবুও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে উৎসুক জনতা অসহ্য গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দ পায়। অবশেষে আস্তে আস্তে সেই বিপুল মিছিল দৃষ্টিগোচর হয়। সে-কি উত্তেজনা আর উন্মত্ত আনন্দ। মিছিলের দিকে তাকালে শুধু দেখা যাবে মাথা আর মাথা—অজস্র, অগণিত, যেনো শিরসমুদ্র। অশান্ত ঢেউয়ের মতো এগিয়ে আসে মিছিল। দেব-দেবীদের অসংখ্য মূর্তি ও জন্তু জানোয়ার, কদাকার ও ভীষণ-দর্শন চেহারা জনতার বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করে। বাঁশের তৈরী এই-সব মূর্তির কোনো কোনোটি ৫০ ফুট উঁচু। নানা দৃশ্য ও মূর্তির সাহায্যে এগুলোতে বহু গল্প-কাহিনী বলা হয়ে থাকে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে সার্বজনীনত্ব ও বৈচিত্র্য থাকে। পৌরাণিক যুগের এই উৎসবে পোর্ট আর্থারের পতনের মতো একটি অতি-আধুনিক ও বিদেশী ঘটনাও একটি বিরাট কাঠামোর ওপর একটির পর একটি দৃশ্য সাজিয়ে দেখানো হয়। অবশ্য যুদ্ধ এবং রুশ ও জাপানী জাতি সম্পর্কে পরিকল্পকের ধারণা অদ্ভুত। পেছনে একটি বিরাট শকটে নানা রঙ এবং বহু মণিমুক্তায় বিভূষিত কৃষ্ণের অসংখ্য প্রতিমূর্তি বয়ে আনা হয়। মহামিছিল এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলে। অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যে আজকের এই শান্ত মন্থরগতি শহরে সুবেদার-শাসিত ঢাকার জীবন এবং সমারোহের অনুভূতি নেমে আসে।

কিন্তু এই শহরের মর্মকেন্দ্রে—নদী তীরবর্তী অঞ্চলে এখনো অতীত টিকে আছে। কাল, আবহাওয়া আর বর্বর মানুষের হাতে অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এমনকি মুসলিম স্থপতি-শিল্পীদের তৈরী বিশালকায় প্রাকার-গুলোও তাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। তথাপি আজো এইসব স্থাপত্য নিদর্শনের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অনেকাংশেই অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা সম্পূর্ণ-রূপে একটি মুসলিম নগরী—মসজিদের নগরী। ঐসব বিশ্বাসী ঈমানদার মানুষ এগুলো নির্মাণ করিয়েছিলেন—যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এই

পৃথিবীতে যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ বেহেশ্তে তার জন্যে ৭০টি মসজিদ তৈরি করে দিবেন। ইসলাম খাঁ নূতন রাজধানীর স্থান অন্বেষণে এখানে আগমনের পূর্ববর্তী কালের ঢাকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। আগে থেকেই এখানে একটি শহর ছিলো কিনা অথবা ইসলাম খাঁর আগমনের সাথে সাথেই এখানে শহর গড়ে উঠেছিলো, সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। ঢাকা শহরের অভ্যুদয় সম্পর্কে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে ধরনের কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এক কিংবদন্তী অনুযায়ী ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। কিন্তু এই মন্দিরটির উৎপত্তিই রহস্যাবৃত রয়েছে। ঢাকেশ্বরী এ জেলার হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্র মন্দির। কথিত আছে যে, বল্লাল সেন বনমধ্যে যেখানে দেবী দুর্গার মূর্তি লুক্কায়িত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, সেখানেই তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন। বিখ্যাত রাজপুত সেনানায়ক মানসিংহ এই শহরে অবস্থানকালে নাকি এটির সংস্কার সাধন করেছিলেন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের এতগুলো মসজিদের মধ্যে তাঁর নিজধর্মের এই প্রতীকটি দেখতে পেয়ে তিনি পরম আহ্লাদিত হয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই এরূপ একটি মন্দির তখন থেকে থাকলেও পরবর্তী কালে এর কোনো চিহ্নই ছিলো না। বর্তমান মন্দিরটির বয়স দু'শ' বছর মাত্র। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক হিন্দু এজেন্ট এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। কতকগুলো অস্পষ্ট কিংবদন্তী এবং এর প্রতি হিন্দুদের প্রগাঢ় ভক্তি ছাড়া আজকের ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আকর্ষণের কিছুই নেই।

ইসলাম খাঁর পূর্ববর্তী কালের স্মৃতি বহন করে আরো কয়েকটি ইমারত ঢাকায় এখনো বিদ্যমান আছে। এই শহরে অবস্থিত ইমারতগুলোর মধ্যে বিনাত বিবির মসজিদই সম্ভবতঃ সবচেয়ে পুরাতন। ১৪৫৬ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ইসলাম খাঁর ঢাকা আগমনের দেড়শ' বছর পূর্বে নাসীর উদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্ যখন বাংলার সুলতান, সেই সময় এটি নির্মিত হয়েছিলো। এই ক্ষুদ্র এবং মজবুত ইমারতটির মধ্যে স্থাপত্য শিল্পের তেমন কোনো নিদর্শন না

থাকলেও ঐতিহাসিক দিক দিযে এটির সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। ইসলাম খাঁর শাসনামলের বহু পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলে যে মুসলমানগণ বাস করতো, এটি তারই স্বাক্ষর বহন করে। বিনাত বিবি কে ছিলেন বা কোন্ স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার জন্যে তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, তা স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে যেখানে পুরানো কেল্লাটি অবস্থিত ছিলো, সেখানে আর একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনো টিকে আছে। মসজিদে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, বিনাত বিবির মসজিদের দু'বছর পর এটি নির্মিত হয়েছিলো। দীর্ঘ চারি শতাব্দীর অধিককাল অক্ষয় অবস্থায় থাকার পর বজ্রপাত ও ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে এটি নষ্ট হযে যায়। তবে এর চার ফুট চওড়া মজবুত দেওয়ালগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং উৎকীর্ণ লিপিও অক্ষত অবস্থায রযেছে। এই লিপিমতে নাসির উদ্দীন যখন বাংলার সুলতান, তখন এটি তৈরি হয়েছিলো এবং ১৪৫৮ খ্রীস্টাব্দের শাবান মাসে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছিলো।

কিন্তু ঢাকায় সুবেদারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওযার একশ' বছরের আগে এখানে অসংখ্য মসজিদ ও অট্টালিকা—যা আজো এখানকার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—গড়ে ওঠেনি। এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম খাঁর স্মৃতি সামান্য মাত্রই অবশিষ্ট আছে ইটপাথরের মধ্যে। ইসলামপুর এখনো এই সুবেদারের স্মৃতি বহন করছে। সেখানে একটি উল্লেখযোগ্য ইমারত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। জনশ্রুতি মতে এটি ইসলাম খাঁই নির্মাণ করেছিলেন। এটি একটি মসজিদ। সাদাসিদে অলঙ্কারহীন এ মসজিদটি নির্মাণকালে স্থাপত্য-কুশলতা অপেক্ষা কার্যোপযোগিতা ও স্থায়িত্বের ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। কার্যোপযোগিতা ও স্থায়িত্বের প্রমাণ এটি দিয়েছে। কারণ, ইসলাম খাঁর আমলের মতো এখনও সেখানে নিয়মিত নামাজ আদায় হচ্ছে।

ঢাকার তৃতীয় মোগল নওয়াব নাজিম বা সুবেদার ইব্রাহিম খান নির্মিত পুরানো কেল্লার কোনো চিহ্নই এখন অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে যেখানে

পাগলা গারদ ও সেন্ট্রাল জেল, সেখানে এটি অবস্থিত ছিলো। কেল্লার মধ্যে ছিলো মহল, বিচারালয়সমূহ এবং টাকশাল। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ এজেন্ট লেফ্‌টন্যাণ্ট সুইল্‌টন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে দেওয়ানী কার্যভার গ্রহণের জন্যে যখন আগমন করেছিলেন, নায়েবে নাজিম তখন এই প্রাসাদেই বাস করছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সরকারের সদর দফতররূপে দুর্গস্থ ইমারতগুলো বহুদিন যাবৎ ব্যবহৃত হয়। নায়েবে নাজীম ও তাঁর বংশধরদের অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

শায়েস্তা খাঁর পরই যাঁর শাসনকাল ঢাকায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে, তিনি হচ্ছেন শাহ্‌জাহানের আমোদপ্রিয় পুত্র শাহ্ শুজা। এই নগরীর কতকগুলো অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকা স্থাপত্যশিল্পে তাঁর বিশেষ অনুরাগ এবং সৌন্দর্য ও আড়ম্বর-প্রীতির পরিচয় বহন করছে। যিনি তাজমহলের স্রষ্টা, তাঁর পুত্র যে বাংলার শাসনভার লাভ করার পর প্রাচ্যের এই রাজধানীটিকে সৌন্দর্যময় করে তুলবেন, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? লালবাগ কেল্লা থেকে নদীর ভাটির দিকে অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত সুদৃশ্য বড়কাটরা প্রাসাদটিকে সম্ভবতঃ প্রথমে শাহ্ শুজার প্রাসাদ করার পরিকল্পনা ছিলো। অত্যন্ত মজবুত করে তৈরী মনোরম অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ ও সমুন্নতশীর্ষ এই অট্টালিকাটি নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রধান ফটকটি আকারে বিপুল এবং সুউচ্চ। ফটকটির ওপরে অর্ধগোলাকার একটি ছাদ এবং দু'পাশে কতকগুলো ক্ষুদ্র প্রবেশপথ। আটকোণী দু'টি অতুঙ্গ বুরুজ যেনো অট্টালিকাটির মাথায় মুকুটরূপে বিরাজ করছে। ভেতরে অসংখ্য কক্ষ, বারান্দা এবং দরদালান। বহুদিনের অব্যবহারের ফলে সর্বত্র এখন আগাছা, বাদুড়, পেঁচা আর সরীসৃপের রাজত্ব। ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান মীর আবুল কাসিম এটি নির্মাণ করেছিলেন। এই বিশাল ইমারতটির ওপর উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে, নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে এটি এতো মনোরম দেখায় যে, এর রূপের কাছে বেহেশতের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যায় এবং বেহেশতি সুখের পূর্ব-স্বাদ এখানেই

আস্বাদন করা যায়। মনে হয়, কোনো অজ্ঞাত কারণে শাহ্ শুজা শাহী মহলরূপে এটি কখনো ব্যবহার করেননি। এই ইমারতটিতে তিনি সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। মুসাফির ও দীন-দুখীরা এখানে আশ্রয় লাভ করতো। কাটরার ফটকে এককালে একটি খোদিত লিপি ছিলো। তাতে বলা হয়, 'দান ও বদান্যতায় শাহ্ শুজার সুনাম সর্বজনবিদিত। আল্লাহ্র রহমতের ওপর ভরসা রেখে এই পবিত্র ইমারত ও তৎসংলগ্ন বাইশটি দোকান দান করা হয়েছিলো। এর ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ শর্ত এই যে, যে-সব কর্মচারীর ওপর এর পরিচালনার ভার থাকবে, এগুলো থেকে অর্জিত আয় তারা প্রয়োজনীয় মেরামতকার্যে এবং গরীব-মিসকিনদের জন্যে ব্যয় করবেন এবং তাঁরা কোনো দুঃস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো খাজনা আদায় করতে পারবেন না।' ঐতিহ্যগৌরব এই গরিমাময় অট্টালিকাটির আর সে দিন নেই। কোনো কোনো প্রাচীর ও দেয়াল ভেঙে পড়েছে। উত্তরের ফটকটি আর অবশিষ্ট নেই। এতৎসত্ত্বেও যতদিন পর্যন্ত এর দেয়ালগুলোর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে, ততোদিনই এর আকর্ষণ ও মনোহারিত্ব কিছুতেই বিনষ্ট হবে না। আশা করা যায়, নগর সরকার ঢাকার সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময় এই অট্টালিকাটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

সুলতান শুজার শাসনকালের আর একটি স্মারক হচ্ছে হোসেনী দালান। এক জনশ্রুতি মতে নাওয়ারার তত্ত্বাবধায়ক মীর মুরাদ স্বপ্নে দেখেন যে, হজরত ইমাম হোসেন তাঁর কাছে এসে এই অভিলাষ প্রকাশ করেন যে, তাঁর শাহাদাতের স্মৃতি স্মরণে একটি বিলাপ বা মরসিয়া-গৃহ যেনো নির্মাণ করা হয়। পরদিন প্রাতেই মীর মুরাদ হোসেনী দালান নির্মাণের কাজে হাত দেন। সেদিন থেকে অদ্যাবধি এখানে মহসমারোহে মহররম পর্ব প্রতিপালিত হয়ে আসছে। মহররমের দশম দিবসে এক সহস্র প্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে এই দালান প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় জমে যায়। এর কাছাকাছিই যে সমাধি-সৌধ দেখা যায়, তাতে সমাহিত হয়ে আছেন ঢাকার শেষ চারজন নায়েবে নাজীম—নওয়াব নসরত জং (১৮২২), শামসউদ্দৌলা

(১৮৩১), কামরুদ্দৌলা (১৮৩৪) ও গাজী উদ্দীন। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে এর মৃত্যুর সাথে সাথেই নায়েবে নাজীম পদ বিলোপ করা হয়।

শাহ্ শুজার আমলে তৈরী চুড়িহাট্টা মসজিদ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী এখনো প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, এটি প্রথমে হিন্দুদের মন্দির হিসেবে তৈরি হয়েছিলো। এর চূড়া এবং সাধারণ আকৃতি দেখে তাই মনে হয়। মোগল সরকারের জনৈক হিন্দু আমলাকে নাকি একটি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়েছিলো। যে অন্তর্বর্তী কালের জন্যে এখান থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিলো, এটি তখনকার ঘটনা। যাহোক, নওয়াব নাজীম এবং উচ্চপদস্থ আমলাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে উক্ত হিন্দু আমলাটি মসজিদের পরিবর্তে মন্দির নির্মাণ করেন। নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হলে সেখানে প্রতিমা-বিগ্রহ ইত্যাদি স্থাপন করা হলো। ইতি-মধ্যে ব্যাপারটি নওযাব নাজীম বা সুবেদারের কর্ণগোচর হয। তিনি সেখান থেকে প্রতিমা-বিগ্রহাদি সরিয়ে ফেলে ইমারতটি পাক সাফ করে মসজিদে পরিণত করার হুকুম জারি করলেন। কয়েক বছর আগে এই মসজিদ প্রাঙ্গণে হিন্দুদের দেবতা বাসুদেবের একটি মূর্তি পাওয়া যায়। সুলতান শুজার আদেশে যে-সব মূর্তি অপসারণ করা হয়েছিলো, এটি সম্ভবত: সেগুলোর একটি। এ ঘটনা সত্য হয়ে থাকলে এটি তখনকার দিনের স্বাভাবিক ব্যাপার নয়—একটি ব্যতিক্রম মাত্র। কারণ, মুসলমানদের দ্বারা পূর্ব বাংলা বিজিত হওয়ার পর থেকে মুসলমান শাসকগণ হিন্দুদের পূজা-পার্বণ বা ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা ধর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেননি। হিন্দুদের মন্দির মুসলমানদের মসজিদের পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি। পূর্ব বাংলার দীর্ঘদিনের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে ব্যাপক কোনো ধর্মীয় নির্যাতন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই প্রদেশ বরাবরই এই অভিশাপ থেকে মুক্ত থেকে গেছে।

বর্তমান শহরের শেষ সীমা থেকে এক মাইলের কিছু বেশী দূরে ঈদ্গাহ্‌র ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এক কালে এখানে বহু সুরম্য হর্ম্য ছিলো। শহরের

মুসলমানগণ এখানে সমবেত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করতেন। এখন একটিমাত্র দেয়াল খাড়া হয়ে আছে। বিধ্বস্তপ্রায় এই দেয়ালটিতে সূক্ষ্ম ও উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্মের নিদর্শন রয়েছে। মহানগরী ঢাকা এক কালে ঈদ্‌গাহ্‌র অত্যন্ত কাছে ছিলো এবং এখান থেকে শহরটি উভয় দিকে কয়েক মাইল বিস্তৃত ছিলো। কর্মমুখর আদালত, দরবার, বাজার ও সৈন্যশিবিরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিলো এই ঈদ্‌গাহ্‌। রমজানের দীর্ঘ রোজা-ব্রত পালনান্তে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে মহানগরীর প্রতিটি গৃহ থেকে মুসলমানগণ আনন্দময় ঈদ্‌ উৎসব পালনের জন্যে যখন এখানে সমবেত হতেন, তখন নিশ্চয় একটা উদ্দীপনাময় দৃশ্যের অবতারণা হতো। ঈদ্‌গাহ্‌র চারধার জুড়ে শহরের যে অংশটি তখন অবস্থিত ছিলো, এখন আর তার কোনো অস্তিত্ব নেই। অবহেলিত, জনমানবশূন্য ঈদ্‌গাহ্‌ একাকী এক বিরাট প্রান্তরের ওপর দাঁড়িয়ে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর জন্যে বিলাপ করছে যেনো।

শহর থেকে আরও দূরে ঈদগাহ্‌রও পরে আর একটি আকর্ষণীয় স্থান ছিলো। অবশ্য এ-স্থানের স্মৃতি এখন মানুষের মন থেকে প্রায় মুছেই গেছে। সেখানে এক প্রান্তরে ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে একটি কূপ এবং ভগ্ন তোরণ। এক কালে এতদঞ্চলে যে শিখ ধর্মের প্রসার ঘটেছিলো, এ দু'টি তারই একমাত্র দৃশ্যমান নিশানা। শিখ ধর্মের প্রবর্তকের নামানুসারে কূপটি গুরু নানকের কূপ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী একদা গুরু নানক ঢাকায় আগমন করেছিলেন এবং এই কূপের পানি পান করেছিলেন। সেই থেকে এর পানির ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে এবং এটিই সত্য ও সম্ভব বলে মনে হয়। এই কাহিনীতে শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুর সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে ঢাকায় এসেছিলেন এবং এখানে বহু শিষ্য জুটিয়েছিলেন। রেস কোর্সের কাছে শিখদের একটি মন্দির আছে। এখনো শিখগণ এখানে সমবেত হয়ে উপাসনা করে থাকে।

ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে যথাযোগ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও শায়েস্তা খাঁর দীর্ঘ সুবেদারি আমলের পূর্বে এই শহর মসজিদ ও প্রাসাদ-নগরী বলে খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন বিরাট নির্মাতা। তাঁর স্বীয় নগরীর স্থাপত্য-শিল্পে তিনি এমন একটি বিশিষ্ট শৈলীর প্রবর্তন করেন, যা শায়েস্তাখানী পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। তাঁর ঢাকা আগমনের সাথে সাথেই তিনি ছোট কাট্‌রা নির্মাণের কাজে হাত দেন। বড়-কাট্‌রা থেকে মাত্র একশত গজ দূরে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে ছোট-কাট্‌রা অট্টালিকাটি অবস্থিত। এটি অতি মনোহর এবং এর সুসমঞ্জস অঙ্গসৌষ্ঠব এবং সুবিপুল ও সুদৃঢ় দেয়াল-গুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কালের সর্বধ্বংসী আক্রমণ প্রতিহত করে এই অট্টালিকাটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। পরবর্তী কালে এই সুন্দর অট্টালিকা-টিকে অতি অবজ্ঞা ও অবহেলার চোখে দেখা হয় এবং এটি কয়লা ও চুনের গুদামরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর প্রাঙ্গণে এক সময় একটি বৃত্তাকার সমাধি-সৌধের মধ্যে চম্পা বিবির কবর ছিলো। তাঁর নামানুসারে ঐ এলাকার নাম হয়েছিলো চম্পাতলী। এই মহিলা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি হয়তো শায়েস্তা খাঁর অন্যতমা কন্যা ছিলেন। লোকে বলে যে, এই সমাধি-সৌধের দরজায় একটি উৎকীর্ণ ফলক ছিলো। কিন্তু এখন সেরূপ কোনো ফলকের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। চম্পা বিবি সম্পর্কিত রহস্য উদ্‌ঘাটনের কোনো উপায় নেই। সবই চলে গেছে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে, শুধু বেঁচে আছে নাম—এরূপ ব্যাপার ঢাকায় প্রায়শঃই চোখে পড়ে।

ছোট-কাট্‌রার সন্নিকটেই অসংখ্য ছোটখাটো দোকানে ভর্তি চকবাজার। ডান দিকে ঠিক মাঝখানে আছে একটা বিরাট কামান—দোকানগুলো প্রায় ঢেকে ফেলেছে এটিকে। কর্মচঞ্চল কল-মুখরিত এই বাজারের মাঝখানে এটির অবস্থান একটি অদ্ভুত বৈচিত্র্য বটে। এই কামানের প্রকৃত ইতিহাস জানা যায় না। তবে লোকে বলে যে, ইসলাম খাঁ রাজধানীর অন্বেষণে

এখানে আগমনকালে যে দু'টি কামান সাথে এনেছিলেন, এটি তারই একটি। অপর কামানটি নদী-গর্ভে নাকি হারিয়ে গেছে। শহরে দূরাগত কামান গর্জনের মতো যে একটি শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসে, তা নদীগর্ভস্থিত কামান থেকেই আসে বলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা মনে করে। উল্লিখিত গম্ভীর ধ্বনি কোথা থেকে এবং কেনো আসে, আজো তার কোনো হদিস মিলেনি। "বরিশাল গান" বলে পরিচিত এই গম্ভীর ও কম্পিত শব্দ আজো ঢাকায় স্পষ্টভাবে শুনা যায়। এই রহস্য অনুদ্ঘটিত থাকায় স্থানীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা যে নদীগর্ভস্থিত কামানকেই এই শব্দের উৎস বলে মনে করে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যাহোক, এই কারণেই বাজারে অবস্থিত কামানটি লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে পড়েছে। অনেকে বাজার শুরু হওয়ার আগে অর্ঘ্যদান করে। আবার কেউ কেউ দোয়া-দরুদ পাঠ করে যাতে করে তাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

চক থেকে অনতিদূরে শায়েস্তাখানী ঢংয়ে তৈরী তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি সুন্দর মসজিদ আছে। দশ ফুট উঁচু একটা ফাঁপা মঞ্চের ওপর স্থাপিত এই মসজিদটি উন্নত স্থাপত্য-শিল্পের একটি প্রকৃত দৃষ্টান্ত। বড় বড় উৎসবাদিতে আগের দিনে নায়েবে নাজীমগণ এখানে এসে নামাজ পড়তেন। আগেকার দিনের শান-শওকত না থাকলেও চক মসজিদে এখনো নামাজীদের ভিড় জমে। ঈদের সময় মসজিদটি বিশেষভাবে আলোকিত করা হয়। পুরাতন জীবন এবং রুচির কিছুটা যেনো আজো সে ধরে রেখেছে। শায়েস্তা খাঁ যে-সব অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর তাঁর প্রিয়তমা কন্যা পরী বিবির সমাধি-সৌধ। আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহ্জাদা মোহাম্মদ আজীমের সাথে পরী বিবির বিবাহ হয়েছিলো। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দুই বছরের জন্যে শায়েস্তা খাঁ ঢাকা থেকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং এই অন্তর্বর্তীকালের জন্যে মোহাম্মদ আজীম বাংলার নওয়াব নাজীম নিযুক্ত হন। তাঁর সুবেদারি আমলে আজীম এই বিরাট প্রদেশের মর্যাদাযোগ্য একটি দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। পিতার

নামানুসারে আরব্ধ কেল্লাটির নাম রাখেন আওরঙ্গাবাদ। কিন্তু দুর্গটি বরাবরই লালবাগ কেল্লা নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। ঢাকার বহু স্মৃতিই এই কেল্লার সাথে জড়িত হয়ে আছে। বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে এর নির্মাণ কার্যে হাত দেওয়া হলেও কেল্লাটি কখনো পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়নি। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বহু ইমারতই এরূপ অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে। আজীমের সুবেদারির দ্বিতীয় বর্ষে আওরঙ্গজেবের জীবন-বৈরী মারাঠাদের সাথে লড়াই করার জন্যে তাঁর ডাক পড়লো। এই প্রদেশের শাসনভার পরিচালনার জন্যে শায়েস্তা খাঁ আবার ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় রাজধানীতে। ইতিমধ্যে কেল্লার নির্মাণকার্য অনেকদূর অগ্রসর হয়েও তা শায়েস্তা খাঁর সুনজর আকৃষ্ট করতে পারলো না। কারণ, এটি তাঁর কল্পনার সন্তান ছিলো না। পূর্বাধিকারীর পরিকল্পিত কার্যকে রূপায়িত করেছেন বা তাঁদের আরব্ধ ইমারাতগুলোর নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেছেন—মুসলিম শাসকবর্গের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। লালবাগ কেল্লার প্রতি শায়েস্তা খাঁর বিতৃষ্ণার আর একটি কারণ ছিলো। শাহ্‌জাদা আজীম যখন এই কেল্লার নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত, সেই সময় তাঁর পত্নী এবং শায়েস্তা খাঁর পরমাদরের দুহিতা পরী বিবির মৃত্যু হয়। উদ্যমটিকে পণ্ড করে দেওয়ার ব্যাপারে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরবারের পক্ষে এই ঘটনাটি যথেষ্ট কারণ বা অজুহাত। আজীম কর্তৃক আরব্ধ কেল্লাটিতে তিনি একটিমাত্র বস্তু যোজনা করলেন আর বাদবাকী সবই পরিত্যক্ত হলো। কন্যার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে তিনি কেল্লার অভ্যন্তরে পরী বিবির কবরের ওপর এক মহিমামণ্ডিত সৌধ নির্মাণ করলেন। পূর্ব বাংলার মধ্যে এটিকেই সবচেয়ে সুন্দর ইমারত বলে মনে করা হয়। এর ভেতরের প্রকোষ্ঠে একটি কবরে শায়িত রয়েছেন আমীর-উল-উমারা শায়েস্তা খাঁর আদরিণী দুলালী পরী বিবি। মার্বেল ও চুনা পাথরে প্রকোষ্ঠটি তৈরী। চন্দন কাঠের দরজা, সমাধি-সৌধের ওপর সুসমঞ্জস ও নয়ন-জুড়ানো একটি গম্বুজ। আন্তর প্রকোষ্ঠের চারদিকে কয়েকটি নিভৃত কক্ষ। এক কালে এগুলো মোজাইক করা ছিলো। কিন্তু কাল-প্রবাহে ও চুনের প্রলেপ পড়ে

তা ম্লান ও বিনষ্ট হয়ে গেছে। বহুদিনের অবহেলার ফলে এই সৌধের অনেক ক্ষতি হওয়া সত্বেও শায়েস্তা খাঁ-নির্মিত পরী বিবির এই স্মৃতি-সৌধ আজো অতুলনীয়।

কেল্লার যেসব অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে কামানের গুলী চালানোর উপযোগী নদী-মুখো কয়েকটি প্রাচীর, কয়েকটি উচ্চ মৃত্তিকা-মঞ্চ ও বুরুজ এবং দু'টি বিপুলাকার ফটক। ভগ্নমুখী ফটক দু'টিতে ঘাস জন্মে গেছে। মুসলিম স্থপতিদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাতলা চওড়া ইটে-গাঁথা লাল রঙের দেয়ালগুলোর স্থানে স্থানে ভেঙে গেছে। কিন্তু এই জীর্ণাবস্থায়ও চিত্রোপম ফটক দুটোর গরিমা ম্লান হয়নি। এক কালে কেল্লার পাদদেশ দিয়ে নদী বয়ে যেতো। এখন নদী সরে গেছে—যেনো সেও হেলা ভরে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

কেল্লার অভ্যন্তরে পরী বিবির কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে হাম্মাম নামক অট্টালিকাটি। প্রস্তর স্তম্ভ ও গম্বুজবিশিষ্ট এই দ্বিতল গৃহটির সংস্কার সাধন ও আধুনিকীকরণের ফলে এরূপ স্থানের পক্ষে এটি একটি অদ্ভুত ও বেখাপ্পা চেহারা ধারণ করেছে। এর অভ্যন্তরে নীচের তলায় অবস্থিত ছিলো হাম্মাম বা গোসলখানা। এ-থেকেই গোটা ইমারতটি হাম্মাম নাম ধারণ করেছে। উপর তলাটিতে শাহ্‌জাদা মোহাম্মদ আজীম দর্শন দান এবং অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করতেন। এ-গৃহটিও দুর্দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। সম্প্রতি এটি পুলিশ কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্যে নূতন নূতন গৃহ নির্মিত হয়েছে। কেল্লার পরিবেশে এসব গৃহ বেখাপ্পা ও বেঢপ। আরো দূরে পরী বিবির সমাধি-সৌধ পার হলে দেখা যাবে শাহ্‌জাদা আজীম কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদ। এখন এটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত। এই পবিত্র গৃহের বারান্দায় এখন স্বাধীনভাবে গরু-ছাগল ঘোরাফেরা করে। এখান থেকে আর আজান-ধ্বনি শ্রুত হয় না।

লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে শেষ উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটেছিলো ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে। তারপর থেকে সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আর ঘটেনি।

ইতিমধ্যে কেল্লাটির আরো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব এটি আমীর-উল-উমারা শায়েস্তা খাঁকে দান করেছিলেন। শায়েস্তা খাঁর বংশধরগণ আজো এর মালিকানা স্বত্বের অধিকারী। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সরকার বার্ষিক ৬০ টাকা খাজনায় কেল্লাটি তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে চিরস্থায়ী ইজারা লয়। এই খাজনা তাঁরা এখনো ভোগ করছেন। শায়েস্তা খাঁর পরিবারের এক অধঃস্তন পুরুষ বড় কাটরার কাছাকাছি আজো বাস করছেন। একদা গরিমামণ্ডিত ও মহান ঐতিহ্যপূর্ণ শায়েস্তা খাঁর পরিবারের তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি। চারধারে ক্ষয়, ধ্বংস আর বিনাশ; আর তারি মাঝে তিনি এক মর্মস্পর্শী করুণ মূর্তি। বহু পূর্বের অতিক্রান্ত যুগের একটা মূর্তিমান ভগ্নাবশেষ যেনো। তিনি যখন বড় কাট্‌রার জনমানবহীন নিঃশব্দ, পরিত্যক্ত কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়ান, অথবা দীন-হীন বেশে অতি কষ্টে লালবাগ কেল্লার ঐতিহাসিক ভূমি অতিক্রম করেন, তখন লোকের মনে আমীর-উল-উমারা নওয়াব শায়েস্তা খাঁর ছবি ভেসে ওঠে একান্ত দুর্নিবারভাবেই। তখনকার সেই গৌরব ও গরিমামণ্ডিত অবস্থা, আর আজকের চরম দুর্দশার কথা তুলনা করলে মানুষের সকল ঐশ্বর্য, মহিমা, সকল দম্ভ, গর্ব মিথ্যা বলে প্রতিভাত হবে। এই পরিবেশের মধ্যে অতীতের স্মৃতিভারে পীড়িত শায়েস্তা খাঁর এই হতভাগ্য বংশধরের করুণ চেহারাটি ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। বর্তমান শহরের প্রায় দু'মাইল দূরে শায়েস্তা খাঁর আর একটি কীর্তি বিদ্যমান রয়েছে। সৌন্দর্য ও মনোহারিত্বের দিক দিয়ে এটি পরী বিবির সমাধি-সৌধের প্রায় সমকক্ষ। এটি হচ্ছে সাত গম্বুজ মসজিদ। সাতটি গম্বুজ থাকায় এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। প্রথমের দিকে এই মসজিদ বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত ছিলো। কিন্তু চঞ্চল-গতি নদী এখন দূরে সরে গেছে এবং মস্‌জিদের কিনার থেকে বর্তমান নদী পর্যন্ত স্থল এক মাইলেরও অধিক স্থান জুড়ে একটি চাষবাদযোগ্য নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সাতটি সুসমঞ্জস ও সুসঙ্গত গম্বুজ মাথায় নিয়ে একটা ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে জনহীন মাঠের ওপর—নীচে

জলাভূমি আর তারপর নদী। মসজিদের সাতটি গম্বুজের মধ্যে তিনটি বড় গম্বুজ মধ্যস্থলে অবস্থিত আর অবশিষ্ট চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ চার-কোণে অবস্থিত। পাশ ঘেঁষে ওপরে উঠে গেছে একটা চমৎকার তাল গাছ। এটি যেনো শিল্পীর হাতের তুলির শেষ পোঁচের মতো লেগে আছে ইমারতটির গায়ে। মসজিদের দরজায় এক কালে একটি উৎকীর্ণ লিপি ছিলো। এখন আর তার কোনো চিহ্ন নেই। তবে মোটামুটি ইমারতটি এখনো ভালো অবস্থায় আছে। শহর ও নদী একে ছেড়ে চলে গেলেও নামাজীরা একে ছাড়েনি। শায়েস্তা খাঁর আমলে এখান থেকে যেমন সুমধুর আজান ধ্বনিত হয়ে উঠতো, আজো তেমনি হয়।

আমীর-উল-উমারা ইট-পাথরের মধ্যে তাঁর শাসনকালের অনেক স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ সুবেদারী আমলে তিনি কোন্ প্রাসাদে বাস করতেন বা কোথায় দরবার বসাতেন, তার নির্দেশ দেওয়ার মতো কোন নির্দশন রেখে যাননি। লালবাগ কেল্লা নির্মাণ শুরু হওয়ার বারো বছর পূর্বে ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে ট্যাভারনিয়ার যখন ঢাকায় আগমন করেছিলেন, সম্ভবতঃ সে সময় শায়েস্তা খাঁ কাটরা পাকাবতলী নামে পরিচিত প্রাসাদে বাস করতেন। বাবুবাজার মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে এক কালে এই প্রাসাদ অবস্থিত ছিলো। বর্তমানে এখানে মেডিক্যাল স্কুল ও জেনানা হাসপাতাল অবস্থিত। ট্যাভারনিয়ার-বর্ণিত এই প্রাসাদটিতে এমন কোনো চাকচিক্য ছিল না। বর্তমানে এর কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। কিন্তু এর নিকটস্থ বাবুবাজার ঘাট এখনো আছে। সেখানে নহবত-খানার ভিত্তি, একটি মসজিদ এবং সাদাসিদে একটি ক্ষুদ্র দালান পরিদৃষ্ট হয়। এখানে অবস্থিত উৎকীর্ণ লিপি ফরাসী গদ্যে লিখিত এবং তা শায়েস্তা খাঁর স্বীয় রচনা বলে মনে হয়। শায়েস্তা খাঁর সুবেদারির প্রথম আমলে এই ইমারত তৈরী হয়েছিলো বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের ফলে এটির এতো ক্ষতি হয়েছিলো যে, সন তারিখ সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। মসজিদের উত্তরে শায়েস্তা খাঁর অপর এক কন্যা শাহজাদী

খানমের সমাধি অবস্থিত ছিলো। ইনি লাডুবিবি নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু জেনানা হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও সংস্কার করতে গিয়ে এটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে এদেশ শাসন করার পর সুবেদার শায়েস্তা খাঁ এখান থেকে বিদায় নিলেন আর ঢাকার চূড়ান্ত সমৃদ্ধির দিনও শেষ হয়ে এলো। তাঁর চলে যাওয়ার পর থেকে আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা ঢাকায় নির্মিত হয়নি। ক্রমে ক্রমে সে অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়লো দীর্ঘ নিদ্রার কোলে। ঢাকা রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত অতঃপর যে-সব উল্লেখ-যোগ্য ইমারত তৈরী করা হয়েছিলো, খান মীরদার মসজিদ তাদের অন্যতম। মসজিদের ফলকের বর্ণনা অনুযায়ী মুর্শিদ কুলী খাঁর সুবেদারি আমলে আইনের রক্ষক প্রধান কাজীর নির্দেশে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো। মসজিদটি এখন দুর্দশাপ্রাপ্ত। এর নীচতলা মিউনিসিপ্যালিটির বলদের আস্তাবলরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ভাড়া থেকে মুয়াজ্জিনের বেতন এবং মসজিদের বাতির ব্যবস্থা হয়ে থাকে। লালবাগ কেল্লার দক্ষিণ প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত লালবাগ মজজিদটি নিয়মিত সংস্কারের ফলে বেশ ভালো আছে। এই বিরাট ও মজবুত মসজিদে একসাথে দেড় হাজার লোক নামাজ পড়তে পারে। এর মধ্যে শায়েস্তাখানী স্থপতি-কুশলতার কোনো নিদর্শন নেই। ফর্‌রুখশিয়ারের সুবেদারি আমলে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো। ইনি পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ঢাকায় মুসলিম রাজনৈতিক নাট্যের শেষ দৃশ্যগুলো অভিনীত হয়েছিলো নিমতলী কুঠিতে। কোম্পানী প্রদেশের দেওয়ানী শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কেল্লাস্থ প্রাসাদ থেকে নায়েবে নাজীমকে পরিবারসহ বিতাড়িত করা হলো। বড়ো কাট্‌রায় স্বল্পকাল অবস্থানের পর নওয়াব জেসারত খাঁ নিমতলী কুঠিতে উঠে যান। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে তাঁর বংশধরগণ বাস করেন। শেষ নায়েবে নাজীম অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই মুসলিম সার্বভৌমত্বের শেষ এবং নামমাত্র চিহ্নটুকু

বিলীন হয়ে গেলো। শতাব্দীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাল ধরে হৃতগৌরব নায়েবে নাজীমগণ নিমতলী কুঠিতে বাস করেন। অতঃপর তাঁদের ব্যবহৃত প্রাসাদ নিলামে বিক্রয় করা হয় এবং বহু অট্টালিকা ভেঙে ফেলা হয়। বারদারী নামে একটি সুন্দর এবং বিরাট কক্ষ এখনো টিকে আছে। এখানে শেষ নায়েবে নাজীমগণ তাঁদের দরবার বসাতেন। সেই প্রহসন দরবার, প্রাচীন শান-শওকত প্রদর্শনের নিষ্ফল প্রয়াস, বিগত মহিমার নিরর্থক কণ্ডুয়ন এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ও রীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকার সে কি করুণ প্রয়াস!

আজকের ঢাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর। ঢাকার বনেদী নওয়াবদের সাথে এঁর বংশগত কোনো সম্পর্ক নেই। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দেই ঐ বংশ শেষ হয়ে যায়। নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র পিতামহ খাজা আবদুল গনির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও প্রশংসনীয় কার্যের জন্যে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ সরকার তাঁকে নওয়াব খেতাবে ভূষিত করে। এই পরিবারের ধন-সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের কাহিনী অতীব চমকপ্রদ। পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ খাজা আবদুল হাকিম কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেশের আরো বহুজনের মতো তিনি ভাগ্যান্বেষণের জন্যে দিল্লীর বাদশাহী দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর ভাগ্য প্রসন্ন হলো। কিন্তু অচিরেই মোগল শক্তির চূড়ান্ত পতন ঘটলো। বাংলা-দেশের ধন-সম্পদের খ্যাতি তাঁকে এই প্রদেশে আগমনে প্রলুব্ধ করে তুললো। সিলেটে তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অচিরেই তিনি ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করলেন। কাশ্মীর থেকে পিতা ও ভাইদের এখানে নিয়ে এলেন ও জন্মভূমির সাথে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ ঢাকায় বসতি স্থাপন করলেন এবং ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা ও মোমেনশাহীতে প্রভূত জোত সম্পত্তি ক্রয় করলেন। তবে পরিবারটিকে সমৃদ্ধির চূড়ান্ত শিখরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন নওয়াব আবদুল গনি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি সমগ্র পূর্ব বাংলার সবচেয়ে ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী জমিদার। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি পরম আনুগত্যের

সাথে তাঁর সকল শক্তি ও সম্পদ বৃটিশ সরকারের সাহায্যে নিয়োগ করেন এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে থেকে বিক্ষোভ প্রশমিত করার ব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন উদার হৃদয় এবং সংস্কৃতিমনা। দুস্থদের দুর্দশা মোচনে এবং সৎ কার্যে দানের ব্যাপারে তিনি তাঁর ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর অনেকগুলো দান রাজসিক আকারের। তাঁরি দানে ঢাকার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কাজে তিনি আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ঢাকার পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে খাজা আবদুল গনিকে নওয়াব খেতাবে ভূষিত করা হয় এবং ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এই খেতাব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য ব'লে ঘোষণা করা হয়। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। পরিপূর্ণ যশ, খ্যাতি ও সম্মান নিয়ে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র খাজা আহ্‌সানউল্লাহ্ পিতার বিপুল সম্পত্তি ও জমিদারির তত্ত্বাবধান করতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। পিতার আনুগত্য ও বদান্যতার গৌরবময় ঐতিহ্য তিনি যোগ্যতার সাথেই বহন করেছিলেন। ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা তাঁরই দানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি ঢাকার প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে নওয়াব, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে নওয়াব বাহাদুর এবং ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কে. সি. আই. ই. খেতাব দান করা হয়। পিতার মৃত্যুর পর সাত বছর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। নূতন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সাহায্য বৃটিশ সরকারের সপ্রশংস স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং চলতি সালের প্রথমের দিকে তাঁকে সি. এস. আই. খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের তিনি নেতা। নূতন প্রদেশে তাঁর প্রভাব ও মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে।

এই শহরটি বাংলার রাজধানী থাকাকালে ঢাকায় ইউরোপীয়দের যেসব কুঠি গড়ে উঠেছিলো, সেগুলোর একটি বাদে সবগুলোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁর আমলে পূর্ব বাংলার একটি আড়ত হিসাবে ইংরেজদের প্রথম কুঠিটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে যেখানে ঢাকা কলেজ, সেই স্থানে এটি পূর্ব বাংলার ইংরেজদের বাণিজ্য স্বার্থের প্রধান কেন্দ্ররূপে একশ' বছর ধরে অবস্থিত ছিলো। বর্তমান নওয়াব-প্রাসাদ যেখানে অবস্থিত, কয়েক বছর পর সেখানে ফরাসীদের কুঠি স্থাপিত হয়। অন্যান্য কুঠির সাথে ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একশ' বছর পর্যন্ত এই কুঠি টিকে ছিলো। অবশেষে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধকালে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে এটি ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হয়। বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতাল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই ছিলো ওলন্দাজদের কুঠি। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এটির অস্তিত্ব ছিলো। পর পর এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন জাতির এইসব কুঠির মধ্যে একমাত্র পর্তুগীজদের সদর দফতররূপে ব্যবহৃত একটি গৃহের কিয়দংশ বর্তমান আছে। সেকালে এটি একটি সুন্দর ও সুবৃহৎ গৃহ ছিলো বলে মনে হয়। কিন্তু এই শহরের অন্যান্য প্রাচীন জিনিসের মতো এটিও ধ্বংসমুখী হয়েছে।

শহরের কোলাহলমুখরতা ও কর্মচাঞ্চল্য থেকে একটু দূরে অবস্থিত ইংরেজদের সুন্দর গোরস্তানটি বহু স্মৃতিভারে পীড়িত। পাশ্চাত্যের গোরস্তান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনে এটি তৈরী। এটি যেনো একটি বিদেশী মূর্তির মতো করুণ ও কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে শহরের এক পাশে। মুর স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে এর প্রবেশপথ নির্মিত। বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ও তৃণের আচ্ছাদন আর সূক্ষ্মাগ্র চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলোর শ্যাওলা সমাধিটির ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে। কতকগুলো কবরে সমাধি-সৌধ স্থাপিত। কতকগুলো সাধারণভাবে বাঁধানো আবার কতকগুলো মাটি দিয়ে তৈরী। সারিবদ্ধ কবরের মধ্যস্থিত সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলার সময় যে-কোনো ব্যক্তি অতীতের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবে—ইংরেজদের সেইসব অগ্রদূতের কথা মনে পড়বে—যাদের জন্যে মৃত্যু সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকতো এবং যাদেরকে পরিবারের কাউকে না কাউকে হারিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হতো। ইংরেজদের শিশু ও সদ্যাগত যুবক-যুবতীদের ওপরই যেন মৃত্যুর আক্রোশ বেশি ছিলো।

এইসব নীরব প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কতো আশা, কত আকাঙক্ষার সমাধি ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখানে সমাহিত হয়ে রয়েছে জেম্স রেনেল ও জেন থ্যাকারের শিশু সন্তান। শোক-বিহ্বলা জননী পুত্রের কবরের একটি রৌপ্য নির্মিত মডেল স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটি এখনো ঐ পরিবারের সম্পদরূপে রক্ষিত আছে। প্রাচীনতম একটি সমাধিফলকের নীচে শায়িত আছেন বাংলাদেশস্থ ইংরেজদের পুরোহিত রেভারেণ্ড জোসেফ প্যাগেট। ঢাকা সফরকালে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মার্চ মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ভারত আগমনের দু'বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর ফলে বাংলায় ২ বছর ৬ মাস পর্যন্ত কোনো পুরোহিত ছিলো না। এর অদূরে টমাস টীক ও নিকোলাস ক্লেরেম্বল্টের সমাধিস্তম্ভ। এঁরা কোম্পানীর ঢাকাস্থ কুঠির প্রধান কুঠিয়াল ছিলেন। টমাস টীক ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মাত্র ৩২ বছর বয়সে এবং দ্বিতীয়োক্ত জন ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রাণত্যাগ করেন। এসব নামের পাশে রয়েছে একটি অদ্ভুত নামের স্মৃতিফলক— উনসি কুয়ান। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বন্ধু ওনা চৌ কর্তৃক এটি নির্মিত হয়েছিলো। এরা দু'জনেই ছিলেন চীনা খ্রীস্টান। এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর একটি সমাধি রয়েছে। সব ক'টি সমাধি-সৌধের মধ্যে এটি সুন্দর অথচ এতে কোনো স্মৃতিফলক নেই। এটি গথিক রীতিতে তৈরী একটি অষ্টভুজ সুউচ্চ ইমারত এবং শিরোপরি একটি গম্বুজ। সমাধি ক্ষেত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এই সমাধি-সৌধটির মধ্যে যিনি ঘুমিয়ে আছেন তাঁর কোনো নাম নেই, পরিচয় নেই। জনশ্রুতি বলে যে, এটি 'কোম্পানীর আমলা কলম্বো সাহেবের' কবর, কিন্তু বহু অনুসন্ধান চালিয়েও কোম্পানীর নথি-পত্রে এরূপ কোনো নামের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুলাই বিশপ হেবার সমাধিটিকে পবিত্রীকৃত করেন। তখনকার আমলাদের কাছ থেকেও তিনি এর হদিস পাননি। নীরব, সুন্দর ও সুউচ্চ এই সমাধি-সৌধ সযত্নে ঢেকে রেখেছে এর রহস্য।

একাদশ অধ্যায়

চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী

'চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে যে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করবে, সে সর্বশক্তিমান ব্রহ্মার পদতলে আশ্রয় ও ক্ষমা লাভ করবে'

পবিত্র ঘাটের পদতল বিধৌত করে যেমন ধারায় নদী বয়ে চলে, তেমনি অবিরাম অবিশ্রান্ত ধারায় পবিত্র স্থানে সমবেত হতে থাকে পুণ্যার্থীদের দল। সারাদিন ধরে পিপীলিকার সারির মতো সঙ্কীর্ণ মেঠো পথ ধরে নানাদিক থেকে তীর্থযাত্রীরা ত্রস্তপদে এগিয়ে চলে তাদের লক্ষ্যপথে। তাদের কাছে এটি সারা বছরের সব চেয়ে বড় পর্ব। 'হে সত্যান্বেষী, এ তথ্য জ্ঞাত হও। চৈত্রের শুক্লাষ্টমীতে জগতের সকল পবিত্র স্থানের পুণ্য ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়।' বহু আশা বহু প্রত্যাশার দিন এটি। 'নদীর জল স্পর্শমাত্রই সকলের পাপ মোচন হয়ে যায়। যে এই পবিত্র জলে স্নান করে, সে চিরমোক্ষ লাভ করে—একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভগবানের প্রতিশ্রুত মোক্ষলাভের একাগ্রতা নিয়ে তীর্থযাত্রীদের স্রোত ক্রমাগত এগিয়ে চলে।

সে এক অদ্ভুত জনসমুদ্র, বহু দূর পথের ক্লান্তির শেষে পবিত্র নদীতে এসে পৌঁছেছে। পাপ স্খলনের এই উৎসবে পূর্ব বাংলার সকল অঞ্চল থেকে ট্রেন ও স্টীমারযোগে এবং পদব্রজে হাজার হাজার মানুষ এখানে এসে সমবেত হয়। তাদের কাছে এটি নিছক আনন্দোৎসব নয়—নিছক আনুষ্ঠানিক পূজা নয়—যা সাধারণতঃ পবিত্র স্থানগুলোর উৎসবের দিনে বেচা-কেনা আর কোলাহলের মধ্যে ডুবে যায়। যে মেলায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে সেখানে বেচা-কেনা ও মেলার আনুষঙ্গিক ধুমধাম হবেই। কিন্তু আগত তীর্থযাত্রীদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে তাদের প্রাণের

ব্যাকুলতা—পাপ ধৌত করে ফেলার ঐকান্তিক আগ্রহ। নত মস্তকে তারা দ্রুত ধাবিত হয় অভীপ্সিত পথে। কোনো দিকে মন নেই, পথের বিপত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। নীরবে শুধু এগিয়ে চলে ভগবানের ধ্যান করতে করতে। মনে তাদের অপূর্ব বিস্ময়—আগামীকালই তাদের সিদ্ধিলাভ—মোক্ষলাভ হবে। পবিত্র স্থানের নিকটবর্তী হলে তাদের আঘাত করে এক বিপুল উল্লাসের ঢেউ। মুহুর্মুহু ধ্বনিত হয়ে ওঠে গগনবিদারী বিলাপ ধ্বনি—যে কোনো অরণ্যচারী জীবের আর্ত্তনাদে ঝরে পড়ে রহস্য আর বিস্ময় আর আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায় পৃথিবী।

এই সব তীর্থযাত্রী এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত—প্রতিদলে বার থেকে বিশ জন। এক একটি দলে কতকগুলো স্ত্রীলোক আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একজন মাত্র পুরুষ। বহু দূর-দূরান্ত থেকে এমনি করে দল বেঁধে তারা আসে—সবাই স্ত্রীলোক। গ্রামের একজন মুরুব্বীকে সাথে নিয়ে আসে। পুরুষেরা বাড়ী থাকে। যে-সমাজে স্ত্রীলোকদের ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য, সে-সমাজের পক্ষে এরূপ ব্যাপার একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বটে। এই বিপুল সমারোহে যুবকেরা অনুপস্থিত। অতি বৃদ্ধ, দুর্বল, লোলচর্ম ও বয়সের ভারে বেঁকে গেছে—এরূপ বৃদ্ধদেরই সমাবেশ এখানে। কিন্তু অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও বিছানার একটি পুঁটলী সম্বল করে এরা স্নান উৎসবে আসে। এই সব ভীতু ও দুর্বল লোকের কাছে এটি একটি বিরাট অভিযান। তাদের কেউ জানে না, এই বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী পরের রাত কিভাবে এবং কোথায় কাটাবে। অবশ্য সেখানে বাঁশের তৈরী ছোটো ছোটো কতকগুলো ঘর তোলা হয়। কিন্তু সেগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানদের জন্যে। কারণ, এগুলো টাকা দিয়ে ভাড়া নিতে হয়। অষ্টমী স্নান ধনাঢ্যদের উৎসব নয়। জমিদার, কুসীদজীবী এবং অবস্থাপন্ন বাবুরা সেখানে যান বটে; কিন্তু লাখো লাখো দীন-দরিদ্রদের মধ্যে এঁরা হারিয়ে যান। একটি মাত্র সাদা কাপড় তীর্থযাত্রীণীদের পরিচ্ছদ। কোনো কোনো অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক লাল পেড়ে শাড়ী পরে আসে। সাদার ওপর এই লাল পাড় চমৎকার

মানায়। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে আগতা অধিকাংশ স্ত্রীলোকের কাছ থেকে জীবনের সকল আনন্দ, সকল অহঙ্কার বিদায় নিয়েছে। যৌবনের দিনগুলো ঝরে গেছে—হয়ত বা বিধবা হয়েছে। নিজেদের সংসারে আর তাদের কোনো স্থান নেই—কোনো ক্ষমতা নেই। তাই ভগবানের প্রতিশ্রুত মুক্তি ও নির্বাণ লাভের জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব।

যাহোক, হঠাৎ একটা ঝড় আসে। তীর্থযাত্রীরা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। জনবহুল স্থানটি নীরব হয়ে পড়ে। প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামে। ধানক্ষেতে পানি জমে যায়। এই কিছুক্ষণ আগে যেসব শুষ্ক রাস্তায় তীর্থযাত্রীরা চলাফেরা করেছিলো, মুহূর্তেই তা পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত হয়ে উঠলো। সে এক অস্বাভাবিক দৃশ্য। জীবন যেনো স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অকস্মাৎ আবার সব জেগে ওঠে। কারণ, ঝড়-বৃষ্টি থেমে যায়। আবার রোদ ওঠে। শ্বেতাম্বরীর দল কোথা থেকে আবার দলে দলে বেরিয়ে আসে। তাদের ভিজা কাপড় রোদে শুকোতে দেয়। তারপর আবার শুরু হয় তীর্থযাত্রীদের অবিরাম আনাগোনা। সূর্য অস্তমিত হয়, তবুও সেই অফুরন্ত জনমিছিলের গতি শুদ্ধ হয় না। চন্দ্রালোকিত রাতেও জোয়ারের মতো মানুষ উথলে ওঠে।

সারারাত ধরে নদীতীরে স্ফূর্ত হতে থাকে প্রত্যাশার এবং বিপুল স্পন্দন। লাখো লাখো মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত শব্দ-কোলাহল দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মতো মনে হয়। রাতের স্তব্ধতা আর একঘেঁয়েমি ভেঙে দিয়ে অবিরাম বয়ে চলে সে কোলাহল-লহরী। রাতের কালো পটভূমির ওপর ফুটে উঠতে থাকে লক্ষ লক্ষ চেরাগের আলো এগুলোর স্বল্পালোকে তীরে বাঁধা মানুষ ভর্তি নৌকাগুলোর উপবিভাগ রেখার মত দৃষ্ট হয়। প্রদীপের শিখা কাঁপতে থাকে। ফুটে ওঠে প্রেতচ্ছায়ার মতো মানুষের বিকৃত মুখ। দিনের উন্মত্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেলেও জয়ঢাকের বাদ্যে প্রকৃতি স্পন্দিত হতে থাকে। রাত শেষ হয়ে যায়; ঊষার আবির্ভাব সূচিত হয়। একে একে প্রদীপগুলো নিবে যেতে থাকে বিশাল ব্রহ্মপুত্র, ভগবান ব্রহ্মপুত্র অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলে আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে সর্বপাপহারী মহাশক্তি।

লাঙ্গলবন্দ স্নান উৎসবের উদ্ভব-সূত্রটি রহস্যাবৃত। এই মহাপবিত্র উৎসবে যোগদানকারী পুণ্যার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারাও এর কোনো হদিস দিতে পারবে না। তারা এইটুকু মাত্র জানে যে, এটি মহাপবিত্র তীর্থস্নান। এর বেশি তারা কিছুই জানে না। জানতেও চায় না। যুগ-যুগান্তর ধরে তারা কোনো প্রশ্ন না করে পরম নিষ্ঠাভরে বিশ্বাস করে এসেছে। এর মাহাত্ম্যের কারণ ও প্রমাণ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। এখানে সেখানে শুধু গ্রামের বৃদ্ধ মাতব্বরদের কাছ থেকে নানা প্রকার অলৌকিক কাহিনী শুনতে পাওয়া যাবে। বহু দূর অতীতে জমদাগ্নি নামে এক মহামুনি বাস করতেন। রেণুকা নামে তাঁর এক পরমা সুন্দরী এবং রাজ বংশোদ্ভূতা পত্নী ছিলেন। তাঁদের পাঁচ পুত্র। পরশুরাম ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম। নানা প্রকার পুরুষোচিত ক্রীড়া ও অস্ত্র চালনায় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রিয় অস্ত্র ছিলো কুঠার। পুত্রদের প্রতি স্নেহ ও স্বামীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট ভক্তি ছিলো। তথাপি তিনি রাজপ্রাসাদের আনন্দ, বিলাসময় জীবনের কথা ভুলতে পারেননি। সেই জীবনের কথা স্মরণ করে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতেন। মুনিবর বনে তপস্যা করতেন। আর তাঁর পত্নী ঘরে বসে পিতার রাজগৃহের কথা স্মরণ করে অনুশোচনা করতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে সে দেশের রাজা মুনির কুটিরের পাশ দিয়ে লোক-লস্কর নিয়ে মহাসমারোহের সাথে কোথায় যাচ্ছিলেন। এই দৃশ্য রেণুকাকে তাঁর আনন্দময় অতীত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। ঠিক এই অবস্থায় স্বামী জমদাগ্নি এসে হাজির। রেণুকার কান্নার কারণ তিনি বুঝতে পারলেন। পাঁচটি পুত্রের জননী এবং মুনির পত্নীর মন এরূপ নশ্বর পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন থাকতে দেখে তিনি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রাগকম্পিত স্বরে তিনি পুত্রদের নির্দেশ দিলেন তাঁদের জননীকে হত্যা করার জন্যে। কিন্তু সবাই এই নির্দেশ শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তাঁরা কেউ সম্মত হলেন না মাকে হত্যা করতে। জমদাগ্নি তখন তাঁর প্রিয় পুত্র পরশুরামের কাছে এলেন।

পরশুরাম বিনাদ্বিধায় পিতৃ-আদেশ পালন করলেন এবং কুঠার দিয়ে মাতার শিরশ্ছেদ করলেন। সাথে সাথেই তাঁকে একটি ভয়ঙ্কর শাস্তি গ্রহণ করতে হলো। যে কুঠার দিয়ে তিনি মাতৃহত্যার মতো ভয়াবহ পাপ করে বসলেন তা তাঁর হাতে আটকে রইল। প্রাণপণ চেষ্টায়ও তা হাত থেকে খসানো সম্ভব হলো না। অবশেষে তিনি সকল আশা ছেড়ে দিলেন। গভীর দুঃখ ও অনুশোচনায় তিনি নিমজ্জিত হলেন এবং ধ্যান ও তপস্যায় দিন কাটাতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্যের কথা শুনতে পেলেন। হিমালয় পর্বতে একটি হ্রদরূপে এটি লুকিয়ে ছিলো। আশায় বুক বেঁধে পরশুরাম সেই পবিত্র জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন—যে-জলে তিনি পাপ ধুয়ে ফেলে মুক্ত হয়ে উঠতে পারবেন। তিনি বহু বছর ধরে হিমালয়ের জনহীন বন্ধুর পথে নিষ্ফলভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে দেবতারা তাঁকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলেন। অবশেষে এক শুভ প্রাতে কুজ্ঝটিকা অপসৃত হলো। দেখতে পেলেন নিম্নদেশে প্রসারিত এক হ্রদ, তার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে প্রভাতী সূর্যের অপরূপ স্বর্ণাভ কিরণসম্পাত। পরশুরাম আনন্দে অধীর। দু'হাত তুলে তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন, 'হে হ্রদরূপী দেবতা, তোমার পবিত্র জল মরজগতের কোনো জীবের পাদস্পৃষ্ট হয়নি। তোমার সকল অলৌকিক শক্তি মিলিত হয়ে আমার সকল পাপ-গ্লানি ধুয়ে দিক এবং আমার প্রায়শ্চিত্তের অবসান হোক।' এই বলেই তিনি ঝাঁপ দিলেন ব্রহ্মপুত্রের জলে; আর সাথে সাথেই স্খলিত হয়ে গেলো কুঠারখানা। তাঁর পাপের স্খালন হলো বলে তিনি বুঝতে পারলেন। মহাগুণসম্পন্ন সর্বপাপহর এই জল মর্ত্যের মানুষের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার অভিপ্রায়ে পরশুরাম কুঠারখানা লাঙ্গলে সংলগ্ন (লাঙ্গলবদ্ধ) করলেন এবং পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দিলেন সেটি—যাতে করে লাঙ্গলের ফলকে তৈরী পথ ধরে ব্রহ্মপুত্র সমভূমিতে প্রবাহিত হতে পারে। বহুদিনের শ্রম ও কর্ষণের পর তিনি বর্তমান লাঙ্গলবন্দে এসে পৌঁছুলেন। এখানে এসে লাঙ্গল আটকে গেলো। পরশুরাম

বুঝতে পারলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। অতঃপর তিনি এই নদীর মাহাত্ম্য প্রচারে ও তীর্থযাত্রায় বহির্গত হলেন—তাঁর সঙ্কল্প ছিলো পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম নদরূপে ব্রহ্মপুত্রের মর্যাদা উন্নতী করা। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মপুত্র এসে থেমে গেলো, তার কাছাকাছি দিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো পূর্ব বাংলার সুন্দরতম নদী শীতলক্ষ্যা—যৌবন-গর্বিতা চঞ্চলা শীতলক্ষ্যা সুন্দরী। বিশাল শক্তিশালী ও পবিত্র ব্রহ্মপুত্রের কানে তার রূপ-যৌবনের কথা পৌঁছেছিলো। দেবতা ব্রহ্মপুত্র তাই শীতলক্ষ্যা সুন্দরীকে দেখার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলো। স্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে দু'কূল ভেঙে বিজয়োল্লাসে সে ধাবিত হলো সুন্দরীর দিকে। বিশাল বপু ও প্রচণ্ড শক্তিশালী ব্রহ্মপু ত্রয় ভীমদর্শন চেহারা দেখে শীতলক্ষ্যা ভীতা হয়ে পড়লো। সে ত'র সমস্ত সৌন্দর্য লুকিয়ে ফেলে এক বৃদ্ধার রূপ গ্রহণ করলো এবং নিজেকে বুড়ি-গঙ্গারূপে উপস্থাপিত করলো। ব্রহ্মপুত্র ত'কে দেখে আশাহত হয়ে পড়লো এবং চীৎকার দিয়ে উঠলো, 'হে বৃদ্ধা নারী, কোথায় সেই উদ্‌ভিন্ন-যৌবনা, সুন্দরী লক্ষ্যা?' অবগুণ্ঠনবতী লক্ষ্যা মুখ চেপে জওয়াব দিলো, 'আমিই সেই লক্ষ্যা।' ব্রহ্মপুত্র দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে অবগুণ্ঠনটি টে ন ছিঁড়ে ফেলে দিলো। ব্রহ্মপুত্র অপরূপ সুন্দরী লক্ষ্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। এখানেই তাদের সঙ্গম হলো। দু'জনের জলের মিলন ঘটলো। একই সাথে তারা প্রবাহিত হতে থাকলো। পরশুরাম তীর্থ থেকে ফিরে এসে দেখলেন যে, যাকে তিনি এতো ভালোবেসেছিলেন এবং মর্ত্যধামে আনয়ন করেছিলেন, সে শীতলক্ষ্যার সাথে মিলিত হয়েছে। তাঁর রোষানল প্রদীপ্ত হলো এবং তিনি উভয়কেই অভিশাপ দিলেন। ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের যে উপকার করেছিলো, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইলো। পরশুরামের মনে দয়া উদয় হলো। তিনি বললেন, 'হে ব্রহ্মপুত্র, আমি তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম নদরূপে পরিগণিত করতে চেয়েছিলাম—যাতে করে যেসব লোক তোমার জলে অবগাহন করতে আসে, প্রতিদিন তুমি তোমার সর্বপাপহর শক্তিবলে তাদের পাপস্খালন করতে পারো। এখন থেকে তুমি আর তা

পারবে না। বছরের একটি মাত্র দিনই তুমি পবিত্র থাকবে। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতেই তোমার মধ্যে থাকবে অলৌকিক শক্তি।'

তাই, উদয়-আকাশে নির্দিষ্ট দিনের প্রভাত সূচিত হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত বেলা জুড়ে একটা অদ্ভুত শিহরণ ও রহস্যময়তা অনুভূত হয়। সারা-দিনের শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে শেষ রাতের দিকে তীর্থযাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সামান্য কয়েকজন আসন্ন লগ্নের জন্য উৎকর্ণ ও অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো অথবা ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক অদ্ভুত সব গল্পকাহিনী নিয়ে মশগুল ছিলো। কিন্তু উষার সূচনার সাথে সাথেই সাড়া জাগে।

ধীরে ধীরে নদীর ওপার থেকে সূর্য মাথা তুলে দাঁড়ায়। সূর্যের রং যেনো আজ অন্য দিনের চেয়ে চড়া। কড়া রঙের পোশাক পরে বিজয়ীর বেশে তার আবির্ভাব হয়েছে যেনো। উদয়-তোরণ দিয়ে সূর্যদেব যখন তার সোনার রথে চড়ে আসে, স্বাগত জানায় তীর্থযাত্রীরা তার আবির্ভাবকে।

পবিত্র ঘাটের অপর পাড়েও জীবনের স্ফূর্তি। অবিস্মরণীয় সে দৃশ্য। মাইলকে মাইল জুড়ে পাড় ঘেঁষে অসংখ্য মানুষের ভিড়—চঞ্চলা স্রোতের মতো বয়ে চলে সে জনস্রোত, জোয়ার-ভাটার মতো তা বাড়ে কমে। জনারণ্যে ঘাটের সিঁড়ি দেখা যায় না। পবিত্রকরণের জোয়ারের আঘাতে নদী চঞ্চল হয়ে ওঠে আর একটি প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো তীর্থযাত্রীরা ভেঙে পড়ে নদীতে। অনেকের হাতে পূজার ছোটখাটো নৈবেদ্য—বিভিন্ন ধরনের ফুল, কলা, অথবা পূজার অর্ঘ্যোপযোগী কোনো পাতা। এরা গরীব, যা কিছু পথের সম্বল ছিলো, পথেই তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাই মূল্যবান কিছু দেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। অনেক প্রার্থনা, অনেক শাস্ত্রমন্ত্র পাঠের পর সে-সব অর্ঘ্য নদীতে ফেলে দেয়। বারে বারে তারা নদীতে ডুব দিতে থাকে, যাতে শরীরের কোনো অংশই অপরিশুদ্ধ না থাকে। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এক বুক জলে নেমে যুক্তকরে বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। প্রতিটি মানুষই স্ব স্ব আকুতি ও প্রার্থনা নিবেদন করে একান্ত নিবিষ্ট মনে। পার্শ্ববর্তী ভিড়ের দিকে অথবা বাহ্য বস্তুর

প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই—সে দৃষ্টি প্রসারিত হয় দূর অতীতে, নয়তো ভবিষ্যতের দিকে। 'ওম ব্রহ্মপুত্র!' বলে ভক্তগণ মাঝে মাঝে যুক্ত করে প্রণাম জানায় মহাশক্তিশালী ব্রহ্মপুত্র নদকে।

নদীতীরবর্তী লক্ষ লক্ষ মানুষের কলরব দূরাগত সমুদ্র-গর্জনের মতোই শোনায়। ভক্তদের সেই বিরাট ভিড় ঠেলে একদল আসছে আর একদল যাচ্ছে ঘাট থেকে ঘাটান্তরে। অদ্ভুত তাদের চীৎকার। পরিপূর্ণভাবে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তারা প্রতিটি ঘাটই দর্শন করে। এই সব তীর্থযাত্রীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পূর্ণভাবে আত্মসচেতন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব লক্ষ্য নিয়ে এসেছে। এর বাইরে আর কোনো দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। হয়তো চার-পুরুষের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি পরিবার বুক-জলে নেমে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করছে। এদের লক্ষ পরিবারটির সর্বপাপ প্রক্ষালন করা। এরা পূজার্চনা করে, মন্ত্র পাঠ করে এবং পাপ প্রক্ষালন করে নিজেদের জন্যে। অন্যের দিকে, ডাইনে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে—কোনোদিকেই তাদের দৃষ্টি নেই।

এমনিভাবে সারাটি সকাল ধরে চলে স্নানপর্ব। সকালের স্বচ্ছ জল কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। অসংখ্য গাদা ফুল ভেসে বেড়ায়। বেলা বেড়ে চলে তবুও স্নানার্থীরা আসতেই থাকে এবং পঙ্কিল জলে অবগাহন করে পাপমুক্ত হয়। দুপুর না হওয়া পর্যন্ত ভিড় কমে না।

অবশেষে পুণ্যস্নান সমাপ্ত হয়। তাদের অভিলাষ সিদ্ধ হয়। গৃহ-প্রত্যাবর্তনে যাত্রারম্ভের জন্যে তারা কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়। তীর্থস্থানের আশে-পাশে স্থাপিত বহু মন্দির ও দেবমূর্তির কাছে গিয়ে ভক্তগণ পয়সা, ফলমূল ও ফুলের অর্ঘ্য দান করে। দূরে নাগরদোলা, বাজি ও নানা ধরনের অমোদ-প্রমোদ ও বাজি-তামাসা চলে। তাতে অনেকে যোগদান করলেও পুণ্যার্থীদের অধিকাংশই সেখানে যায় না। স্নান-উৎসবে তারা এতো পবিত্রতা ও একাগ্রতা প্রদর্শন করে যে, পার্থিব আমোদ-আহ্লাদে আর বেচা-কেনায় তাদের মন থাকে না। পাথেয় ও আনুষঙ্গিক খরচ বাদে

তাদের হাতে যা অবশিষ্ট থাকে, তার সমস্তটা দেব-দেবীদের অর্ঘ্যের জন্য তারা খরচ করে।

আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে যায়। জনস্রোত এবার গৃহাভিমুখী হয়। অস্ত আকাশে আগুন ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যায়। আকাশে আর নদীতে প্রতিবিম্বিত হয় তার জ্বলন্ত আভা। নদী পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অশ্রান্ত মর্মরধ্বনি তুলে বিশাল ব্রহ্মপুত্র ছুটে চলে। বছরের এই একটি দিনে—চৈত্রের শুক্লাষ্টমীতে তার প্রশস্ত বুকে লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বপাপ বয়ে নিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে সে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন-তীর্থ

যতোদূর দৃষ্টি যায়, তার মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্য কোনো প্রতীকই দেখা যাবে না। অতীতের জঙ্গল ভাঙা বিরাট মাঠ জনশূন্য ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। চারদিকে ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটাবন—যেনো তীর্থবস্ত্র পরিহিতা এক নারী। এর ওপর খড়ের ছাউনি দেওয়া কতকগুলো মাটির কুটির। ঝড়ের আক্রোশে ও বৃষ্টির ঝাপটা লেগে এগুলো জীর্ণপ্রায়। বাদামী রঙের গ্রাম্য ছেলেরা কাদায় খেলা করে। এরা অলস ও উলঙ্গ। কোমরে জড়ানো ঝিনুকের মালা অথবা সোনালী রঙের একগাছা সূতো। গরুগুলো রোদ-পোড়া মাঠে অলস ভঙ্গিমায় চরে বেড়ায়। তৃণাচ্ছাদিত পথ মাড়িয়ে বিপুলকায় হস্তি শ্লথগতিতে চলে যায়। মাহুতের চীৎকার আর অতিকায় জন্তুটির কণ্ঠলগ্ন ঘন্টার শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হতে থাকে। এগুলো সবই প্রাচ্যের চিত্র। শুধুমাত্র একটি চুনকাম করা দালান নির্ভীকভাবে পাশ্চাত্যের প্রতীক বহন করছে। পশ্চিমের বারান্দার দিকে দালানটি যেখানে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে, সেখানে স্থাপিত রয়েছে ক্রুশ। অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি একাধারে একটি চ্যালেঞ্জ এবং আবেদন।

পুব দিকে ঝড়ের সঙ্কেত দেখা যায়। একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ ছুটে আসে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে নিস্তেজ ধূসর বর্ণ মেঘের পাড় ঘেঁষে। প্রবল বারিধারার একটানা শব্দে বাতাস মুখর হয়ে ওঠে। পত্র-পল্লব আন্দোলিত বৃক্ষ-শাখা আর বাতাসের শব্দে কান্নার সুর, বিয়োগবিধুর আত্মীয়ের শোকবিলাপের মতো। গোটা পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে আসে। বৃক্ষছায়ায় ঘনায়মান অন্ধকারে কেমন যেনো একটা গভীর বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু ক্রুশটির ওপর তখনও লেগে থাকে একটু

আলোর পোঁচ। অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে যায় মাঠের ওপর দিয়ে। বৃক্ষশাখাগুলো আন্দোলিত হয়ে—যেনো আকস্মিক আবেগে পৃথিবী সুদৃঢ় অচঞ্চল ক্রুশটির প্রতি প্রণতি জানায়। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়ের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কালো আকাশের পটভূমিতে সাদা ক্রুশটি।

ঝড়ের আক্রমণে ভীত, পলায়নপর মানুষের পায়ের শব্দের মতো বৃষ্টির প্রথম বড়ো বড়ো ফোঁটাগুলো পাতায় ভারী হয়ে পড়ে। গীর্জার দরজাগুলো খোলা।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির ক্রমাগত আঘাত কিন্তু গীর্জার অভ্যন্তরে অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করে। বিরাট খালি গীর্জাটি হঠাৎ এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে একটা বিশ্রামস্থল বলে প্রতিভাত হয়। প্রাচ্যের বিক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকৃতি থেকে এখানে এলে একটা অদ্ভুত পরিচিত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সন্ধান মিলবে। পাশ্চাত্যের কোনো গ্রামীণ গীর্জার মতো এটিকে মনে হবে। ক্রুশের স্থান, পার্শ্ববর্তী ভজন-কক্ষ, সন্ন্যাসীদের মূর্তি, বেদী ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে প্রাচ্য দেশের কোনো ছাপ নেই। বাইরের দিক থেকে দেখলে শুধু গীর্জা এবং ক্রুশ ছাড়া পাশ্চাত্যের আর কোনো কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না।

কতকটা ভয়মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে এর কাঠগোড়ায় এসে থামতে হয়। এই নগরীর একটা প্রধান অংশের সব প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে—গীর্জাটিই টিকে আছে। এই অংশেই একদা ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজগণ বসতি স্থাপন করেছিলো আর এর চতুর্দিকে দক্ষিণে নদী ও উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত মোগলদের মহানগরী বাংলার রাজধানী বিস্তৃত ছিলো। এই উত্তর সীমা থেকে আজকের ঢাকা পর্যন্ত চার মাইল বিস্তৃত অঞ্চলটি এখন নীরব, জনশূন্য এবং পরিত্যক্ত। কোথায় সেই সুবেদারদের সুরম্য প্রাসাদরাজি, ধনাঢ্য বণিকদের বাগানবাড়ী। কোথায় সেই জনবহুল কোলাহলমুখর রাজপথ, বাজার এবং ফৌজী ছাউনী। একদা জনবহুল এই মহানগরীর যা কিছু প্রাচীন, তার মধ্যে টিকে আছে শুধু আমাদের এই লেডী অব রোজারী গীর্জা।

কি করে এখানে এই গীর্জাটি স্থাপিত হয়েছিলো, তা কেউ বলতে পারে না। মনে হয়, যে সব সিরীয় খ্রীস্টানকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভার্টোমেনাস বাংলায় দেখেছিলেন, তারা এখানে উপাসনা করতো। প্রাচ্যে ইউরোপীয় জাতিগুলোর আগমনের যে হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো, তাতে পর্তুগীজগণ পেছনে পড়েনি। তারা ঢাকায় এসে ঐ উপাসনালয়টির সংস্কার ও পরিবর্ধন সাধন করে তাদের উপাসনার উপযোগী করে তোলে। কারণ তখন ঐ উপাসনালয়টির কোনো মালিক ছিলো না। কিন্তু এ-কাহিনীর সমর্থনে কোনো দলিল-দস্তাবিজ পাওয়া যায় না। নির্মাতাগণ তাদের ধর্মানুরাগের এই স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করেই সন্তুষ্ট ছিল। তাদের নাম-নিশানা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে—কিন্তু কীর্তিটি রয়েছে চির-স্মরণীয় হয়ে। স্বদেশে যে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান তাদের জন্মগত অধিকার বলে পরিগণিত হতো, তা বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তারা প্রাচ্যে তাদের নতুন বাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। এরা ছিলো একটা অসমসাহসী জাতির বংশধর। এই জাতি হেনরী ও ভাস্কোডাগামার মতো অসমসাহসিক নাবিকের জন্ম দিয়েছিলো। পর্তুগীজগণ ছিলো আবিষ্কারক ও সুদক্ষ নাবিকের জাতি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নয়া জগতের সন্ধান এই জাতিই প্রথমে দিয়েছিলো। তাদের ক্ষুদ্র দেশটিকে খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে উন্নীত করার জন্যে তারা সর্বদাই উদ্গ্রীব ছিলো। ভারতে এসে তারা অচিরেই এর পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে স্থান করে নিলো এবং কুঠি ও গীর্জা নির্মাণ করলো। এইভাবে তারা ইউরোপের অন্যান্য জাতিকে পথ দেখালো। ঢাকায় তারা কোন্ সালে প্রথম আগমন করেছিলো, তা জানার উপায় নেই। তারা যে এখানে বসতি স্থাপন করেছিলো, তার দৃশ্যমান সকল চিহ্নই এখন অবলুপ্ত। শহরের চার মাইল উত্তরে অবস্থিত এই গীর্জাটি তাদের এককালীন প্রভাবের একমাত্র নিদর্শন।

গীর্জার অভ্যন্তরেও প্রাচীনত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে। গীর্জার বেদী ও উপবেশন স্থানে অবস্থিত প্রস্তরখণ্ডগুলো জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। উৎকীর্ণ

শিলালিপিগুলো তাদের ধর্মপ্রাণতার স্বাক্ষর বহন করছে। এগুলো টিকে আছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের স্মৃতি বহন করছে। এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের তলায় তারা সমাহিত হয়ে আছে। আর্মেনীয় ও পর্তুগীজ ভাষায় উৎকীর্ণ স্মৃতিফলকগুলোর পাঠোদ্ধার সহজ-সাধ্য নয়। মানুষের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গেছে অক্ষরগুলো। এস্থানে প্রাচীনতম যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে চয় ডেভিয়াটিস নামে জনৈক ব্যক্তির। ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন সে মারা যায়। এটি একটি লম্বা ও অপ্রশস্ত শিলাফলক। অর্ধেক আর্মেনীয় ও অর্ধেক পর্তুগীজ ভাষায় উৎকীর্ণ এর লিপি। যে কালে এটি স্থাপিত হয়েছিলো, তখনও মুসলিম সুবেদারগণ ইংরেজদের সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

গীর্জার ছাদে অবিশ্রান্ত ধারায় ঝম ঝম শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। উপবেশন-মঞ্চটি অন্ধকার হয়ে আসে। বেদীর ওপর অন্ধকারের পর্দা যেনো ঝুলে আছে। বাইরে থেকে আসছে বৃষ্টির একটা অদ্ভুত গন্ধ। একটা দমকা বাতাস দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়ে বাতিগুলোকে দোলা দেয়—বেদীর সম্মুখে ধূপদানীকে যেমন দোলান হয়।

অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে ওপর থেকে আসে প্রার্থনার আহ্বান। ঝড়ের বুক ভেদ করে ধ্বনিত হয় প্রার্থনা-ঘণ্টার আহ্বান। সে আহ্বানের মধ্যে থাকে সতর্ক সঙ্কেত আর আবেদন। গীর্জার পথ বেয়ে দ্রুত পদক্ষেপে একটি বালিকা এসে প্রস্তর নির্মিত বিরাট দরজার কাছে দাঁড়ায়। তার পা দু'টো যেনো আটকে যায়। গীর্জার মধ্যে একটা অপরিচিত লোককে দেখে কালো দুটো চোখ বিস্ফারিত করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সুন্দর পাড় দেওয়া সাদা রঙের ও বৃষ্টিভেজা শাড়িটা তার দেহলগ্ন হয়ে আছে। বড়ো বড়ো ফোঁটায় সেটা থেকে জল ঝরছে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য মাত্র। বহু শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় খ্রীস্টধর্ম পালন করে এলেও বংশগত প্রবণতা ও অভ্যাস সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে তাড়াতাড়ি মুখে ঘোমটা টানে, আঙুল দিয়ে পবিত্র জল স্পর্শ করে এবং বুকে ক্রুশ চিহ্ন

আঁকে। তারপর নিশব্দে কুমারী মেরীর বেদীর কাছে চলে যায়। পেছনের দিকে সে উঁকি দেয় না অথবা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চোরাচাহনিও হানে না। পলকের জন্য তার চোখে যে বিদ্যুৎ-আলোক ফুটে উঠেছিলো তা দিয়েই সে যেনো অপরিচিত আগন্তুককে চিনে ফেলেছিলো। জানু পেতে বসে সে ধ্যানে মগ্ন হলো। আর সব কিছু ভুলে গেলো সে।

অতঃপর ক্রমে একে একে বা দলবদ্ধ হয়ে উপাসনার জন্যে লোক তেজগাঁওস্থ লেডী অব রোজারী গীর্জায় সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেকেই এই গীর্জার নির্মাতাদের বংশধর হলেও এবং পূর্বপুরুষদের নাম ধারণ করলেও এখন আর স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে তাদের চেহারার বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করা দুষ্কর। এদেশী খ্রীস্টানদের বংশধরগণ বংশপরম্পরায় খ্রীস্টধর্ম পালন করায় এখন তাদের অতীতের কথা ভুলেই গেছে এবং জানে না যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা মুসলমান ছিলো, না হিন্দু ছিলো। একটি বিস্ময়কর দৃশ্য বটে। ঠিক এখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হয়েছে। জাতির কথা বহু আগেই ভুলে গিয়ে বহুকাল ধরে তারা ক্যাথলিক ধর্ম সূত্রে ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। এরা সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্য দেশীয় তথা ভারতীয় লোক অথচ ধর্মোপাসনায় সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যের অনুসারী। অঙ্গুলি দিয়ে পবিত্র জল স্পর্শ, ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কন, জানু পেতে বেদীর কাছে বসে নীরবে প্রার্থনা ইত্যাদি সবই পাশ্চাত্য দেশীয় ধর্মোপাসনার পদ্ধতি। তাদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য একাত্ম হয়ে মিশে গেছে।

সাদা পোশাক পরিহিত একজন পুরোহিত জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নীরবে বেদীর সামনে যান। পারিপার্শ্বিক অন্ধকার ফুড়ে ছোট ছোট লাল আলোক-শিখা জ্বলে ওঠে। নীল, সাদা ও সোনালী রঙের ওপর আলো পড়ে একটি মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। উচ্চে স্থাপিত পীলসুজের মোমবাতির শিখা-গুলো স্বর্গের দিকে উঠে গেছে বলে মনে হয়। ম্লান ও ধূসর প্রায়ান্ধকারে এগুলো যেনো আলোকসঙ্কেতের মতো জ্বলতে থাকে। সর্বত্রই পাশ্চাত্যের মহান ধর্মের পরিচিত প্রতীকসমূহ বিদ্যমান।

খিট্‌খিটে মেজাজের একটা শিশুর কান্নায় অকস্মাৎ স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। মনে হয়, পটপরিবর্তন হলো। দর্শক যেনো প্রাচ্যদেশে ফিরে আসে। একটা দুরন্ত উলঙ্গ শিশুকে বুকে চেপে ধরে এক জননী তাকে আদর করছে এবং ফিস ফিস করে তাকে চুপ করতে বলছে। তার পাশ ঘেঁসে একটা বালিকা চলে যায় আর তার বাজুবন্দ ও পায়ের মল বেজে ওঠে একটা অপরিচিত গানের সুরের মতো। একটা ছোকরা বৃষ্টিতে ভেজা তার গায়ের জামাটি খুলে বারান্দায় ছড়িয়ে দেয় শুকোবার জন্যে। নিজে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু তাতে মোটেই লজ্জা পায় না তার। আর একটা ছোকরা মেঝেতে শুয়ে আছে। তার দু'চোখে হাসি বিচ্ছুরিত হয়। মায়ের শাড়ির আঁচল নিয়ে সে খেলা করছে। মা একটি কচি শিশুকে কোলে নিয়ে জানু পেতে বসে থাকে। সাদা পোশাক পরিহিত অন্যান্য উপাসনাকারীদের চোখ এদিকে নেই। তারা জানু পেতে বসে থাকে নিশ্চল ও মগ্ন হয়ে।

গীর্জার সার্ভিস শুরু হয়। পুরোহিতের জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত বাইবেলের বাণী স্তব্ধতা ভেঙে দেয়। এর চেয়ে পাশ্চাত্ত্যের প্রতিনিধিত্ব আর কি হতে পারে? সমৃদ্ধ লাতিন ভাষায় শব্দগুলো বাজতে থাকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলো থেকে বহুদূরে অবস্থিত বিস্মৃত খ্রীস্টীয় এই ধর্মমন্দিরে। প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য, জাতি, বর্ণ, দেশ নির্বিশেষে সবারই জন্যে এই মহান ধর্মের একই গীর্জা থাকবে—এই উক্তি যেনো যথার্থভাবে রূপ লাভ করেছে এখানে। একই মিলন-তীর্থে সবাই এসে এক হয়ে গিয়েছে বলে মনে হবে। মানুষ অবশ্য এরূপ সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে মনে করে এসেছে। মানব জাতিকে একই ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ ও মিলন-তীর্থে সমবেত করার ক্ষেত্রে যতো বাধা-বিপত্তিই থাক না কেনো ক্ষণিকের জন্যে অন্ততঃ মনে হবে যে, এগুলো অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। এখানে এসে এরূপ অনুভূতি ও ধারণার সৃষ্টি হবে যে, সকল বৈষম্য বিলীন হয়ে গেছে।

কতো কাল ধরে এই গীর্জাটির উপাসনা-সভা বংশপরম্পরায় মানুষের

চিত্তে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে এসেছে—তাদের পথে আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছে। যাহোক, উপাসনা প্রায় শেষ হয়ে আসে। প্রধান পুরোহিত ও তাঁর সহকারী ধূপাধার আন্দোলিত করতে করতে বেদীর চারদিকে আস্তে আস্তে ঘোরেন। প্রার্থনার ভঙ্গিতে উপবিষ্ট ভক্তদের নাকে ধূপাদির সুগন্ধ। একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসে। পাশ্চাত্ত্যের এই ধর্মীয় উপাসনায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকাকালে অকস্মাৎ কারুর দৃষ্টি সহকারী পুরোহিতের কালো খালি পায়ের দিকে পতিত হলে সাথে সাথেই আবার একটার পর একটা করে প্রাচ্যের দৃশ্য ভেসে ও'ঠ। পাশ্চাত্ত্যের দৃশ্য অপসৃত হয়ে যায়। দাগহীন শ্বেত পোশাকগুলো পাশ্চাত্ত্যের পোশাক। এছাড়া পুরোহিতের আর যা কিছু আছে, সবই প্রাচ্যদেশীয়। ক্ষণেকের জন্য মনে যে বিভ্রান্তি এসেছিলো তা শেষ হয়ে 'যায়। ভক্তদের মধ্যে আরো গভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। ঘণ্টা বেজে ওঠে—যেনো একটা রহস্যের অবসান ঘোষণা করে। উপাসনার চূড়ান্ত পর্যায় এসে গেছে। ভক্তরা মাথা নত করে অপেক্ষা করতে থাকে পবিত্র মুহূর্তটির জন্যে '**Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.**' সকল পার্থক্য, সকল বৈষম্য আবার বিলীন হয়ে যায়। খ্রীস্টের ভোজের উৎসব সংক্রান্ত উপাসনা-পর্ব এরূপ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো লোকে অবলোকন করে। এর মধ্যে রয়েছে সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। সেই বিশ্বাসের অভিব্যক্তি যে বিশ্বাস বহু জাতির প্রাণে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছিলো এবং যার জন্যে মানুষ লড়াই করেছে এবং জীবন দিয়েছে বহুবার। এই ধর্ম সবাই না মানতে পারে কিন্তু তারা এটিকে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করবেই। পাশ্চাত্ত্যের বড়ো বড়ো গীর্জায় যে উপাসনা হয়, এখানেও সেই একই উপাসনা হচ্ছে। মায়ের কোলে ক্রন্দনরত সেই শিশুটির কান্না বন্ধ হয়েছে। হাতের বাজুবন্দ ও পায়ের মলের সেই রিনিকি ঝিনিকিও থেমে গেছে। নড়াচড়া পর্যন্ত বন্ধ। একটা অদ্ভুত কষ্টদায়ক নীরবতা বিরাজ করছে। সেণ্ট পিটার গীর্জাপ্রাঙ্গনে ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথে যে গভীর নীরবতা নেমে আসে সেই অদ্ভুত লগ্নটির

কথা মনে পড়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলন যদি কোনোদিন সম্ভব হয়, তবে খ্রীস্টধর্মকে সকলের সাধারণ ধর্মরূপে গ্রহণের মাধ্যমেই তা হতে পারে।

কিন্তু উপাসনারত ভক্তদের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই মনের মধ্যে পলকেই এই উক্তির কথা মনে পড়বে : 'প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে, পাশ্চাত্ত্য পাশ্চাত্ত্যই থাকবে ; এ দু'টোর কোনোদিন মিলন হবে না।' পাশ্চাত্ত্যের খ্রীস্টানদের মতো এইভাবে একই প্রার্থনা-মন্ত্র পরম ভক্তিভরে এরাও আওড়াচ্ছে। কিন্তু যে ভাষায় তারা মন্ত্র উচ্চারণ করছে, পাশ্চাত্ত্যের কাছে তা অপরিচিত। এ ভাষা মিষ্টি ; কিন্তু অদ্ভুত, অবোধ্য। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে ভাষাই যেনো প্রতিবন্ধকতার অচলায়তন খাড়া করে রেখেছে। শাড়ি পরিহিতা অর্ধঅবগুণ্ঠনবতী সমবেত নারীদের সাথে পাশ্চাত্ত্যবাসিনীদের কোনো সাদৃশ্য, কোনো মিল নেই। আর পুরুষেরা চিন্তাধারায়, কথাবার্তায় ও জীবনযাত্রায় পাশ্চাত্ত্যের পুরুষদের থেকে কয়েক শতাব্দী পেছনে পড়ে আছে। তাৎক্ষণিক আনন্দ-বিষাদের বাইরে এরা আর কিছু জানে না। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি আছে কি, যা তাদের জন্যে একটি মিলনক্ষেত্র রচনা করে দিতে পারে ?

অকস্মাৎ বেদীর পাশ দিয়ে আলোর কিরণ এসে পড়ে। বৃষ্টি কখন থেমে গেছে, সেদিকে খেয়ালই ছিলো না। সাদা, নীল ও সোনালী বর্ণের ওপর সূর্যের প্রদীপ্ত আলো।

অবশেষে সভা চঞ্চল হয়ে ওঠে। উপাসনা শেষ হয়। ভক্তেরা আস্তে আস্তে বাইরে আসে। সেই ছেলেটি রোদে শুকোতে দেওয়া জামাটি তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। তার চোখ দু'টো অপরিচিত দর্শকটির দিকে (লেখকের দিকে)। মায়ের আঁচল ধরে সে হাঁটতে থাকে। স্ত্রীলোকটি যতোক্ষণ না এই পবিত্র ধর্মপীঠের সীমানা অতিক্রম করে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দিকে তাকায় না। গীর্জা পার হয়ে সে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একবার চোরাচাহনি হেনেই দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। কারণ, আবার ঝড় শুরু হয়ে গেছে। শীগ্গির বৃষ্টি নামবে।

সহকারী পুরোহিত তাড়াতাড়ি করে বেদীর ওপরের বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে, ফলে ওটি প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। চারদিকে অস্পষ্টতা ও প্রায়ান্ধকার নেমে আসে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধের যে অদ্ভুত স্বপ্ন পেয়ে বসেছিলো, তা অন্তর্হিত হলো। এই শূন্য ও নিঃশব্দ গীর্জাটি এখন সদ্যভাঙা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তথাপি এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় একবার পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয় এবং তখন এই বিশ্বব্যাপ্ত ধর্মটির মহান প্রতীক-এর গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। মনে হয়, সকল পরিবর্তিত অবস্থায় সর্বযুগে এটি আশার আলোকদিশারী। এরই ছায়াতলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এক হয়ে মিশে গেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শীতলক্ষ্যার বুকে

উষার পূর্ব মুহূর্ত

ওপরে মৃত নীল আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ মিট্ মিট্ করছে। নীচে প্রবহমানা বিশালকায় নদীতে তরঙ্গের নর্তন। নাচের প্রতিটি মুদ্রায় সারা রাত ধরে ক্ষীয়মান চাঁদের রূপালী আলো প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নদীর উভয় তীর কালো পাড়ের মতো দেখায়। দুই পাড়ের মধ্যবর্তী স্থানটিতে যেনো আলোর চুমকি বসানো। দূরে—নদীতে ও স্থলভাগে একটা অস্পষ্ট সাদা কুয়াশার আস্তরণ ঘুমন্ত পৃথিবীতে ঘুমের জামার মতো লেগে আছে।

নদীতে যান চলাচল বন্ধ। গুঞ্জরণমুখর বাজার স্তব্ধ, নীরব। চরাচরে সর্বব্যাপ্ত এক মহা নীরবতা—মহা শান্তি।

বাধাবন্ধনহীন নদী মুক্তির আনন্দে নেচে নেচে হেসে হেসে পালিয়ে যাচেছ। মায়ের কণ্ঠে মিষ্টি ঘুমপাড়ানী গানের মতো রাত্রির নৈশব্দকে মুখর করে তোলে অফুরন্ত অবিশ্রান্ত কল্লোলসঙ্গীত—এই পৃথিবীটাকে তারা যেনো ঘুম পাড়াচেছ। উভয় তীরকে পরম আদরে কোলে তুলে নিয়ে নদী আরো ওপরে উঠে তীরভূমিকে বুকের একান্ত সান্নিধ্যে আনয়নের অন্তহীন প্রচেষ্টায় মগ্ন। নদী তার তীর দু'টোকে পরম আদরে কোলে তুলে নিয়ে আরো ওপরে উঠতে চায়—হাত বাড়িয়ে তাদের ধরতে চায় বুকের একান্ত সান্নিধ্যে আনার জন্যে। এই অন্তহীন প্রচেষ্টার বিরাম নেই যেনো। মানুষের অহমিকা আর দুরাশার কথা ভেবে অনুচ্চ স্বরে সে খেদ প্রকাশ করে। তার নিজের স্থায়ী অস্তিত্বের সাথে অনিত্য মানব জীবনের তুলনা করে ও মানুষের অযথা মায়া এবং নিষ্ফল চিন্তা-ভাবনার কথা মনে করে সে যেনো খিল্ খিল্ করে হাসে। সে দেখেছে তারই তীরভূমিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

কতো মানুষের আগমন আর নির্গমন। এই দু'টো তীরে কতো বড়ো বড়ো জনপদ, নগরী ও রাজ্যের উত্থান ও পতন সে দেখেছে—চপলমতী এই সংসারের ক্ষণস্থায়ী দ্রুতসঞ্চারী গৌরব-মহিমা। তার প্রশস্ত বুকের ওপর দিয়ে কতো সৈন্যবাহিনী, নৌবহর আর রণপোত সে বয়ে নিয়ে গেছে হয় জয়মাল্য পরাতে অথবা পরাজয়ের কলঙ্ক তিলক এঁকে দিতে। অতীতের গহ্বর থেকে ভৌতিক স্মৃতির মতো তাদের কথা ভেসে ওঠে যেনো। কতো জাতি অতীত হয়ে গেছে। কেউ তাদের কথা মনে করে না। এতো পরিবর্তন, এতো উত্থান-পতনের মধ্যে শুধু টিকে আছে অব্যাহত হয়ে এই মহানদীর এগিয়ে চলা। তরঙ্গের মর্মরিত সুরের খানিকটা বিদ্রূপ আর খানিকটা সান্ত্বনা মিশিয়ে সে বলছে—'অনিত্য, অসার, অলীক—সবই মিথ্যা—সবই অসার।'

ধীরে ধীরে ক্ষয়ে-র

পাড়ে নোঙর ভিড়ানো জাহাজগুলোর মাস্তলের পশ্চাতে। চাঁদ ডুবে যাওয়ায় স্বচ্ছ কালো জলে নক্ষত্রমালার আলো উজ্জ্বলতর হয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। সমস্ত চরাচরে এক রুদ্ধশ্বাস নীরবতা বিরাজ করে। আসন্ন দিনকে স্বাগত জানাতে চায় না যেনো। নদীর কুলু কুলু ধ্বনিও অস্পষ্ট ও নীরব-প্রায় হয়ে আসে। প্রাক-উষার স্বল্পকাল স্থায়ী বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত সেই অদ্ভুত নৈঃশব্দ।

নদীর উজানে জেটিতে নোঙরবদ্ধ স্টীমারগুলোতেই শুধু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। রাত্রির কালো পটভূমির ওপর তাদের বিপুল এ্যাগব বিদ্যুতের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে রাত দিনের মতোই উজ্জ্বল। ঝিল্লিবের ঝনৎকার, ভেতরে ভারি বোঝার পতন শব্দ, নাবিকদের কর্কশ শব্দ-তরঙ্গ চঞ্চল নদীর ওপর দিয়ে ভেসে আসে। এই ঘুমন্ত পৃথিবী আর নদী থেকে আলাদা একটা জগতের শব্দ যেনো সেগুলোর।

অকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে বায়ু-তরঙ্গে যেনো একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী যেনো যুবক হয়ে উঠেছে। খোলা চোখে সবই

ঘুমন্ত বলে মনে হবে। কিন্তু কান পেতে রাখলে উষার পদধ্বনি শোনা যাবে। প্রকৃতি যেনো প্রতীক্ষমানা পৃথিবীতে জীবনের নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে রাতকে বিদায় দিলো। এই নিঃশ্বাসের শব্দ অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং রহস্যময়—যা কেবল স্বপ্নেই বুঝা যায়—অনুভব করা যায়। সেই অনুভবের জগৎ—যার সন্ধান মানুষ জানে না, সেখানেই এর আবেদন।

আসন্ন উষার প্রথম রহস্যময়তা কেটে যায়। অদৃশ্য, দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় বস্তুর স্থলে দৃশ্যমান জ্ঞানগ্রাহ্য বস্তুর জগৎ নেমে আসে। শীতল মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়। প্রতিটি গাছের প্রতিটি পত্র-পল্লব উষার আবির্ভাবে আনন্দে নৃত্য করে, গান জুড়ে দেয়। দীর্ঘকায় বাঁশগুলো মনোহর ভঙ্গিতে আন্দোলিত হয়ে নদীর জলপ্রান্তে চুম্বন দেয়। বৃক্ষশাখা থেকে সদা ঘুমভাঙা পাখীর উচ্চস্বরে দিনের আবাহনী সঙ্গীত জুড়ে দেয় আর শিশিরসিক্ত পালকগুলো ঘন ঘন সঞ্চালন করে। নিষিদ্ধ নৈশ আমোদে মত্ত কোনো মাতাল প্রভাতে যেভাবে মাথা হেঁট করে বাড়ী ফিরে, একদল দাঁড়কাকও তেমনি জলের কিনার ঘেঁষে যেনো মাথা হেঁট করে অপর পাড়ের বৃক্ষশাখায় অবস্থিত কুলায় ফিরে যাচেছ।

একটি স্টীমারে সাইরেন ধ্বনি হুশিয়ারি আওয়াজের মতো স্তব্ধতা ভেঙে দেয়। দৈত্যের মতো গর্জন, আর্তনাদ ও চীৎকার করে আস্তে নড়ে ওঠে এটি আর শিকলগুলো থর থর করে কেঁপে ওঠে। সার্চলাইটের চোখ-ঝলসানো আলো পরিষ্কার করে পথ দেখিয়ে দেয়। তার সাদা আলোর প্লাবনে নদীর আলো নৃত্যপারা জল, পার্শ্ববর্তী জাহাজগুলো এবং উভয় তীর যেনো স্নাত হয়ে ওঠে। রাতকে সে পরোয়া করে না। অন্ধকারে দিনের আলো ফুটিয়ে তোলে। দিনের থেকে অধিকতর সহৃদয়। সকল বস্তুকে পরিস্ফুট ও অদ্ভুত আকর্ষণীয় করে তোলে সে। এমনকি টিনের ছইবিশিষ্ট যে-সব নৌকা দিনের বেলায় কুৎসিৎ দেখাতো, এই অদ্ভুত আলোকসম্পাতে সেগুলো সুন্দর এবং রূপোর মতো উজ্জ্বল দেখাচেছ। ক্রমে ক্রমে বিশাল বপু স্টীমারটি মাঝ-নদী ধরে সোজা চলে যায়।

পুব দিক থেকে মৃত, বিবর্ণ, ধূসর আলো হামাগুঁড়ি দিয়ে আসে আর নদীর উজানে নোঙর-বাঁধা জাহাজগুলোর মাস্তুল সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঊষার এই আধা-আলো আধা-অন্ধকারে জাহাজের বিরাট খোলগুলো কালো ভূতের মতো দেখায়। স্টীমারগুলোর চোখ-ধাঁধানো আলো অকস্মাৎ নিবে যায়। আগুনের চোখগুলো যেনো মন্ত্রবলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। সমগ্র পৃথিবী ধূসর বর্ণ ধারণ করে। ধূসর বর্ণের ওপর এক ঝলক গোলাপী রক্তিমাভা। যেখানে আকাশ আর নদী এক হয়ে গেছে, সেখানকার ঝুলন্ত সাদা কুয়াসা গলে যেতে থাকে। সূর্যের আসন্ন আবির্ভাবে তারাগুলোর চোখ ঘুমে মিট মিট করে। ওরা একে একে বিদায় নেয়।

অকস্মাৎ পৃথিবী জেগে উঠেছে। সারারাত ধরে যেসব নৌকা তীরে বাঁধা ছিলো, সেগুলোর যাত্রা শুরু হয়। কাপড়ে গা জড়িয়ে ধীবরগণ সারাদিনের মাছ শিকারের জন্যে তাদের জাল ঠিক করে নেয়। সকালের ঝিরঝিরে বাতাসে বাদামী রঙের পাল তোলা একটি ডিঙ্গি তরতর করে এগিয়ে চলে। একটি ভারি পুরানো ধরনের জাহাজ থেকে বিলাতি লবণ খালাস করে জেটিসংলগ্ন গুদামে তোলা হচ্ছে। নিস্তব্ধ জনহীন নদীতীরে আবার কর্মব্যস্ত জনতার ভিড় শুরু হয়। সূর্য ওঠে যেনো ঘুম থেকে জেগে-ওঠা দানবের মতো। রূপালী নদী নয়া পোশাক পরিধান করে। প্রভাতের বর্ণবৈচিত্র্য প্রতিবিম্বিত হয় নদীর বুকে। সীমাহীন সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মতো লাল, কমলা, সোনালী, বেগুন, হলুদ ইত্যাদি বর্ণের এক একটা ঢেউ ভেঙে পড়ছে। ঊষার মহিমা আর রাতের রহস্যময়তা মিলিত হয়ে মিশে যায় দিনের মধ্যে। নদী বয়ে যায় দুর্নিবার, নিরবধি, নিরন্তর। দিনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। মওসুমের মাঝামাঝি কাল এটি। এই অঞ্চলে ব্যবসায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ। নদীর দু'পাড়ে লাল ইটের গাঁথুনি আর টিনের ছাদ দেওয়া বিরাট বিরাট গুদাম। এগুলোর পেছন দিকে বিরাট বিরাট চিমনি। ক্রেন দিয়ে মাল উঠানো-নামানো হচ্ছে। একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের কর্মকোলাহল ও কর্মব্যস্ততার সবগুলো লক্ষণই এখানে

আছে। নদী থেকে দেখা যায় পাথরের তৈরী মজবুত বাংলোগুলো। বাংলো থেকে নদীর কিনারা পর্যন্ত সুশোভিত বৃক্ষসারি। পরিপাটি করে সাজানো সবুজ সম্পদে ভরা লন অথবা সুন্দর বাগান প্রতিটি বাংলোর সৌন্দর্য বর্ধন করছে। নদীর পাড় ঘেঁষে বাঁধা নানা ধরনের নানা আকারের পাটভর্তি অজস্র নৌকা।

নদীতে বিভিন্ন জলযানের ভিড় জমে যায়। ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গিগুলো নদীর পানি ছুঁই-ছুঁই করে তরতর বেগে ছুটে চলে। এসব নৌকার সম্মুখ ও পশ্চাদভাগ বেশ উঁচু। গোলাকার ছাদবিশিষ্ট ডিঙ্গিগুলোতে একটিমাত্র দাঁড় এমন দক্ষতার সাথে জুড়ে দেওয়া হয় যে, ওটা দাঁড় ও হাল দু'টির কাজই করে। একটা শক্তিশালী স্টীমার যেনো মনের আনন্দে মাঝ-নদীতে গিয়ে স্থির হয়ে থাকে লোহার ছাদবিশিষ্ট বিরাট বিরাট ফ্ল্যাট টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পাটের নৌকাগুলো নদীর উজানে ভেসে যায়। মাল্লারা এই সব নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে।

এ এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। স্টীমার নোঙর তুলে যাত্রা করে যানবহুল নদীপথ ধরে আর প্রতিমুহূর্তেই নতুন আকর্ষণীয় বস্তু চোখে পড়ে। উদয় মুহূর্তে যখন সমস্ত পৃথিবী আলোকস্নাত হয়ে ওঠে, তখনই প্রভাতের গৌরব ও মহিমার অভিব্যক্তি ঘটে। দিনের সূচনা-মুহূর্তে পৃথিবী ও নদীতে নব-জীবনের স্পন্দন লাগে। সুন্দর ও ক্ষুদ্র স্টীমারগুলো যেনো নেচে নেচে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। এগুলোর গতির আঘাতে পেছনের ফেনিল জল-রাশিতে দীর্ঘ ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। নদীর উভয় পার্শ্বে পড়ে রয়েছে ঐতিহাসিক ভূমি। বন্দরের কলকোলাহল আর কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ইতিহাস তলিয়ে গেছে। কিন্তু শীতলক্ষ্যার ভাটিতে যেখানে বড়ো বড়ো নদীগুলো একত্রে মিলিত হয়েছে তার চার পাশ ঘিরে অতীতের বহু স্মৃতি আজো বেঁচে আছে। আরো নীচের দিকে মেঘনা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি অঞ্চলই হচ্ছে পূর্ব বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। বহুকাল ধরে এখানে কতো জোয়ার এসেছে,

কতো ভাটা পড়েছে। এরা দেখেছে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য। বাঁয়ের দিকে যে অঞ্চলটি চোখে পড়ে সেখানেই অবস্থিত ছিলো প্রাচীন বিক্রমপুর রাজ্য। রাজধানী রামপালের ধ্বংসাবশেষ আর বিখ্যাত রাজা বল্লাল সেনের স্মৃতি বুকে নিয়ে পড়ে রয়েছে এই অঞ্চলটি। পশ্চাতে সামান্য দক্ষিণে ছিলো সোনারগাঁও রাজ্য। বহু শতাব্দী ধরে সমগ্র পূর্ব বাংলার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো এই স্থানে। আজ এটি শান্ত সমাহিত গ্রামাঞ্চলে পরিণত। কিন্তু এখানকার বিখ্যাত দুর্গসমূহ ও প্রাসাদশ্রেণী জীর্ণ দশায় অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। অপস্রিয়মান স্মৃতির মতো এগুলোও ক্রমবিলুপ্তির পথে। ইছামতীর ভাটিতে অবস্থিত ফিরিঙ্গিবাজার সে আমলের পর্তুগীজ বোম্বেটেদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের স্মৃতি বহন করছে। সে যুগে এইসব নদীতে জলদস্যুদের উপদ্রবের অন্ত ছিলো না। পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কাছ থেকে মগেরা নৌবিদ্যা ভালোভাবে আয়ত্ত করে। তারা মোগল শক্তিকে অগ্রাহ্য করে নদীতীরবর্তী জনপদগুলোতে অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা এমন বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলো যে গ্রামকে গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়। তাদের উৎসাদনের জন্য ঈসা খাঁ এবং মীর জুমলা নদীর উভয় তীরে কতকগুলো দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কলাগাছিয়া, সোনাকুণ্ডা, ত্রিবেণী ও হাজীগঞ্জে এই দুর্গগুলো অবস্থিত ছিলো। তাদের শায়েস্তা করার জন্যে সম্রাট আকবরের রাজপুত সেনাপতি মানসিংহ এই হাজীগঞ্জ থেকেই সসৈন্যে যাত্রা করেছিলেন। বলদৃপ্ত মোগল সেনাবাহিনীর সেদিনের সেই যাত্রা লক্ষ্যা হৃষ্টচিত্তেই অবলোকন করেছিলো। নদীর উভয় পাশে এক মাইল স্থান জুড়ে তাদের নৌবহর বিস্তৃত ছিলো। চল্লিশটি দাঁড়বিশিষ্ট এক একটি বিরাট জাহাজ। বহু পাল আর অসংখ্য রশি সংযুক্ত বিরাট আকারের এইসব জাহাজ সম্মুখ সমরে মগদের মোকাবেলা করার উপযোগী ছিলো না। কিন্তু দৃঢ়তা ও শক্তির জন্যে অবশেষে মোগল বাহিনীরই জয় হয়েছিলো। ধ্বংসস্তূপে পরিণত সোনাকুণ্ডা দুর্গটি সোনারগাঁওয়ের অন্যতম প্রধান আফগান নায়ক ঈসা খাঁ ও তাঁর বীরাঙ্গনা সহধর্মিণী সোনাবিবির স্মৃতিতে মণ্ডিত-হয়ে

আছে। ঈসা খাঁর চিরশত্রু চাঁদপুরের হিন্দু রাজার বালবিধবা রূপবতী কন্যা সোনাকে তিনি চাঁদপুর থেকে নদীপথে সোজা এখানে এনেছিলেন। পরবর্তী কালে আবার এক স্থানেই বিধবাবস্থায় তিনি পরলোকগত পতি ঈসা খাঁর দুর্গ রক্ষার জন্যে অমিতবিক্রমে লড়াই করেছিলেন। তাঁর আপনার জনেরাই আক্রমণ করেছিলো এই দুর্গ। তারাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তাঁর প্রাণঘাতী শত্রু। শত্রুদের হাতে রাজধানী সমর্পণ করার চেয়ে বরং তিনি এটিকে তাঁর চিতাকুণ্ডে পরিণত করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

আর একটু উজানে নারায়ণগঞ্জ বাঁ হাতে রেখে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে একটা বিরাট ফটকের মধ্যে রসূলের পদচিহ্নবাহী কদম রসূল। বিপরীত দিকে যেখানে হাজীগঞ্জ দুর্গ অবস্থিত ছিলো, সেখানে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুবেদার নওয়াব শায়েস্তা খাঁর নির্মিত একটি মসজিদ এবং তাঁর কন্যা মরিয়ম বিবির সমাধি-সৌধ। শায়েস্তা খাঁ বজরায় অবস্থান কালে এখানে তাঁর কন্যার মৃত্যু হয়েছিলো। এর উজানে অবস্থিত বিরাট পাটের গুদাম। জেটি এবং কর্মকোলাহল মুখরিত বন্দর ছেড়ে আরো উজানে গেলে শান্ত নীরব পল্লীরাজ্য।

আরো এগুলতে থাকুন, দেখবেন কালের গতির সাথে সাথে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেযুগে পর্তুগীজ বোম্বেটের দল নতুন দুঃসাহসিক অভিযানের অন্বেষণে বহির্গত হয়ে এসব স্থানে যা দেখতে পেয়েছিলো অথবা সুবেদার কন্যা মরিয়ম বিবি তাঁর মহামূল্যবান রেশমী মুখাচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে এগুলোকে যেমন সুন্দর দেখেছিলেন তা আজো তাই আছে। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু দিগন্ত বিস্তারী পাটক্ষেত। শান্ত হাস্যোৎফুল্ল শীতলক্ষ্যা পূর্ব বাংলার সুন্দরতম নদী। এখান থেকে সে সোজা উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত। সকালের সূর্যকরস্পর্শে রজত-তরঙ্গের খেলা। এর প্রবল স্রোতে প্রচুর জল প্রবাহিত হয়। বালকরা যেমন স্কুলের সীমা ডিঙিয়ে পালাতে চায় এও তেমনি দু'কূল ভেঙে ফেলার চেষ্টায় রত। তীরবর্তী বৃক্ষ এবং আনত বৃক্ষশাখাগুলোকে সে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। মাইলের

পর মাইল ব্যাপী জঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত। এসব জঙ্গল যখন প্রথম জন্ম-লাভ করে নদীর সঙ্গীত শোনার জন্যে মাথা নত করেছিলো, তখন থেকে এদের গায়ে কেউ আঁচড় লাগায়নি। বট, নিম, পিপুল, পলাশ, আম এবং তেঁতুল গাছ থরে থরে সাজানো—এতো ঘন যে মনে হবে যেনো সবুজের প্রাচীর। মাঝে মাঝে কলাগাছের ঝাড়। সবুজ পত্র সমন্বিত কলাগাছে রক্ত অথবা বেগুনী রঙের মোচাগুলো যেনো একটি অদ্ভুত বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। ক্ষীণকায় বাঁশগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হয়। সাদা পালগুলো বাতাসে স্ফীতকায়। বাদামী রঙের পালগুলো অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা করে আর নীল পালগুলো আকাশের নীলকেও হার মানায়।

বীর বিক্রমে অগ্রসরমান ক্ষুদ্র স্টীমারটির নাড়ির প্রতিটি স্পন্দনে নতুন নতুন দৃশ্য উঁকি দিয়ে যায়। একটা ক্ষুদ্র খাড়ির ওপরে সুউচ্চ একটি কাঠের পুল হয়তো কখনো উঁকি দিয়ে গেলো। মাথায় কলস নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে একদল স্ত্রীলোক পুলটি পার হচ্ছে। নদীতীরে কতকগুলো ছাগল পরম সন্তোষভরে সবুজ ঘাস খেয়ে যাচ্ছে। তামাটে রঙের গ্রাম্য ছেলেরা ছাগলের সাথে খেলা করছে। একদল মোষ জলাভূমিতে কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কতকগুলো পাখি তাদের চারদিকে ঘুর ঘুর করছে কীটপতঙ্গ শিকারের আশায়। মাদুরের বেড়া দেওয়া ও ভালোভাবে ছাউনি করা কতক-গুলো গৃহ গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে এবং গৃহস্থদের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতার কথা ঘোষণা করছে। কারণ এগুলো অত্যন্ত উর্বর জমি। এখানে উৎপন্ন পাটে অনেকের অবস্থা ফিরে গেছে। পশ্চিম বাংলার তুলনায় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন ধারণের ব্যয় অধিকতর হলেও এখানকার মজুরী এবং স্বাচ্ছন্দ্যও বেশি। তালুকদার, ছোটখাটো জমিদার ও ব্যবসায়িকগণ পরিপাটি করে সাজানো গৃহে পরম আরামে নিদ্রাসুখ ভোগ করে।

হয়তো কোনো এক বিরাট বটগাছের নীচে পঞ্চায়েৎ বসেছে। গ্রাম্য বিচার সালিশ চলছে বিরোধমান দুই দলের মধ্যে। কার দোষ কার অন্যায়

অথবা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কে অপকর্ম করেছে তা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। হয়তো বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে দু'ভায়ের মধ্যে বিবাদ লেগে গেছে। আদালত বহুদূরে এবং মামলার খরচও অনেক। কাজেই তারা বুদ্ধিমানের মতো পঞ্চায়েতে এসেই বিবাদটি মিটিয়ে ফেলতে চায়। পঞ্চায়েতের সভাপতি ন্যায়বান এবং নিরপেক্ষ। তিনি তাদেরই মধ্যেকার একজন প্রবীণ ও সম্মানী ব্যক্তি। বিবদমান ব্যক্তিদের তিনি তাদের শৈশবকাল থেকেই দেখে আসছেন। তাদের বাবাকেও তিনি জানতেন। তাদের উত্তরাধিকার বিধি ও রীতিও তিনি ভালোভাবেই জানেন। সুতরাং এরূপ একজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য আর কে তাদের মামলা সুষ্ঠুভাবে মিটিয়ে দিতে পারে? তিনি যথার্থ ন্যায়বিচারই করবেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়েছে। এও হতে পারে যে, প্রতিবেশীদের মধ্যে সীমানা নিয়ে অথবা জলকরের স্বত্ব নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। অথবা কোনো ব্যক্তির জমি থেকে কেউ জোর করে পাট কেটে নিয়ে গেছে বলে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোর্ট হয়তো প্রেসিডেণ্টকে সরেজমিনে তা তদন্ত করার ভার দিয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের ডাকবেন। তারা বিষয়টি আদ্যন্ত জানে। সেখানে সত্যকে গোপন করার সম্ভাবনা খুবই কম। পঞ্চায়েতে এরূপ হাজার হাজার ব্যাপার আসে। সব ব্যাপারেরই নিষ্পত্তি করতে হয়। এমন কোনো বিষয় নেই যা পঞ্চায়েতে নিষ্পত্তি হতে পারে না। গাছের ছায়ার তলে গ্রামের মুরুব্বীরা একত্র বসে সকল বিষয়ের সালিশ করে। একটি স্টীমার বৈঠকের ধার ঘেঁষে যখন চলে যায় তখন প্রেসিডেণ্ট দাঁড়িয়ে উঠে দরবারি কায়দায় ধাবমান স্টীমারটির দিকে অভিবাদন জানান। একজন সম্মানিত মুসলমান তাঁর পরণে শুভ্র পোশাক আর মুখে দীর্ঘ-শ্মশ্রু—সম্ভ্রম আর সৌম্যতার প্রতিমূর্তি যেনো।

আরো দূরে নদীর কাছেই নজরে পড়বে মুরাপাড়ার ধনাঢ্য জমিদারের হালফ্যাশানের বাড়ি। দালানগুলোতে লাল ও সাদা রঙের কাজ। জমিদারের

প্রাসাদ থেকে প্রশস্ত সোপান জলের কিনার পর্যন্ত নেমে গেছে। নদী তথা প্রকৃতির সনাতন সৌন্দর্যের পাশে এই আধুনিক গৃহটি যেনো জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে দেখা যাবে কতকগুলো মসজিদ ও প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। এক কালে এখানে শায়েস্তা খাঁর বংশধরগণ বাস করতেন। এই পরিবারের গৌরবের দিন শেষ হয়ে গেলেও এর দুর্দিন নেমে আসতে তখনও অনেক দেরি ছিলো। প্রাসাদ ও মসজিদগুলোর প্রায়বিধ্বস্ত দেওয়ালে শেওলা জমে গেছে। অতীতের এই চিতাভস্মের পাশে দণ্ডায়মান আধুনিক জমিদার বাড়ীটি বৈসাদৃশ্যের এক চরম দৃষ্টান্ত। বিপরীত দিকে দরমার বেড়া আর টিনের চাল দেওয়া বৃটিশ রাজসরকারের অখ্যাত ফাঁড়ি রূপগঞ্জ থানা গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। থানার সম্মুখে খোলা জায়গাটিতে সারি সারি বসে গেছে নীল কোট আর সাদা-নীল পাগড়ি-পরা চৌকিদারগণ। তিন মাসের বেতন এক সাথে পাবে এই প্রত্যাশায় খুশি মনে তারা অপেক্ষা করছে। খাকি কোট আর লাল পাগড়ি পরা দফাদারগণ চৌকিদার ব্যূহের ভিতর ঘোরাফেরা করছে। শক্তিশালী বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার এরাই প্রথম ধাপ। চৌকিদারগণই আমাদের ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই চৌকিদারদের মধ্যেই প্রতিটি গ্রামে বৃটিশ আইনের সার্বক্ষণিক মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রতিফলিত হয়।

অকস্মাৎ নদীটা একটা মোচড় দিয়ে বাঁক নিয়েছে। লাল খাড়া পাড়টি যেনো কোনো প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মতো মনে হয়। যেনো তৃণ-গুল্ম-পত্র-পল্লবের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। চির পরিবর্তনশীল নাটকের আবার পট পরিবর্তন হয়। জ্যোতির্ময় সূর্য, সেই জলন্ত মহাগোলক, কখন বুকে হেঁটে মাথার ওপর উঠে গেছে। দৈত্যের মতো গুবাক আর তাল-তমাল বৃক্ষরাজি নীলকান্তমণি সদৃশ নীল আকাশের গায়ে মনোহর ভঙ্গীতে উঠে গেছে। কিছু দূর পর্যন্ত তীরভূমি বেশ উঁচু। তীরের শৃঙ্খল ভেঙে নদী নিজেকে বিস্তার করতে চায়। দু'পাশে অবস্থিত শস্যক্ষেতকে বুকে টেনে নিতে চায়। বাঁকের চারদিকে মিঠে হাওয়া। ব্যাপারীদের পাটবোঝাই

ভারি বিরাট একটি নৌকা মন্থর গতিতে চলেছে। নৌকার ছাদের ওপর যারা দাঁড় টানছিলো হাওয়া উঠার সাথে সাথেই তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। দাঁড় সরিয়ে রেখে তারা হৈ চৈ ও চীৎকার শুরু করে এবং সেই বিরাট পালগুলো তুলতে আরম্ভ করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে—যেনো শত্রুসেন'দের এক্ষুণি দেখতে পেয়ে তারা যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করে নিচ্ছে। পালগুলো পত্ পত্ করে হেলেদুলে ওপরে ওঠে। বায়ুস্ফীত পালের টানে নৌকাটি হঠাৎ যেনো ঘুম থেকে জেগে উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। নদীতে অবস্থিত প্রতিটি নৌকাই এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। পালে হাওয়া লাগে আর তারা যেনো নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করে। শিল্পীর তুলির এ যেনো শেষ আঁচড়। সাদা, বাদামী, ছেঁড়া, সেলাই করা—বিচিত্র ধরনের পালের সমাবেশ। যে সব ভারি পাটবোঝাই নৌকা অনুকূল বায়ুর অভাবে নদীর পাড় বরাবর অতিকষ্টে কোনো রকমে অগ্রসর হচ্ছিলো পালযুক্ত হওয়ায় সেগুলো এখন হালকা হয়ে গেছে। আরো হাওয়া এবং গতিলাভের জন্যে এগুলো এখন মাঝনদী দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলেছে। ছোট ছোট ডিঙ্গি ও জলকর নৌকাগুলো পালের হাওয়ার আকস্মিক টানে একদিকে হেলে পড়েছে। হাস্যোচ্ছল জলের ওপর দিয়ে এগুলো নেচে নেচে এগিয়ে যাচ্ছে—কতকগুলো বিরাটাকার সাদা পাখি যেনো পাখা বিস্তার করে উড়ে চলেছে। জীবনানন্দে নদী ছুটে চলেছে। তার কলকণ্ঠে যেনো অস্ফুট খেদ—হায় রে বর্তমান, হায় রে জীবন আর কর্তব্যের মুহূর্তগুলি। হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে এরা প্রতিনিয়ত। সবই অনিত্য, সবই মিথ্যা।

আরো এগিয়ে গেলে নদী থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে ডেঙ্গা নামক হাট। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক এখানে এসে ঝিকিকিনি করে থাকে। আজ হাটবার। চালাঘরের দোকানগুলোতে বিভিন্ন পণ্য সাজানো রয়েছে। দরকষাকষির শব্দ নদীতে ভেসে আসছে। এখানকার লোকেরা পুরাদস্তুর দরকষাকষি করে অনেক ভেবে-চিন্তে গাঁটের পয়সা খরচ করবে। বেলা

যতই বাড়ুক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অনেক বাক্যবিনিময় হবেই। দুপুর হয়ে এলো। সূর্য পূর্ণ তেজে নদীতে শরাঘাত করছে আর বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোকচ্ছটা। সারাদিনের তীব্র গরমে বাতাস অবসন্ন হয়ে যেনো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। দীর্ঘকায় সুপারী গাছগুলো শক্ত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের আন্দোলিত করার মতো সামান্যতম বাতাসও বইছে না। নৌকার পালগুলো স্থির হয়ে ঝুলতে থাকে। একে একে এগুলো নীচে নামানো হয়। বড়ো বড়ো নৌকাগুলো তীরে ভিড়ানো হয়। পাল খাটানোর জন্যে যতোক্ষণ না বাতাস উঠেছে অথবা দাঁড় টানার জন্যে যতোক্ষণ না রোদ পড়ে গেছে ততোক্ষণ পর্যন্ত এগুলো তীরে বাঁধা থাকবে। পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো গাছগুলো স্থির হয়ে আছে। একটি পাতাও নড় ছ না। এমন কি ধানগাছের পাতাগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরুগুলো গোয়ালে ঠায় অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু লেজগুলোই যেনো জীবন্ত। মাছি তাড়ানোর জন্যে ঘন ঘন এগুলো সঞ্চালিত হচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে জীবন ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু নদীই সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে নিরবধি, নিরন্তর—দিনের প্রখরতা অথবা রাত্রির নৈশব্দের মধ্যে সমান গতিতে এবং অবিরল ধারায়।

কালীগঞ্জের পরেই নদীটা সবচেয়ে চওড়া। চারিধারের সারি সারি পাট গুদাম, মালবাহী নৌকা ইত্যাদি সব কিছুই ঘুমিয়ে পড়েছে। আরো দূরে তীরভূমি নীচু। এখানে নদী তীরের শৃঙ্খল ভেঙে নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছে—গ্রাস করে নিয়েছে দু'পাশের মাঠ। গাছ আর ক্ষেত না থাকলে বুঝাই যেতো না কোথায় নদী শেষ হয়েছে, কোথায় এর তীর শুরু হয়েছে। মনে হবে একঝাড় বাঁশ এবং সুপারীর গাছ নদীতেই দাঁড়িয়ে আছে। ডুবে যাওয়া পাটের মাথাগুলো দেখে মনে হবে যেনো এগুলো বন্যায় ভেসে এসেছ। নিমজ্জিত ক্ষেতের ধানগাছ থেকে উদ্গত নতুন চারা পানির ওপরে মাথা তোলার চেষ্টা করছে।

এই নদীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় পণ্য হচ্ছে পাট। তীরবাসীদের পক্ষেও তাই। এখানকার নীচু প্লাবিত জমিগুলোতে পূর্ণভাবে পাট

আবাদ করা হয়েছে। মাঠের পর মাঠ জুড়ে শুধু পাট আর পাট। এগুলো দশফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। তীব্র গরমের জন্য সামান্য ক্ষণের যে বিশ্রামের সময় এসেছিলো, তা শেষ হয়ে যায়। আবার জীবনের জোয়ার আসে। মজুরগণ হাঁটু পানিতে নেমে পাট কাটে আর আঁটি বাঁধে। আঁটিগুলো পাশাপাশি বেঁধে অল্প পানিতে ডুবিয়ে রাখা হয়। কয়েকদিন ধরে সেখানে এগুলো পচানো হয়। বয়স্ক লোক এবং বালকেরা বুক পানিতে নেমে বাঁশ পুঁতে এগুলো আটকে রাখে, যাতে করে স্রোতে ভেসে না যায়। মাথালি মাথায় দিয়ে রোদবৃষ্টি থেকে নিজেদের রক্ষা করে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এরা কাজ করছে। কোমরে জড়ানো একটা বস্ত্রখণ্ড ছাড়া তাদের গায়ে আর কোনো কাপড় নেই।

একটু দূরে পচানো পাটগুলো পিটিয়ে ধোওয়া হচ্ছে। কাঠি থেকে লম্বা সাদা আঁশগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে এগুলো পানিতে ধোলাই করার পর বাঁশের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হবে শুকানোর জন্যে। নদীর পাড় বরাবর সর্বত্রই দলে দলে লোক এই করছে।

পশ্চিম আকাশে সকলের অজ্ঞাতসারে কখন একটা হালকা মেঘ এসে জমেছে। সূর্যের মুখ ঢেকে না ফেলা পর্যন্ত দিনের আনন্দোচ্ছ্বাস ম্লান হয়ে যায় না। পালকের মতো নরম মেঘগুলো আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটাছুটি করে বেড়াচেছ—যেনো শিশুদের লুকোচুরি খেলা। এর পর আসে কতকগুলো ধূসর ও বিষণ্ণ মেঘ একেবারে নীচু হয়ে। সূর্য মুখ ঢাকে। আদিগন্ত ছায়া নেমে আসে। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে একটা দমকা হাওয়া বয়ে যায় নদীর ওপর দিয়ে। প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামে। নদী সমুদ্রের মতো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সহস্র তরঙ্গের ফণা তুলে সে যেনো নাচতে থাকে। মেঘমালা গড়াতে গড়াতে চলে যায়। সূর্য তার গ্রাস থেকে মুক্তি পায়। ঝড়বৃষ্টির আর কোনো চিহ্ন নেই। বাতাস স্নিগ্ধ ও সরল হয়ে উঠেছে। নৌকায় আবার পাল চড়ানো হয়। আবার পালে হাওয়া লাগে। নৌকা এগিয়ে যায় আর আন্দোলিত জল আনন্দে খিল্ খিল্

করে হেসে ওঠে। সূর্যের প্রদীপ্ত আলোতে হাস্যমুখর জলগুলো চিক্ চিক্ করে ওঠে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। একটা ক্ষণিক আলোকস্ফুরণের মতো ওপার থেকে একটা মাছরাঙা পাখি বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটে এসে ঝুপ করে পানিতে ডুব দেয়। আয়নার মতো স্বচ্ছ নদীর বুক থেকে জল ছিটকে যায় চারদিকে। পলকের মধ্যে সে উঠে আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। একটি মাত্র পাল অস্তায়মান দিনমণিকে অনুসরণ করতে করতে এগিয়ে য়ায়। তারপর হিরণ্যমণ্ডিত পশ্চিমাকাশে কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। মন্থরগতি গরুগুলো নদীর কিনারে এসে জল পান করে। ছোট একটি ছোকরা তাদের রাখাল। চোখেমুখে মুরুব্বিয়ানার ভাব। তার দ্বিগুণ লম্বা একটি পাঁচন হাতে তাদের ওপর প্রভুত্ব ফলায়। একপাল মহিষ জলাভূমিতে নেমে মাথা পানির ওপরে তুলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে দেয় পানিতে। রাখাল বালকটি গরুগুলো ছেড়ে এ পশুগুলোর সরদারের কাছে গিয়ে হাতের পাঁচনটির সদ্ব্যবহার করে। বিরাট জন্তুটি কাদায় উঠে দাঁড়ায়। বালক তার পিঠে চড়ে পশুগুলোকে আস্তে আস্তে বাড়ি নিয়ে যায়।

গাছগুলোর ওপারের মসজিদ থেকে ভেসে আসে নদীর ওপর দিয়ে নামাজের আহ্বান। সন্ধ্যা সমীরণকে সচকিত করে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে বেজে ওঠে আজানের ধ্বনি 'এক আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই।' সমগ্র প্রাচ্য-জগতে, অতীন্দ্রিয়বাদী বিস্ময়কর প্রাচ্য ভূখণ্ডের অগণিত মসজিদ আর গ্রাম থেকে একই আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে। সন্ধ্যাকালে—সূর্য যখন অস্তমিত হয় আর রাত নেমে আসতে শুরু করে—বহু উচ্চারিত আল্লহ্‌র নাম বায়ুমণ্ডলকে প্লাবিত করে তোলে—বিশ্বাসীদের জন্য বয়ে আনে পরম আশ্বাস। বিলম্বিত লয়ে, সুরের আরোহণ-অবরোহণের মতো, ছন্দময় কবিতার পুলক-সঞ্চারী ঝঙ্কারের মতো সেই আহ্বান সন্ধ্যা সমীরণের বুকে জাগায় অদ্ভুত শিহরণ। বাতাসের গায়ে লেগে থাকে বহুক্ষণ ধরে সে সুরের রেশ। নদীর তীরে ধরে হাট-প্রত্যাগত একদল মানুষ তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে

সওদার বোঝা নামিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ায় নামাজ পড়তে। (নামাজের বিভিন্ন রোকন আদায়ের পর) জানু পেতে বসে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করে। সকল চিন্তা-ভাবনা সবকিছু ভুলে গিয়ে তারা আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে যায় ঐ সময়ের জন্য। অনেকবার তাদের জানু পেতে বসতে হয়, কপাল ভূমিতে স্পর্শ করতে হয়। প্রাণমন ঢেলে দিয়ে আল্লহ্‌র কাছে তারা জানায় হৃদয় নিঙড়ানো আকুতি আর ধর্মের প্রতি অবিচল বিশ্বাস—কোরা-নের মহিমামণ্ডিত সুরাসমূহের মাধ্যমে। চলন্ত নৌকার বৈঠাধারিগণ বৈঠা হাত থেকে নামিযে রেখে নৌকার ছাদেই নামাজে বসে পড়ে পশ্চিমমুখী হয়ে। নদী স্তব্ধ হয়ে যায়, সারা বিশ্বচরাচর উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সেইসব অমৃতমধুর প্রার্থনা মন্ত্র—কোরানের মহিমামণ্ডিত বাণী শ্রবণের জন্য। সর্বত্র সেই নামাজের সুললিত শব্দ। আল্লাহ্‌র স্তবস্তুতিতে সারা বিশ্ব পরিপ্লুত। প্রাণী ও বস্তুজগৎ নির্বিশেষে সর্বত্র সবার কণ্ঠেই সেই একই বাণী—আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাস্য নেই, তাঁর সৃষ্ট সবকিছুই সুন্দর।

সূর্য অস্তমিত। আগুনের সেই মহাগোলক ভেঙে গেছে। পশ্চিমাকাশে ভাঙা টুক্‌রাগুলো রঙের আগুন জেলে দিয়েছে। নীলকান্ত মণি, পোখরাজ, পদ্মরাগ ইত্যাদি সর্বপ্রকার মণি-মুক্তা, হীরা-জহরতের বর্ণাভা একত্র হয়ে জ্বলছে পশ্চিমাকাশে। আর নদীর বক্ষোমুকুরে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সেই রূপ! কখনো এক ঝলক সোনার রঙ ভেসে উঠলো। পরক্ষণেই শুরু হলো আগুনের উল্লম্ফন। ক্রমে তা মলিন কমলা ও ফিকে বেগুনী রঙে এবং শেষে ধূসর বর্ণে পরিণত হয়। রঙের খেলা শেষ হয়ে গেলো। নদী প্রায় স্থির হয়ে গেছে। সারাদিনের ক্লেশকর একটানা দৌড়ের পর শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে যেনো। পৃথিবী ঘুমের জন্য তৈরি হয়। নদীর প্রলাপ স্তিমিত হয়ে আসে। তার জল এখন স্ফটিকস্বচ্ছ হ্রদের মতো। উষার সূচনা মুহূর্তে তার মধ্যে যে দুরন্ত যৌবনের স্ফূর্তি ঘটেছিলো এখন তার অবসান ঘটেছে। এর ব্যঙ্গময় সুর এখন স্তব্ধ। এর প্রায়-প্রশান্ত বুকে যে শান্তি বিরাজ করছে তারি মধ্যে যেনো তা হারিয়ে গেছে। তার চলা যখন

অনুভব করা যাচ্ছে তখনও মনে হচ্ছে যেনো সে ঘুমে ঘুমে চল্‌ছে। দিনের সকল ভাবনা-যাতনা, উদ্বেগ-উৎকন্ঠা বহু দূর-ভাটিতে চলে গেছে। এগুলো এখন আগের অবাস্তব স্বপ্নের বস্তুতে পর্যবসিত হয়েছে। মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থের সংঘাত অনিত্য আশা-আকাঙক্ষা বিলীন হয়ে গিয়েছে মহাবিস্তার এই গোধূলীর জগতে। কাজেই নদীর আর বিদ্রূপের সুরে বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে সবই অনিত্য, অসার। কারণ, পৃথিবীর অহমিকা এখন বহু পেছনে পড়ে গেছে। নদীর বাণী এখন শান্তি ও নৈশব্দ্যের বাণী। কতো মানুষ এসেছে, চলে গেছে, কতো জাতির উত্থান-পতন, কতো সাম্রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া হয়েছে। কিন্তু নদীর এই প্রশস্ত বুকে কারুর জন্য কোনো খেদের চিহ্ন নেই। সে চিরবিস্মরণী।

তাল বৃক্ষের বহুলম্বিত ছায়া নদীর বুকে। ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গিগুলো ধূসর নদীর বুকে দীর্ঘ কালো রেখার মতো মনে হয়। কালো উলঙ্গ-প্রায় মূর্তিগুলো নৌকা চালিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় যেনো ওরা পটে আঁকা ছবি। এইসব কৃষ্ণকায়, নীরব মানুষ একটা মোহকর রহস্যময়তার সৃষ্টি করে রাত্রির সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। নদীর ওপার থেকে ভেসে আসে শিয়ালের তীব্র কর্কশ 'হুক্কা হুয়া' রব। নিকটবর্তী একটা গ্রাম থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে আসন্ন রাত্রির উদ্দেশে। উভয় তীরে একটির পর একটি বাতি জ্বলে ওঠে। অসংখ্য তারায় আকাশ ভরে গেছে। ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে তারা নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে। আস্তে আস্তে নেমে আসে এক মহাশান্তি। নদী আর পৃথিবী যেনো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে ক্লান্ত দেহকে ঘুমের কোলে আর শ্রান্ত মস্তিষ্ককে মধুর বিস্মৃতির মধ্যে সঁপে দিতে হয় অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য; কারণ এরপর আবার নতুন করে হবে ভারতের দীর্ঘ ক্লেশকর মেহনতি দিনযাত্রা।

———

গ্রন্থপঞ্জী

স্যার উইলিয়াম হাণ্টার রচিত 'হিস্ট্রি অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া'।
স্টুয়ার্টের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'।
'সিয়ারে মুতাঅখ্‌খেরীন'।
বিশপ হেবারের 'জার্নাল'।
র‍্যাল্‌ফ ফিশ রচিত 'ট্র্যাভেলস'।
'স্ট্যাটিস্টিক্যাল এ্যাকাউণ্ট অব বেঙ্গল' ৫ম খণ্ড।
'রিযাজুস সালাতিন'।
হিল্‌স কৃত 'থ্রি ফ্রেঞ্চম্যান ইন বেঙ্গল'।
ট্যাভারনিয়ারের 'ট্র্যাভেলস ইন ইণ্ডিয়া'।
স্যার উইলিয়াম হাণ্টার রচিত 'থ্যাকারেজ ইন ইণ্ডিয়া'।
'আইন-ই-আকবরী', লক্ষ্ণৌ সংস্করণ।
স্যার চার্লস ডি'ওলী কৃত 'রুইন্‌স অব ঢাকা'।
ডঃ টেলরের 'টপোগ্র্যাফী অব ঢাকা'।
সৈয়দ আওলাদ হাসানের 'এ্যান্টিকুইটিস অব ঢাকা'।
মার্শম্যান রচিত—'হিস্ট্রি'।
'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'।
'হিস্ট্রি অব স্ট্যাটিস্টিকস, ঢাকা ডিভিশন, ১৮৬৮'।
ব্ল্যাকম্যান কৃত 'জুগ্রাফী এ্যাণ্ড হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'।
লং-এর 'সিলেকশন্‌স ফ্রম আনপাবলিশ্‌ড রেকর্ডস'।
'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস'।
হিলের 'ইণ্ডিয়ান রেকর্ড সিরিজ'।
হুইলারের 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'।
উইলসনের 'আর্লি এ্যানালস অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল'।

এতদ্ব্যতীত 'জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল', 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ প্রবন্ধের লেখক ছিলেন ঢাকার তদানীন্তন সিভিল সার্জন ডাঃ ওয়াইজ।